নাগপাশ

নাগপাশ

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত

কলিকাতা ; উইলকিন্স প্রেস।

১৩১৫

কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ার, উইলকিন্স মেশিন প্রেসে
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
১১৫।৪, গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী পুস্তকবিভাগ হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপক্রমণিকা।

সুখ।

উপক্রমণিকা।

কিসের উৎসব ?

ধূলগ্রামের দত্তগৃহে আজ যেন মহোৎসব। শরতের প্রভাত-রবিকরে উৎফুল্ল গৃহ যেন আসন্ন উৎসব সূচিত করিতেছে। এখনও অধিক বেলা হয় নাই; এখনও রবিকরে গৃহপ্রাঙ্গণে অপরিণত তমালের শাখায় বিস্তৃত ঊর্ণনাভের জালে রজনীর সঞ্চিত শিশির শুকায় নাই; গৃহপ্রাচীরকোটরে শালিক-শাবক এইমাত্র জাগিয়া আহারের জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেছে; একটি বুলবুল আহারের সন্ধানে বাহির হইয়া তমালশাখায় বসিয়া প্রাঙ্গণে দূর্ব্বাদলে হরিৎতনু পতঙ্গের সন্ধান করিতেছে; রাখাল-বালকগণ গোপাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, গোক্ষুরোত্থিত ধূলিরাশি এখনও রাজপথের উপর বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; বালক-গণ আসনে তালপত্র জড়াইয়া ও প্রকোষ্ঠে মস্যাধার ঝুলাইয়া গ্রাম্য পাঠশালায় যাইতেছে; গ্রামের নবীনধনী চৌধুরীদিগের গৃহে পূজার প্রভাতীনহবৎধ্বনি কেবল শান্ত হইয়াছে।

গৃহের সম্মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া নবীনচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের পূর্ব্বদিকস্থ প্রকোষ্ঠের বাতায়নগুলি মুক্ত করিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিতেছেন। কক্ষমধ্যে তক্তপোষের উপর অমল শ্বেত আসন; এক পার্শ্বে একখানি সঙ্কীর্ণ উচ্চ চৌকী। নবীনচন্দ্র ধূমপান করিতে করিতে ভৃত্যকে আদেশ দান করিতেছেন, এমন সময় চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমপার্শ্বস্থিত কক্ষের দ্বার হইতে কন্যা কমল ডাকিল,—"বাবা!" কন্যার বয়স সপ্তদশ; পিতার চত্বারিংশৎ।

নবীনচন্দ্র ফিরিয়া দাড়াইলেন। কমল বলিল, "বাবা, আমি গত সন্ধ্যা হইতে শ্যামের মা'কে বলিতেছি, আজ সকালে উঠিয়াই মাছ আনিতে হইবে। সে এখনও গেল না। এত বেলায় কি আর কিছু পাওয়া যাইবে?"

কমল আপনার আগ্রহের আতিশয্যে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, শ্যামের মা'ই তাহার দাদাকে 'মানুষ' করিয়াছিল; দাদার আগমনসম্ভাবনায় তাহারও আনন্দ অল্প হয় নাই। ভালবাসা মানুষকে বড় স্বার্থপর করে।

নবীনচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন; মুখমুক্ত ধূমরাশি বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "শ্যামের মা প্রত্যূষ হইতেই আমাকে তাগিদ দিতেছে। আমিই তাহাকে যাইতে দিই নাই।"

কমল অভিমানের সুরে বলিল, "কেন?"

"জেলেদের সংবাদ দিয়াছি। আর একটু পরে আমিই যাইয়া পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাইয়া আনিব। দেখিব, তুই আজ কেমন রাঁধিস্। জেলেদের জন্য, তৈল, চিঁড়া ও মুড়কী বাহির করিয়া রাখিস্। তাহারা এখনই আসিবে।"

কমলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এই সময় নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র অন্তঃপুর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, নবীন?"

জ্যেষ্ঠকে দেখিয়া নবীনচন্দ্র ত্রস্তে হুঁকা নামাইয়া রাখিলেন। নূতন সভ্যতা ও নূতন ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকারে পরিণত

তাম্রকূটের বহুল প্রচারের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোক প্রণম্যদিগের সম্মুখে ধূমপান করিত না।

হুঁকা নামাইয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এখনও মাছ আইসে নাই, তাই আমার উপর আর শ্যামের মা'র উপর রাগ হইয়াছে।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া কমলকে বলিলেন, "কেন, মা, আমরা ত নিত্য গৃহে আহার করি, আমাদের জন্য ত কোন দিন এমন আয়োজন হয় না।" তাহার পর ভ্রাতাকে বলিলেন, "ও দিকে বাড়ীর ভিতরে দিদি বড় বধূকে তিরস্কার করিয়াছেন। দিদিকে ঘরের সব তরকারী কুটিতে উদ্যতা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরঝি, হাটের এখনও দুই দিন বিলম্ব আছে, আজই সব তরকারী কুটিবে?' ইহাতে দিদি বড় রাগ করিয়াছেন।"

নবীনচন্দ্র হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি কি বলিলেন?"

"বলিলেন, 'সাতটা নহে—পাঁচটা নহে—একটা ছেলে। কত দিন পরে বাড়ী আসিতেছে;—আজ যদি দুইটার স্থানে চারিটা ব্যঞ্জন না করিব, তবে কবে করিব? তরকারী কি পর-লোকে সঙ্গে যাইবে? হাটের বিলম্বের ভাবনা আমি ভাবিব; তুমি রাঁধিতে যাও।' আজ বৃহৎ আয়োজন।"

দুই ভ্রাতা হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় কমল কর্ত্তৃক দারুণ অভিযোগে অভিযুক্তা শ্যামের মা একখানি জলচৌকি ও একবাটী সর্ষপ-তৈল দিয়া গেল।

শিবচন্দ্র তৈলম্রক্ষণ করিতে বসিলেন। তাঁহার তৈলমর্দ্দন শেষ হইতে না হইতে একটি ধীবরবালক আসিয়া সংবাদ দিল, ধীবরগণ ডিঙ্গি ও জাল লইয়া পুষ্করিণীতে গিয়াছে। শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, "নবীন, তৈল মাখিয়া লও।"

নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি এখন পুষ্করিণীতে যাইব।"

"চল, পুষ্করিণী হইয়া ঘাটে যাইবে।"

"না। আমি মাছ ধরাইয়া বাড়ী ফিরিব। প্রভাত আস্থক, এক সঙ্গে স্নান করিতে যাইব।"

শিবচন্দ্র বুঝিলেন, আজ তাঁহাকে একান্তই একক স্নানে যাইতে হইবে ; নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তিনি অগত্যা বাহির হইলেন। নবীনচন্দ্র ধীবরবালকের সঙ্গে পুষ্করিণীতে চলিলেন।

পুষ্করিণীতে বহুদিন জাল ফেলা হয় নাই ; মৎস্যকুল নিঃশঙ্ক হইয়া ছিল। জেলেরা ডিঙ্গিতে উঠিয়া জাল ফেলিতেই একটা মৎস্য জালে বাধিল। জেলেরা জাল টানিয়া তুলিল ; সলিল হইতে সদ্য-উত্থিত মৎস্য জালবদ্ধ হইয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল। সেটা তেমন বৃহৎ নহে বলিয়া নবীনচন্দ্রের আদেশে জেলেরা সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় জাল ফেলিল। উত্তোলনকালে জাল গুরুভার বোধ হইতে লাগিল, জেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ভারি মাছ বাধিয়াছে।" সত্য সত্যই জালে দুইটি বৃহদাকার মৎস্য উঠিল,—একটি রোহিত, অপরটি মৃগেল। তাহারা বেগে পুচ্ছ সঞ্চালন করিতে লাগিল। নবীনচন্দ্র তীর

হইতে বলিলেন, "মৃগেলটা ছাড়িয়া দে।" জেলেরা মৃগেলটা ছাড়িয়া দিয়া রোহিৎমৎস্যটি ডিঙ্গির খোলে ফেলিল, তাহার পর জাল গুটাইয়া তীরে আসিল।

নবীনচন্দ্র গৃহাভিমুখগামী হইলেন। এক জন ধীবর মৎস্যটির কণ্ঠাস্থিতলে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া ঝুলাইয়া লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ-গামী হইল। গৃহে আসিয়া নবীনচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমদিকস্থ কক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া ডাকিলেন,—"দিদি!"

অন্তঃপুরে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তিনটি করিয়া ছয়টি প্রকোষ্ঠ; পূর্ব্বের অংশ দ্বিতল; পশ্চিমাংশে দ্বিতলে একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ—ঠাকুরঘর; উত্তরে পাকশালা ও ভাণ্ডার। নবীনচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পাকশালা হইতে এক জন বিধবা রমণী বাহিরে আসি-লেন। তাঁহাকে দেখিলে বয়স পঞ্চাশের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। সংযমে ও পূতাচারে হিন্দুবিধবার স্বাস্থ্য সহজে ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি মৎস্য দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, ডাকিলেন, "বড় বৌ, বাহিরে আইস।" বড়বধূও মৎস্য দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। কমল ও শ্যামের মা পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। কমল ভাণ্ডার হইতে ডালায় চিঁড়া ও মুড়কী এবং সরায় তৈল আনিয়াছিল। ধীবর বসনের একাংশে চিঁড়া মুড়কী বন্ধন করিল,—তৈলের সরা লইয়া চলিয়া গেল। শ্যামের মা 'আঁইস'-বঁটী ও ছাই লইয়া প্রাঙ্গনে মাছ কুটিতে বসিল।

নবীনচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে তক্তপোষের উপর বিছানায় বসিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠের বিছানা ভ্রাতুষ্পুত্রের

জন্য। সে যখন গৃহে না থাকে, তখন নবীনচন্দ্র সে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন; কেবল কোনও অতিথি আসিলে সে কক্ষ তাহার শয়নজন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। বালকগণ প্রভাতের পাঠ শেষ করিয়া পিঞ্জরমুক্ত বিহগের মত কলরব করিতে করিতে ধূলিধূসর রাজপথের ধূলি উড়াইয়া গৃহে চলিল। নবীনচন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; এক একবার চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে আসিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

যাহার জন্য দত্তগৃহে এত আয়োজন, এত ব্যস্তভাব, অল্পক্ষণ পরেই রাজপথে তাহার পরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া নবীনচন্দ্র প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গৃহদ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। গৌরবর্ণ, সুদর্শন, বিংশবর্ষবয়স্ক যুবক আসিয়া খুল্লতাতকে প্রণাম করিল। নবীনচন্দ্র তাহাকে সাদরে তুলিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র একত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে ছিলেন। প্রভাত যাইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। তাঁহার স্নেহার্দ্রনয়নে বিস্ময়ভাব প্রকাশ পাইল। গুটিপোকা যেমন ক্রমে প্রজাপতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহার পুত্র পল্লীগ্রাম হইতে সহরে যাইয়া ক্রমে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সে পরিবর্ত্তন শিবচন্দ্রের ভাল লাগিত না; ইহার প্রধান কারণ, তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন, বেশভূষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহারেও পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট হইতেছিল। তিনি এবারও তাহার বেশভূষার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রভাতকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। অন্তঃপুরে পদার্পণ করিয়া প্রায় এক সময়েই নবীনচন্দ্র ডাকিলেন,—"দিদি!" প্রভাত ডাকিল,—"পিসীমা!"

পিসীমা রন্ধন করিতেছিলেন; হাতা বেড়ী ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পার্শ্বস্থ আমিষ-পাকশালা হইতে কমল ও প্রভাতের জননী আসিলেন।

প্রভাত পিসীমা'কে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইতেছিল, তাহার জননী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি রাঁধিতেছেন, যেন ছুঁইয়া দিস্ না!"

পিসীমা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বড়বৌ, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ও ছুঁইলে কি হইত? না হয়—কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিতাম।"

ইহার পর প্রভাত মাতাকে প্রণাম করিল, এবং কমলের প্রণাম গ্রহণ করিল।

শ্যামের মা একটা 'প্রেতে'য় তরকারী ধৌত করিয়া আনিতেছিল; প্রভাতের পদে সঞ্চিত ধূলি দেখিয়া সে বলিল, "দাদাবাবু, পায়ে ধূলা কেন?"

পিসীমা স্নেহসিক্ত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "হাঁটিয়া আসিয়াছিস্ বুঝি?"

প্রভাত বলিল, "বিলের কাছে গাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"রৌদ্রে হাঁটিতে আছে? আহা, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! যা'—স্নান করিয়া আয়।"

নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া বাহিরে আসিলেন; তাহাকে বলিলেন, "চল্, তোর ঘরে কাপড় ছাড়িবি।"

উভয়ে চণ্ডীমণ্ডপের পূর্ব্বদিকস্থ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। শিবচন্দ্র তখন ধূমপান করিতে করিতে কি ভাবিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোযান সশব্দে গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। চালক পুষ্টাঙ্গ, শ্বেত, বঙ্কিমশৃঙ্গ বাহনদ্বয়ের স্কন্ধ হইতে গাড়ী নামাইয়া দিল; তাহারা প্রাঙ্গণের তৃণ আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। চালক যানমধ্য হইতে প্রভাতের 'ষ্টীল-ট্রাঙ্ক' বাহির করিয়া প্রভাতের বসিবার ঘরে দিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "চল্, স্নান করিতে যাই।"

প্রভাত বাক্স খুলিয়া তোয়ালে বাহির করিল। সুগন্ধি তৈলের শিশি বাহির করিতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল; সে পিতৃব্যের সহিত সর্ষপ-তৈল মাখিয়া লইল। উভয়ে স্নান করিতে বাহির হইলেন।

প্রথম খণ্ড।

দুঃখের আভাষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দত্তপরিবার।

ধূলগ্রামের দত্তপরিবার সম্ভ্রান্ত বংশ। শিবচন্দ্রের প্রপিতামহ মুর্শিদাবাদে নবাবসরকারে কার্য্য করিতেন। তখনও দেশে রেল বা ষ্টীমার আইসে নাই; রাজপথ শ্বাপদভয়ে ও দস্যু-তস্করের অত্যাচারে দুর্গম; জলপথ জলদস্যুবর্জ্জিত নহে; যাহাদের হস্তে দেশের শান্তিরক্ষার ভার ছিল, তাহারা রক্ষক না হইয়া প্রায় ভক্ষক হইয়া উঠিত; শৃঙ্খলাভাবে দিল্লীর শাসনদণ্ড বাঙ্গালায় ও মুর্শিদাবাদের শাসনপ্রতাপ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলায় প্রসারিত হইত না; দেশের লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না; যাহার ধনসম্পত্তি থাকিত—তাহাকে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত। সেই সময় শিবচন্দ্রের প্রপিতামহ দেশে পারসী শিখিয়া বহুকষ্টে মুর্শিদাবাদে উপনীত হয়েন, এবং অক্লান্ত চেষ্টায় নবাবসরকারে চাকরী লাভ করেন। অসাধারণ প্রতিভা. অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা ও প্রচুর কার্য্যদক্ষতা বশতঃ তিনি অল্পদিন মধ্যেই উচ্চপদে উন্নীত হয়েন। সেই হইতেই দত্তদিগের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। তিনি এক জীবনে যে পরিমাণ অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখনকার দিনে চাকরী করিয়া এক জীবনে সে পরিমাণ সংগ্রহের আশা একান্তই সুদূরপরাহত। তিনি আপনার পিতৃহীন, একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নবাবসরকারেই কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি-

বলে অল্পদিনেই যখন বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহারা কোনরূপেই কার্য্য চালাইতে পারিবে না, তখন তাহাদিগকে কার্য্য হইতে অবকাশ লওয়াইয়া গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার পদোন্নতি অনেকের ঈর্ষ্যার ও মনোবেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা যে সুযোগ পাইলেই তাঁহার অনিষ্ট করিবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। যে তীক্ষ্ণপ্রতিভাবলে তিনি তাহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিভাহীন পুত্রকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া পাছে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়,এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগকে আর কার্য্যে ব্রতী রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার কৃপায় তাঁহার জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় অনেকে নবাব সরকারে কার্য্য পাইয়াছিলেন। তখন লোকে সমাজ বলিতে ব্যক্তির সমষ্টি না বুঝিয়া পরিবারের সমষ্টি বুঝিত; তখনও আত্মীয় স্বজনাদির উপকার দেবসেবারই মত খয়রাতখাতে খরচ পড়িতে আরম্ভ হয় নাই।

কর্ম্মস্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র একত্র এক সংসারে বাস করিতে লাগিলেন। তখনও বাঙ্গালায় "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইবার ব্যবস্থা হয় নাই। এই সময় হইতে লক্ষ্মী চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিবার বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিতদিগের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। অতিথি আসিলে ফিরাইবার রীতি নাই; ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয়সংক্ষেপ করাও হইয়া উঠে না; কারণ, যে অবস্থা-পরিবর্ত্ত-

নের সূচনা দেখিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিতে যায়, তাহার সহজেই মনে হয়, ইহাতে লোকে তাহার অবস্থা একান্ত শোচনীয় বলিয়া মনে করিবে। অর্থস্রোতঃ সমানভাবে ভাণ্ডার হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু আর পূর্ব্বের মত অবারিতগতিতে ভাণ্ডার পূর্ণ করিত না।

এই সময় দত্ত-পরিবারে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষয়কর্ম্মাদিতে অভিজ্ঞ হইতেছিলেন; তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার পত্নী স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া মরণে পতির সহ-গামিনী হইলেন। তাঁহাদিগের একমাত্র পুত্র—শিবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পিতা তখন বালক। তখন সংসারের সকল ভার শিবচন্দ্রের এক খুল্লপিতামহের হস্তে ন্যস্ত হইল। তিনি বিষয়-কর্ম্মাদিতে যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনই অপারগ। তিনি মিতব্যয়িতা জানিতেন না। পরিবারস্থ সকলে পূর্ব্বের অভ্যাসে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে শিক্ষা করেন নাই। তিনি তাঁহাদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেন না,—করিতে পারিতেন না। ভালবাসার পাত্রগণ সকল সময় সুবিধা অসুবিধা বুঝে না। তাহাদিগের জন্য মানুষ সাধ্যের অধিক করিবার চেষ্টা করে, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পায়; কারণ, প্রণয়াস্পদের হৃদয়ে বেদনা বাজিলে, সে ব্যথা, যে ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে দ্বিগুণ বাজে। অত্যাচারের মধ্যে ভালবাসার অত্যাচার নিষ্ঠুরতম; দৌরাত্ম্যের মধ্যে স্নেহের দৌরাত্ম্য সমধিক ক্লেশ-দায়ক। তখন, গৃহকর্ত্তা গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞ হইলে যাহা হয়,

তাহাই হইল; সম্ভ্রান্ত দত্ত-পরিবারের ধনভাণ্ডার ছিদ্রপথ-নিঃশেষিতবারি কুম্ভের মত অন্তঃসারশূন্য হইতে লাগিল; সেই পরিবার মেঘাবৃতশিখর পর্ব্বতের দশাগ্রস্ত হইল। তাঁহার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবনকালেই দত্ত-পরিবারের ধনসম্পদ ও জন-সম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইল। ছেলেরা কেহ কেহ কর্ম্মের চেষ্টায় গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; পরিবারের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তির বিভাগ হইল। কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে যাইয়া যিনি যে স্থানে সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই স্থায়ী হইয়া বসিলেন। যাঁহারা কোথাও সুবিধা করিতে পারেন নাই, এবং যাঁহারা গ্রামেই ছিলেন, তাঁহারা—যিনি যে স্থানে সম্পত্তির অংশ পাইলেন, বা সুবিধা বুঝিলেন, সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবচন্দ্রের পিতা পৈত্রিক বাসগৃহ, পুষ্করিণী, বাগান ও সামান্য জমী জমা লইয়া পৈত্রিক ভিটাতেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জমীজমার আয়ে কোনও রূপে সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ হয় মাত্র। কিন্তু তখনও গ্রামে অতিথি আসিলে দত্তগৃহেই উপস্থিত হয়; তখনও পূজার দালানে দুর্গোৎসব ভিন্ন আর সকল পূজাই হয়। দুর্গোৎসব না হইবার কারণ, একবার বোধনে বলির পশু খড়্গের প্রথম আঘাতেই খণ্ডিতমুণ্ড হয় নাই; পরদিন গৃহে একটি বালকের মৃত্যু ঘটে,—সেই হইতে দত্তগৃহে দুর্গোৎসব বন্ধ হয়। গৃহকর্ত্তা

প্রথমে বলিয়াছিলেন, "মা দিয়াছিলেন, মা'ই লইয়াছেন; পূজা বন্ধ করিব না।" কিন্তু পরে অপরের অজ্ঞাত কোনও কারণে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, পূজা বন্ধ হওয়াই দেবীর অভিপ্রেত।

পিতার মৃত্যুর পর শিবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দেখিলেন, পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে সংসারের আবশ্যক ব্যয়ের নির্ব্বাহ হওয়াই দুষ্কর; জীর্ণ গৃহের সংস্কারাদির ব্যয় আসিবে কোথা হইতে? পূজা পার্ব্বণ বন্ধ হইল,—চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোষ আর উঠে না। সঙ্কীর্ণ আয়ে নানারূপ ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় না।

এই সময় পিতামাতার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে—শিবচন্দ্রের পুত্র প্রভাতের জন্ম হইল। আর অতর্কিতভাবে—অপ্রত্যাশিত পথে কমলার কৃপা দত্তদিগের জীর্ণগৃহে প্রবেশ করিল। শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুর ব্যবসায়ে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। দারুণ বিসূচিকায় তাঁহার ও পর দিবস তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পত্নী কাশীবাসিনী হইবার ইচ্ছা করিলে বিধবা পুত্রবধূই বলিলেন, "মা, ভিটা যে শূন্য হইবে!" শেষে উভয়ে যুক্তি করিয়া এক জ্ঞাতিপুত্রকে আনিয়া পালন করিলেন। কিন্তু পতিপুত্রশোকে শাশুড়ীর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। বধূ জ্ঞাতিপুত্রকে লইয়া শ্বশুরের ভিটায় বাস করিতে লাগিলেন। শিবচন্দ্রের যখন পুত্রলাভ হইল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেই পালিত জ্ঞাতি-

পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তখন অগত্যা শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসিলেন।

পিসীমা'র অর্থ তাপতপ্ত ধরাবক্ষে নিদাঘদিনান্তের স্নিগ্ধ বর্ষণের মত দত্তগৃহে বর্ষিত হইল। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিবচন্দ্র পৈত্রিক গৃহের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট অংশের সংস্কার করিয়া লইলেন, এবং অর্থের সুযোগমত ব্যবহারে আয়ের পথ প্রশস্ত করিলেন।

প্রভাত পিসীমার শূন্য অঙ্ক ও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিল। তাহাকে লইয়া পিসীমার আর বিশ্রাম রহিল না। এমন কি, তিন বৎসর পরে, দুইটি মৃতসন্তান প্রসবের পর নবীনচন্দ্রের পত্নী যখন কমলকে প্রসব করিয়া দারুণ সূতিকায় শয্যাশায়িনী হইলেন, তখনও প্রভাত পিসীমার অঙ্কের মৌরশী পাট্টা আগুলিয়া রহিল। কোনও কোনও লতিকা যেমন ফললাভের সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া যায়, নবীনচন্দ্রের পত্নীও তেমনই কমলের জন্মের চারি মাস পরে জীর্ণদেহ ত্যাগ করিলেন। কমলের প্রতি যে পিসীমার স্নেহ ছিল না, এমন নহে; তবে প্রভাত তাঁহার প্রিয়তম। কমল জ্যোঠাইমা'র অঙ্ক অধিকার করিয়া লইল, জ্যেষ্ঠতাতের 'মা' হইয়া দাঁড়াইল।

নবীনচন্দ্র আর বিবাহ করেন নাই। শিবচন্দ্রেরও অন্য সন্তান হয় নাই।

যথাকালে শুভদিনে প্রভাতের হাতে-খড়ি হইয়া গেল। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাকে পড়ান লইয়াই বিপদ উপ-

স্থিত হইল। তাহাকে তিরস্কার করিলে পিসীমা'র তাহা সহিত না। গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয়ের শাসনের ভয়ে তাহাকে পাঠশালায় পাঠান বন্ধ করিতে হইল। শিবচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তখন নবীনচন্দ্র স্বয়ং তাহার শিক্ষার ভার লইলেন—খেলার সঙ্গে শিক্ষাদান চলিতে লাগিল। প্রভাত বুদ্ধিমান ছিল; নবীনচন্দ্রের যত্নে অল্প দিনেই পাঠে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র যতদিন পারিলেন, স্বয়ং তাহাকে গৃহে পড়াইলেন। পরে এক জন শিক্ষক আনাইয়া তাহার পাঠের ব্যবস্থা হইল। পরীক্ষার সময় নবীনচন্দ্র স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় যাইলেন; প্রভাত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া আসিল।

প্রভাত যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন তাহাকে পাঠার্থ কলিকাতায় প্রেরণ করাই স্থির হইল। পিসীমা বুঝিলেন, আর তাহাকে রাখিতে পারিবেন না। তিনি হৃদয়ে বিষম বেদনা পাইলেন;—শেষে বিদেশে তাহার যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সব দিয়া তাঁহার বাক্স গুছাইয়া দিলেন। নবীনচন্দ্র তাহাকে কলিকাতায় ছাত্রাবাসে রাখিয়া আসিলেন। গৃহ শূন্য হইল;—পূর্ব্বেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কমলের বিবাহ হইয়াছিল। সে শ্বশুরালয়ে ছিল।

কলিকাতায় ছাত্রাবাসে ছাত্রগণ সাধারণতঃ মাসে যে পরিমাণ অর্থ পায়, প্রভাত তাহার অপেক্ষা অধিক অর্থ পাইত, এবং ব্যয় করিত। বিদ্যালয়ের বেতনাদি আবশ্যক ব্যয় ত সে

পাইতই, তদ্ব্যতীত প্রত্যেকবার কলিকাতা-যাত্রার সময় পিসীমা তাহাকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া দিতেন,—আবার নবীনচন্দ্র প্রতি মাসেই দাদার অজ্ঞাতে তাহাকে কিছু টাকা পাঠাইতেন। প্রভাত বেশবিন্যাসাদিতে অতিরিক্ত মনোযোগ দান করিত—অধিক ব্যয় করিত। শিবচন্দ্র তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলে, নবীনচন্দ্র সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতেন। শৈশবে যেমন পিসীমা তাহার সকল দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেন, এখন তেমনই খুল্লতাত তাহার দোষ বিষয়ে ভ্রাতাকে অন্যমনস্ক রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। এবারও তাহা হইল। পুত্রের বেশে একটা নূতন দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া শিবচন্দ্র কনিষ্ঠকে বলিলেন, "নবীন, দেখিয়াছ—প্রভাত 'সাহেব'দের মত গলায় একটা কি কঠিন দ্রব্য ব্যবহার করে? কেবল অপব্যয়।" নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "দাদা, ওটা ঠিক অপব্যয়ও নহে। এখন ছেলেরা মূল্যবান গরম জামা ব্যবহার করে। ওটা নহিলে জামা মলিন হয়। ও সব এখন রেওয়াজ হইয়াছে। আপনি যেন ঐ জন্য আবার প্রভাতকে তিরস্কার করিবেন না।" শিবচন্দ্র পুত্রকে তিরস্কার করিলেন না; কিন্তু এ কৈফিয়ৎ তাঁহার নিকট সন্তোষজনক বোধ হইল না। তিনি মনে করিলেন, পুত্র অমিতব্যয়ী হইতেছে।

প্রভাত গত বৎসর এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. পড়িতেছে; পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে।

কয় মাস পরে বাড়ীর একমাত্র ছেলে বাড়ী আসিয়াছে;

পিসীমা ও নবীনচন্দ্র অজস্র আদরে তাহাকে যেন বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কমল কয় দিন পূর্ব্বে শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছিল। প্রভাতের জন্য গৃহে নিত্য যে বৃহৎ আয়োজন হইতে লাগিল, তাহা স্নেহ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে হইতে পারে না। পিসীমা ও কমল, উভয়ে নিকটে বসিয়া তাহাকে আহার করান,— নবীনচন্দ্র তাহাকে না লইয়া বাটীর বাহির হয়েন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

"কি হ'বে—আমার মন যদি যায় ভুলে ?
আমার বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।"

দত্তগৃহের চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ব্বপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গান গাহিতেছিলেন। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে 'ক্লবে'র আবশ্যক না হইবার কারণ, গ্রামের এক এক পাড়ায় এক এক গৃহে মিলনক্ষেত্র ছিল—এখনও স্থানে স্থানে আছে। সেখানে ধূমপান, সমাজচর্চ্চা, পরচর্চ্চা, দাবা ও পাশাখেলা এবং সঙ্গীতাদি হইত। গৃহস্বামীর অবারিত আহ্বানে কেহই কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। যে স্থানে জনে জনে ঘনিষ্ঠতাই সামাজিক জীবনের বিশেষত্ব, সে স্থানে এ সঙ্কোচ থাকে না। ভারতবর্ষে এই ঘনিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠতম করিবার জন্য গ্রাম্যসমিতির সৃষ্টি।

চণ্ডীমণ্ডপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গান গাহিতেছিলেন; আর পার্শ্বের কক্ষে প্রভাত ও নবীনচন্দ্র পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রভাত ধরিয়াছে, পরদিবস গ্রামের সীমান্তে বিলে মৎস্য ধরিতে যাইবে। নবীনচন্দ্রের সম্মত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

পর দিন প্রভাত প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিল। নিশাবসানে যখন জীবজগৎ প্রথম জাগরিত হয়, প্রথম আলোকবিকাশ-সূচনাকালের সেই বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য উপভোগের সুযোগ পল্লীগ্রামে যেমন হয়, জনারণ্য ও সৌধারণ্য নগরে তেমন হয়

না। যখন প্রভাতপবনে প্রথম সুপ্তোত্থিত বিহগের কলকূজিত ভাসিতে থাকে, নিশাবসানে প্রকৃতিতে প্রথম জীবনসঞ্চার অনুভূত হয়—সেই শুভ সময়ের শোভা অনুভবযোগ্য—বর্ণনীয় নহে। নবীনচন্দ্র তৎপূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন। উভয়ে ভ্রমণে বাহির হইলেন।

মধ্যাহ্নে আহারের পরই প্রভাত বিলে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পরই পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাহির হইলেন। এক জন ভৃত্য ছিপ, টোপ প্রভৃতি লইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পল্লীবালক চলিল—পথে ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বিলের কূলে একটি বৃদ্ধ বটবৃক্ষ বিলের জল পর্য্যন্ত অবারিত ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নবীনচন্দ্র সেই বৃক্ষ-ছায়ায় বসিলেন, এবং প্রভাতকে বসাইলেন। বঁড়শিতে টোপ গাঁথিয়া জলে ফেলা হইল। সম্মুখে বিলের অনতিগভীর জল-বিস্তার—নিস্তরঙ্গ, স্থির, স্বচ্ছ; কেবল স্থানে স্থানে জলচর-সঞ্চার-চঞ্চলিত জলরাশি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া স্থির হইতেছে, বা তীর পর্য্যন্ত আসিয়া ব্যাকুলতা জানাইতেছে। জলতলে শরতের আকাশে গতিশীল—চঞ্চল শ্বেত মেঘমালা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। রাশি রাশি জলচর বিহঙ্গম উড়িতেছে,—কাহারও দীর্ঘচরণ বিলম্বিত, চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে বিস্ফারিত; কেহ বা বিস্তারিতপক্ষ—অলসগতি। কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিহগ জলের উপরেই দ্রুতবেগে উড়িতেছে। কোথাও কোথাও দুই একটি বিহগ

ডুব দিতেছে। জলে জলজ গুল্ম জন্মিয়াছে; সেই গুল্মমধ্যে ও পঙ্কে বহু জীব জন্মিতেছে—মরিতেছে; বহু জীব সেই জলে জীবন ধারণ করিতেছে, আবার সেই জলে মৃত্যুর অমোঘ অস্ত্র বিষবাষ্প উত্থিত হইতেছে। সে জলরাশি একাধারে রমণীয় ও ভয়ঙ্কর। তীরে বৃক্ষশাখায় বহু হরিৎ পারাবত কূজন-রত; বর্ণ-বৈচিত্র্যরমণীয় অসংখ্য পক্ষী শাখা হইতে শাখান্তরে—বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। দীর্ঘকালের পর এই রমণীয় অবিকৃত স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া প্রভাতচন্দ্রের নগরদৃশ্যক্লান্ত নয়ন যে স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিল, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া?

অদূরে একটি বৃক্ষমূলে বিহগের চঞ্চুচ্যুত ফলের কঠিন অস্থি লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে একটি কাঠবিড়াল নিঃশব্দ-দ্রুত-গতিতে আসিয়া সেটিকে ধরিল; অত্যন্ত নিপুণ হস্তে সেটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিল; উদ্দেশ্য,—ভাঙ্গিয়া মধ্যস্থিত কোমল অংশ আহার করিবে। অল্পক্ষণ পরেই আর একটি কাঠবিড়াল সন্ধান পাইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে আসিল। তখন উভয়ে কলহ আরব্ধ হইল—বিষম সংগ্রামে কেহ ঊর্দ্ধে—কেহ নিম্নে গড়াগড়ি দিতে লাগিল—ফলাস্থি কখনও একের, কখনও অপরের করায়ত্ত হইতে লাগিল। শেষে একটি পরাজিত হইয়া বিষণ্ণমনে প্রস্থান করিল। অপরটি বহু চেষ্টায় সেটি ভাঙ্গিয়া দেখিল, মধ্যে আহারোপযোগী কোমল অংশ নাই। সে তাহা ত্যাগ করিয়া একবার চারি দিকে চাহিল, তাহার পর

ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এত কষ্টই বৃথা!" প্রভাত হাসিয়া উঠিল।

বিলে যথেষ্ট মৎস্য ছিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই মৎস্য ধৃত হইতে লাগিল। প্রথমে ফাৎনা তলাইয়া যায়, পরে সূত্রে টান পড়ে। তখন কি আশা, কি আগ্রহ,—না জানি কত বড় মৎস্য টোপ গিলিয়াছে! সাবধানে সূত্র টানিয়া আনিতে ধৃত জলচরের অঙ্গসঞ্চালনে জল চঞ্চল হইয়া উঠে। ক্রমে স্বচ্ছ জলে তাহার দেহ লক্ষিত হয়; তীরে তুলিলে সে ধড়ফড় করে,—তখন তাহাকে শৈবালমধ্যে রক্ষা করিতে হয়। সময় সময় ধৃত মৎস্য নিতান্ত নিকটে আসিয়াও পলাইয়া যায়, তখন কি হতাশা! জলমধ্যে যেটি অতি বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়, হয় ত তীরে তুলিলে দেখা যায়,—সেটি ক্ষুদ্রকায়! ক্রমে কতকগুলি মৎস্য সংগৃহীত হইল।

এ দিকে বেলাও শেষ হইয়া আসিল। তখন উভয়ে গৃহাভিমুখগামী হইলেন। পল্লীবালকদল কোলাহল করিতে করিতে অগ্রগামী হইল। তখন পশ্চিমদিগন্তে শরতের দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছে। বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত মেঘমালা নৃত্যপরা নর্ত্তকীর চঞ্চল অঞ্চলের মত কখনও বিলম্বিত, কখনও সঙ্কুচিত, কখনও বিস্তারিত, কখনও আন্দোলিত হইতেছে। মেঘের উপর সমান, অসমান, সরল, বক্র রেখায় বর্ণের উপর বর্ণ ফুটিয়া উঠিতেছে; বর্ণের কোলে বর্ণ ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও উদ্ভেদোন্মুখ পদ্মপলাশের লোহিত আভা, কোথাও প্রবালের

নাগপাশ।

রক্তরাগ; কোথাও ধূসরের সহিত ঈষৎ রক্তাভার মিশ্রণ, কোথাও স্বর্ণাভ লোহিত; কোথাও পল্লবরাগতাম্র, কোথাও গাঢ় পাটল; কোথাও নীলে লালে মেশামিশি, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন নীল; কোথাও নীলে শ্বেতের আভাষ, কোথাও নীলের কোলে শ্বেত।

প্রভাত পিতৃব্যের সহিত গৃহে ফিরিতেছিল। যেন তাহারও অজ্ঞাতে তাহার পল্লী-প্রকৃতি নগরের বিকৃতির কৃত্রিম আবরণ ত্যাগ করিতেছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রের আশু ধান্য কর্ত্তিত ও পরিষ্কৃত হইয়া গোলায় উঠিয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে শস্য বিলম্বে পক্ক হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রের ধান্য আনিয়া খামারে ফেলা হইয়াছে। পথিপার্শ্বেই স্থানে স্থানে ভূমিখণ্ড পরিষ্কৃত ও গোময়লিপ্ত করিয়া খামার করা হইয়াছে। সেই খামারে কর্ত্তিতমূল ধান্য বিছান হইয়াছে; তাহার উপর কতকগুলি গরু ঘুরিতেছে। তাহাদের পায়ের চাপে শস্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। পশুগুলি সুযোগ পাইলেই এক এক গ্রাস শীর্ষ মুখে লইয়া আহার করিতেছে। আজ সে বিষয়ে তাহারা নির্ভয়; কারণ, ধান্য মাড়াইয়ের সময় গরু শস্যশীর্ষ আহার করিলে চাষীর তাহাকে তাড়না করিতে নাই।

শরতের সান্ধ্য সমীরণ শীতের আভাষ দিতেছে। তাহার স্পর্শে বৃক্ষপত্র কম্পিত হইতেছে। অল্পকালমধ্যেই সকলে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তখন গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা

হইতেছে ; গ্রামের দেবমন্দির ও কোন কোন গৃহ হইতে আরতির বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে,—ধূনার ধূম পবনে মৃদুমধুর গন্ধের সঞ্চার করিতেছে। সে যেন স্নিগ্ধ শান্তির সুখদ আভাষ। পথে বালকগণ যে যাহার গৃহে প্রবেশ করিল। প্রভাত ও নবীনচন্দ্র গৃহে আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার কয় দিন কাটিয়া গেল। একাদশীর দিন প্রভাতে কমলের স্বামী সতীশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশচন্দ্রের বাস পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে। সতীশচন্দ্র প্রভাতের সতীর্থ ; বয়সে তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। উভয়ে একই বৎসর গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রভাত কলিকাতায় পড়িতে যায়। সতীশচন্দ্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। সে শৈশবে পিতৃহীন, গৃহে কেবল জননী, অন্য অভিভাবক নাই। জমী জমা যাহা ছিল, বহুদিন তত্ত্বাবধানের অভাবে তাহার আয় ক্রমেই কমিতেছিল। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে বিদেশে যাওয়া ঘটিল না। সতীশচন্দ্র যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, সেই বিদ্যালয়েই শিক্ষকের পদ লইয়া গৃহে রহিল। তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু শক্তি সীমাহীন স্থানে প্রযুক্ত না হইয়া সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে প্রযুক্ত হইলে অধিকাংশ স্থলে সুফল দান করে। সতীশচন্দ্রের পক্ষে তাহাই হইল। স্বল্প আকাঙ্ক্ষা ও প্রচুর অবসর লাভ করিয়া সতীশচন্দ্র আপনার মনোবৃত্তিবিকাশে ও অবস্থার যথাসম্ভব উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রবল

জ্ঞানতৃষ্ণা অবস্থানুসারে প্রচলিত সুগম পথে তৃপ্তিসুখগামিনী হইতে না পারিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীরই মত আপনই আপনার পথ করিয়া লইল, এবং আপনার সম্পূর্ণ উপযোগী পথে প্রবাহিতা হইতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই জমীজমার সুব্যবস্থা করিল; কৃষিবিজ্ঞানের অনুমোদিত কৃষিকার্য্যের পরীক্ষায় সফলশ্রম হইয়া আপনার আয় বাড়াইতে সক্ষম হইল। অবস্থা ফিরিল। সতীশ-চন্দ্রের পরোপকারসাধনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল; সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিত। যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, গ্রামবাসীরা রোগে ঔষধ পায়, ইচ্ছুকদিগের পক্ষে দারিদ্র্যদোষে শিক্ষালাভ অসম্ভব না হয়, সে সে সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইত। তাহার সময় জ্ঞানার্জ্জনে, অবস্থার উন্নতিসাধনে ও পরোপকার-চেষ্টায় ব্যয়িত হইত। গ্রামের দুঃখী, দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমজীবী, সকলে তাহাকে যেমন ভালবাসিত, তেমনই শ্রদ্ধা করিত। সতীশের স্নেহশীলা জননী তাহার পরোপকারসাধনব্রতে তাহাকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। তিনি কাহারও নয়নে অশ্রু দেখিতে পারিতেন না। কাহারও আহার হয় নাই শুনিলে, তিনি আপনার অন্ন তাহাকে দিয়া উপবাস করিতে চাহিতেন। পল্লীর দুঃখিনীরা তাঁহাকে দেবী জ্ঞান করিত। তাঁহার দয়ায় অনেকের দিনপাতের সুবিধা হইত; বেদনাকাতর হইলে তাহারা তাঁহাকে কষ্ট জানাইয়া সান্ত্বনালাভ করিত। এই পরিবারে কমলের আদরের অন্ত ছিল না, সুখের সীমা ছিল

না। নিষ্কলঙ্কচরিত্র স্বামীর অনাবিল প্রেমে ও শাশুড়ীর অসাধারণ স্নেহসম্পদে সে সম্পদশালিনী ছিল। সকলের মুখেই সে স্বামীর প্রশংসা শুনিত। তাহার মত সুখ কয় জনের ?

সতীশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছিল ; সেই দিনই ফিরিতে চাহিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না ; তাহাকে চারি দিন থাকিয়া যাইতে হইল।

এ দিকে প্রভাতের পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিল। দুই বৎসর হইতে পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি নিতান্ত জিদ করিলে নবীনচন্দ্র বুঝান, এখন ছেলেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে চাহে ; প্রভাত না হয় দু' দিন পরেই বিবাহ করিবে। এবার পিসীমা নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; প্রভাতকে বলিলেন, "এবার আমি কিছুতেই শুনিব না। মাঘ মাসে তোর বিবাহ দিব।" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দিদি, ওর যদি এখন ইচ্ছা—" পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "ওর আবার ইচ্ছা কি ? বাপ, মা মত করিয়া বিবাহ দিবে, তাহাতে ছেলের আবার মত কি ? তোদের কি সবই নূতন ? তোর বিবাহের সময় তোর মত কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ? তুই চুপ কর। আমি কোনও কথা শুনিব না। মাঘ মাসে উহার বিবাহ দিতেই হইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমের অঙ্কুর।

"সাধু! যত ভণ্ড চোর! যাও, এখানে কিছু হইবে না।"

কলিকাতায় একটি বৃহৎ অট্টালিকার সিংহদ্বারে ভৃত্যগণ এক জন জটাধারী, ভস্মলিপ্তকায় সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। কেহ তাহাকে আপনার করকোষ্ঠী দেখিয়া ফল বলিতে অনুরোধ করিতেছিল, কেহ নানা প্রশ্ন করিতেছিল। সন্ন্যাসী আসর জমকাইয়া বসিয়াছিল। এই সময় বাড়ীর বৃদ্ধ সরকার তাহা দেখিয়া আসিয়া বলিল,—"যাও! এখানে কিছু হইবে না।" সন্ন্যাসী বলিল, "সাধুকে ভোজন—" সরকার বাধা দিয়া বলিল. "ও সব বুজরুকী এখানে চলিবে না। তিন রকমের লোক সন্ন্যাসী হয়,—যমতরাসে. প্রেমেভেসে. সর্ব্বনেশে।" শুনিয়া ভৃত্যের দল হাসিয়া উঠিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে সন্ন্যাসী হয়, সরকার মহাশয়?" সরকার সে কথার উত্তর দিল না। এ দিকে সন্ন্যাসী বুঝিল, তাহার অপেক্ষা চতুর এক জন উপস্থিত; অধিকন্তু ভৃত্যদিগের হাস্যে সে জানিল, আর তাহাদিগকে ঠকাইয়া কিছু পাইবার আশা নাই। সে চিমটা ও কমণ্ডলু তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

দ্বিতলে একটি কক্ষবাতায়নপথে একটি বালিকা ও দুই জন যুবতী সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি

বয়সে বড়, তিনি সহসা সম্মুখে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সর ! সর ! ছেলেরা দেখিতেছে। কি লজ্জা !" সকলে ব্যস্ত হইয়া সরিয়া আসিলেন। সরিতে সরিতে মধ্যমা বলিলেন, "দিদি, ঠাকুরঝির বর।" শুনিয়া বালিকা তাঁহাকে কিল দেখাইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,— "তা' আমি কি করিব ? বরকে বারণ কর, যেন আর বারান্দায় না আসেন।" বালিকা রাগের ভাণ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার নয়নে ও আননে যে হাসির আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে তাহা গোপন করিতে পারিল না।

রাজপথের অপর পারে ছাত্রাবাসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারি পাঁচ জন যুবক সন্ন্যাসী-সরকার-সংবাদে নিবিষ্টচিত্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহাকে যুবতী ননন্দার "বর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে আমাদের পরিচিত—ধূলগ্রামের দত্ত-পরিবারের সর্ব্বস্ব প্রভাতচন্দ্র।

যে বৃহৎ, সুরম্য হর্ম্ম্যের সিংহদ্বারে সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, সে গৃহের অধিকারী কৃষ্ণনাথ বসু কোনও বড় 'হৌসে'র মুৎসুদ্দি। তাঁহার পিতা গবর্মেণ্টের রসদ-বিভাগে কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে অর্থ সদুপায়ে কি অসদুপায়ে অর্জ্জিত, তাহা আমি বলিতে পারি না। কৃষ্ণনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি অল্প বয়সেই 'হৌসে' কর্ম্মরত হয়েন। তখন মেরজাই লোপ পাইতেছে; ধুতির উপর চাপকান চড়াইয়া, তাহার উপর রজ্জুর মত পাকান উত্তরীয়

ফেলিয়া, মস্তকে হাত-বাধা পাগড়ী পরিয়া বাঙ্গালী 'হৌসে' কায করিতেছে।

কৃষ্ণনাথ পৈত্রিক অর্থ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কেহ বলে তাঁহার দশ লক্ষ, কেহ বলে বিশ লক্ষ টাকা আছে। তাঁহার অট্টালিকা রম্য, অশ্বগুলি তেজে ভরা, দাসদাসী অনেক। তাঁহার তিন পুত্র, এক কন্যা। মধ্যম পুত্র বিনোদবিহারী প্রভাতচন্দ্রের সতীর্থ ছিল। একবার এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া সে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। প্রভাতচন্দ্র যে ছাত্রাবাসে বাস করে, তাহা বিনোদবিহারীর গৃহের সম্মুখে; সেই জন্যই তাহার সহিত বিনোদবিহারীর বিদ্যালয়ে আরব্ধ পরিচয় লুপ্ত হয় নাই। বিনোদবিহারী সময় সময় প্রভাতের নিকট আসিত; প্রভাতও বিনোদবিহারীর গৃহে যাইত। প্রভাত যে দরিদ্রসন্তান নহে, তাহা তাহার বেশভূষায় বিনোদবিহারীর বাড়ীর সকলে বুঝিয়াছিলেন। সন্ধান লইয়াও তাঁহারা সে বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথের একমাত্র কন্যা শোভাময়ী একাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিয়াছিল; ক্রমে দ্বাদশও অতিক্রম করিতেছিল। তাহার বিবাহের জন্য ঘটক ঘটকী হাঁটাহাঁটি করিতেছিল। কথায় বলে, লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ কথা শেষ হইয়া গেল, তথাপি কোথাও সম্বন্ধ স্থির হইল না। এক দিন এক জন ঘটকী গৃহিণীর নিকট একটি পাত্রের সন্ধান দিয়া কেবল উঠিতেছে, এমন সময় এক

জন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "মেজবাবুর ঘরে পান চাই।" গৃহিণী বড় বধূকে তাম্বূল আনিতে বলিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কেহ আসিয়াছে না কি?" ভৃত্য উত্তর করিল, "প্রভাতবাবু আসিয়াছেন।"

গৃহিণী বড় বধূকে বলিলেন, "শোভার আমার অমনই একটি ফুট্‌ফুটে বর হয়!" সত্যই প্রভাত অতি সুপুরুষ। বড়বধূ বলিলেন, "মা, প্রভাতের সঙ্গেই কেন ঠাকুরঝির বিবাহ দিন না?"

কথাটা বড়বধূ যে বিশেষ কিছু ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, এমন নহে। তবে অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বৃহৎ বনস্পতি উৎপন্ন হয়, তেমনই অনেক সময় অচিন্তিতপূর্ব্ব, হাসিতে হাসিতে বা ক্রীড়াস্থলে কথিত কথা হইতেও সংসারে অতি গুরু ঘটনা ঘটিয়া যায়। কথাটা পূর্ব্বেও যে গৃহিণীর মনে হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি সে কথা প্রকাশ করিতে ভরসা করেন নাই। প্রভাত তাঁহার পুত্রের সতীর্থ; কেবল সেই সূত্রেই তাহার সহিত পরিচয়। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তাহার পিতামাতা কি এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? অমন ছেলে জামাতা করিতে ইচ্ছা হয়—সত্য; কিন্তু সে যে পল্লীবাসী! ইত্যাদি বিবিধ চিন্তায় তাঁহার মনের ইচ্ছা মুখে প্রকাশিত হয় নাই। নিকটে বিদ্যুৎ পাইলে তড়িৎ-প্রবাহ যেমন প্রবল হইয়া উঠে, তেমনই সমর্থন পাইলে ইচ্ছা প্রবলতা লাভ করে। বড় বধূর কথায় আজ তাহাই

হইল ; গৃহিণী প্রভাতের সহিত দুহিতার বিবাহের কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন,—কর্ত্তাকে বলিলেন। শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"পল্লীগ্রামে মেয়ের বিবাহ দিতে তোমার মত আছে ?" গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মেয়ের অদৃষ্ট কি আমার হাতধরা ? আমি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এখন পরিবার সঙ্গে লওয়া চলিত হইয়াছে। কত লোক যে কত দূর দেশে পরিবার লইয়া যাইতেছে। কলিকাতায় দেখিয়া মেয়ে দিলেই যে কলিকাতায় থাকিবে, এমন কি ধরা আছে ?" কর্ত্তা বলিলেন, "তাহা হইলে সব সন্ধান লইয়া কথা পাড়িতে হয়।"

গৃহে যখন এই কথা প্রকাশ পাইল, তখন দেখা গেল, অনেকেরই আপত্তির প্রধান কারণ, প্রভাতের বাড়ী কলিকাতায় নহে। কিন্তু একটা কায করিতে ইচ্ছা হইলে তাহার স্বপক্ষ যুক্তির অভাব হয় না। যুক্তি বাহির হইতে লাগিল, কলিকাতার বাসন্দা আর কয় জন ? কত "বাঙ্গাল" ত কলিকাতাতেই বাস করিতেছে ! কাযে যাহারা কলিকাতায় আইসে, তাহারা প্রায় কলিকাতাতেই থাকিয়া যায়। প্রভাত পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় থাকিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে।

তখন বিনোদবিহারীর উপর সন্ধান লইবার ভার পড়িল। কলিকাতা প্রভাতচন্দ্রকে তাহার মোহরসে মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিনোদবিহারীর কথার উত্তরে সে বলিল, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কলিকাতাতে কর্ম্ম করাই তাহার

অভিপ্রেত। বিনোদবিহারী বলিল, "তুমি অকৃতদার। যদি কলিকাতাতেই থাকিতে হয়, তবে বোধ হয় এখানে বিবাহ করিলে তোমার কায কর্ম্মের সুবিধা হইতে পারে—আরও নানা বিষয়ে সুবিধা হওয়াও অসম্ভব নহে।" প্রভাত সে কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিল। বিনোদবিহারী বলিল, "তবে কলিকাতাতেই বিবাহ কর না কেন?" প্রভাত উত্তর করিল, "সে বিষয় স্থির করিবার কর্ত্তা, আমার পিতা ও পিতৃব্য।" বিনোদবিহারী বলিল, "তা' ত বটেই। আমার ইচ্ছা, তুমি শোভাকে বিবাহ কর। যদি তুমি বল, তোমার বাটীতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যাইতে পারে।"

এই একান্ত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে প্রভাতচন্দ্রের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তাহার মস্তকে উঠিল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রভাতচন্দ্র বলিল, "এ কথার উত্তর আমি এখনই দিতে পারিতেছি না। বিবেচনা করিয়া দিব।" বিনোদবিহারী বলিল, "ভাল; পরে বলিও।" প্রভাত বলিল, "আগামী কল্য বলিব।" তাহার পর অন্য কথা পড়িল, কিন্তু প্রভাত বড় অন্যমনস্ক। সে কি ভাবিতেছিল।

বিনোদবিহারী যখন চলিয়া গেল, তখনও দিবাবসানের বিলম্ব আছে। প্রভাত ভ্রমণার্থ বাহির হইল। কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল,—গাড়ীবারান্দার রেলে ঝুঁকিয়া শোভা উদ্যানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কি বলিতেছে। প্রভাত নয়ন নত করিল; তাহার পর বাহির হইয়া গেল।

প্রভাতের চক্ষুর সম্মুখে কেবল শোভাময়ীর মূর্ত্তি ভাসিতে লাগিল। তাহার রূপ অসামান্য;' যে বয়সে বাল্য কেবল যৌবনে মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে, অথচ যৌবন আপনার বিকাশ অনুভব করিতে পারে না, তাহার সেই বয়স। প্রভাত-চন্দ্র যে গৃহে থাকিত, তাহার অনতিদূরে একখানি উদ্যান;—নানাজাতীয় বৃক্ষলতা একটি ক্ষুদ্র সরোবরকে বেষ্টিত করিয়া আছে। পথে পবনস্পর্শলোলুপ জনগণ; কেহ কেহ উদ্যান-মধ্যে আসনে উপবিষ্ট; স্থানে স্থানে যুবকগণ সরসীর তৃণমণ্ডিত তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া কথোপকথনরত। প্রভাত অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দেখিয়া এক স্থানে ভূমিতে উপবিষ্ট হইল। সে ভাবিতে লাগিল।

শোভাকে সে পূর্ব্বেও বহুবার দেখিয়াছে; দেখিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছে। ইহার সহিত তাহার বিবাহে অনিচ্ছার কোনও সম্বন্ধ ছিল কি? সে স্থির বুঝিতে পারিল না। তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে প্রভাতের ইচ্ছা ছিল না। প্রথম যৌবনে কয় জন সব ভাবিয়া কার্য্য করে? কয় জন তাহা পারে? সংসারে অভিজ্ঞতালাভের পূর্ব্বে কয় জন বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হয়? কয় জন বাহির ত্যাগ করিয়া ভিতরের কথা ভাবিতে জানে? খনির অন্ধকার গর্ভে মণি থাকে, কয় জন বাহির হইতে তাহার অবস্থান বুঝিতে সমর্থ? নবশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সহজেই নব্যসভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়,—নূতনের মোহে মত্ত হইয়া পরিচিত

পুরাতনকে অবহেলা করে। প্রভাতেরও তাহাই হইয়াছিল: তাই সে পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। প্রভাত উঠিল। তখন রাজপথে আলোকমালা সুদীর্ঘ পন্নগের মত দেখাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত গৃহে আসিল। ছাত্রাবাসে সে একা একটি ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে থাকিত। দ্বারের চাবি খুলিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিল; টেব্‌লের উপর দেশলাই সন্ধান করিয়া লইয়া আলোক জ্বালিল, তাহার পর পড়িতে বসিল। কিন্তু পড়িতে ভাল লাগিল না; সে পুস্তক বন্ধ করিয়া সে আর একখানা পুস্তক খুলিল; তাহাও ভাল লাগিল না। তখন পুস্তক মুক্ত রাখিয়াই সে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল;—ঘুমাইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। বিনোদবিহারীর প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত!

রাত্রি নয়টার পর ছাত্রাবাসের এক জন সঙ্গী প্রভাতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিল। প্রভাত উঠিয়া বসিল। যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল সে বলিল, "তুমি ঘুমাইতেছিলে নাকি?"

প্রভাত উত্তর করিল, "না।"

"তোমাকে যে কয়বার ডাকিয়া উত্তর পাই নাই। চল, আহার্য্য প্রস্তুত।"

উভয়ে নিম্নতলে আহার করিতে গেল।

আহারের পর আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া প্রভাত আবার

ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনা কল্পনা-রঞ্জিত ;—সুখের ভিন্ন দুঃখের নহে।

পরদিন প্রভাত হইতেই প্রভাতচন্দ্র বিনোদবিহারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাতে বিনোদবিহারী আসিল না। প্রভাত কলেজে গেল। সে অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

অপরাহ্নে বিনোদবিহারী আসিল ; অন্যান্য কথার পর, উঠিবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "সে বিষয় কিছু স্থির করিয়াছ কি ?"

বিনোদবিহারী যখন জানিয়া গেল, প্রভাত বিবাহে সম্মত, তখন তাহার পিতার মত লইবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। গৃহিণীর প্রভাতকে জামাই করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল,—কর্ত্তার সম্মতিও সেই কারণে আগ্রহে পরিণত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন পরিচয়।

রবিবার অপরাহ্ণে ভবানীপুরে একটি অবৃহৎ, অপেক্ষাকৃত পুরাতন অট্টালিকার দ্বারে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল। অশ্বদ্বয় বহুদুর হইতে আসিয়াছে; তাহাদের চিক্কণ কৃষ্ণ অঙ্গে স্থানে স্থানে শ্বেত ফেন সঞ্চিত হইয়া আছে। কৃষ্ণনাথ যান হইতে অবতরণ করিলেন; সঙ্গে তাঁহার বাল্যসখা, হাইকোর্টের উকীল শ্যামাপ্রসন্ন রায়। গৃহস্বামী রমানাথ বাবুও উকীল। তিনি গৃহে আছেন, সন্ধান লইয়া উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী প্রবেশপথের দক্ষিণের কক্ষে বসিয়াছিলেন। হর্ম্ম্যতল সিক্ত; কক্ষপ্রাচীর বহুদুর পর্যন্ত রসিয়া উঠিয়াছে। একটা আলনায় একটা চাপ্‌কান, একখানি চাদর, একটা পেণ্টুলেন, একজোড়া মোজা ও একটি শামলা ঝুলিতেছে। এক পার্শ্বে দুইটা আলমারীতে আইনের পুস্তক সজ্জিত—কোনখানা সোজা, কোনখানা বা উল্টা। অপর পার্শ্বে দুইখানি অনুচ্চ তক্তপোষের উপর মলিন বিছানা—স্থানে স্থানে তৈলপাতচিহ্ন। সেই বিছানায় গোটা দুই তাকিয়া, জন দুই মক্কেল ও খানকতক পুস্তকে বেষ্টিত গৃহস্বামী গলদেশে পশমী কম্‌ফর্টার জড়াইয়া, মলিদায় দেহ আবৃত করিয়া মোকর্দ্দমার নথি পরীক্ষা করিতেছিলেন। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া তিনি স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন।

শ্যামাপ্রসন্ন কৃষ্ণনাথের সহিত রমানাথের পরিচয় করাইয়া

নাগপাশ।

শেষোক্তকে বলিলেন, "তোমার কাছে একটু কাযে আসিয়াছি।"

রমানাথ বলিলেন, "কি? বল।"

"তোমার বাড়ীতে ফুলতলার হরিহর ঘোষ থাকেন?"

"হাঁ।"

"কৃষ্ণনাথ একটি ছেলের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। ছেলেটি সম্পর্কে হরিহর বাবুর ভাগিনেয়। অন্য কোনও নিকটসম্পর্কীয় লোকের অভাবে আমরা তাঁহাকেই ধরিতে আসিয়াছি। ছেলের বাপের মত করাইতে হইবে!"

শুনিয়া রমানাথ একটু বিস্মিত হইলেন। হরিহর তাঁহার সামান্য বেতনের মুহুরী। তিনি শেষে ভাবিলেন, "হইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্পর্ক কোথায় বা না থাকে?" ভৃত্য কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে কক্ষে প্রবেশ করিল। রমানাথ তাহাকে বলিলেন, "হরিহরকে ডাকিয়া আন।"

অল্পক্ষণ পরেই হরিহর কক্ষে প্রবেশ করিল। শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "বসুন।"

সে বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। রমানাথ ইঙ্গিত করিয়া বসিতে বলিলেন। সে বসিল।

শ্যামাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধূলগ্রামের শিবচন্দ্র দত্ত আপনার ভগিনীপতি?"

হরিহর বলিল, "হাঁ।"

"তাঁহার অবস্থা কেমন?"

"তাঁহারা বনিয়াদি ঘর। মধ্যে অবস্থা কিছু হেলৃতি হইয়া আসিয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ভালই হইয়াছে, বেশ সঙ্গতিপন্ন।"

"তাঁহার পুত্র প্রভাতচন্দ্র বি. এ. পড়িতেছে। আমার এই বন্ধু তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এ সম্বন্ধ শিববাবুর পক্ষে সৌভাগ্য। যাহাতে এ সম্বন্ধে তাঁহার মত হয়, আপনাকে তাহা করিতে হইবে।"

হরিহরের ইচ্ছা হইল, সত্য কথা বলে,—শিবচন্দ্রের সহিত তাহার সেরূপ ঘনিষ্ঠতার অভাব। কিন্তু মানব-হৃদয়ে নিহিত সম্মানলাভলালসা তাহাকে বুঝাইয়া দিল,—যদি অনায়াসে কৃষ্ণনাথের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানলাভ করা যায়, তাহা ত্যাগ করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। সে বলিল, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "তবে আপনি পত্র লিখুন।"

রমানাথ ও কৃষ্ণনাথ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তখন হরিহর কালী, কলম ও কাগজ আনিল। শ্যামাপ্রসন্ন বলিয়া যাইলেন, সে পত্র লিখিল।

পত্র লিখিত হইলে রমানাথ হরিহরকে বলিলেন, "পত্রখানা এখনই পাঠাইয়া দাও।" হরিহর উঠিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণনাথ ও শ্যামাপ্রসন্ন বিদায় লইলেন।

যান ভবানীপুর ছাড়াইয়া ময়দানে আসিয়া পড়িল। ময়দান যেন নিরানন্দ। শীতবাতে অনেক তরুর অধিকাংশ পত্রসম্পদ

হরিৎ হইতে হরিদ্রায় পরিণত হইয়াছে, বা হইতেছে ;—কতকগুলি পবনতাড়নে নীরস বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে তরুমূলে আসিয়া পড়িতেছে। পত্ররাজি ও ভূমির তৃণাবরণ ধূলিধূসর, ম্লান। রাজপথের উপর বাতাসে ধূলি ভাসিতেছে।

শ্যামাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল করিয়া জানিয়াছ ত ?"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "ছেলেটি বিনোদের সঙ্গে পড়িত। ছেলেটি ভাল। বাড়ীর মেয়েদের বড় ইচ্ছা।"

"মেয়েদের বিবেচনা চিরকালই সমান। কলিকাতার বাহিরে ; অনেক দূর। সে সব ভাবিয়া দেখিয়াছ ?"

"সে আর কি করিব, বল ? বিশেষ, কলিকাতার ছেলের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের ছেলে ভাল হয়, ধীর হয়, লেখাপড়া করে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কষ্ট নাই। বিশেষতঃ ছেলেটি কলিকাতাতেই থাকিবে, কাযেই পল্লীগ্রাম বলিয়া বিশেষ আপত্তির কারণ নাই।"

"বাড়ীর অবস্থার সন্ধান ভাল করিয়া লইও।"

"তা' ত লইতেই হইবে।"

কৃষ্ণনাথ কি ভাবিতে লাগিলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

শ্যামাপ্রসন্নকে তাঁহার গৃহে পৌছাইয়া কৃষ্ণনাথ গৃহে আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

এ দিকে প্রভাত আর কৃষ্ণনাথের গৃহে যায় না;—বড় লজ্জা করে। বিনোদবিহারী প্রায়ই আইসে, কিন্তু সে যায় না। বিনোদবিহারী বিদ্রূপ করিয়া বলে, "বিবাহের কথা বলিয়া তোমাকে যে একেবারে হারাইতে বসিলাম! এখন কোথায় কি তাহার স্থির নাই, কিন্তু তুমি আর আমাদের বাড়ী মাড়াও না। এ যে বিষম লজ্জা!" প্রভাত উত্তর করে না, মুখ নত করিয়া থাকে।

আপনার কক্ষে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত যদি সম্মুখের অট্টালিকার দিকে চাহে, তবে তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়। লজ্জা আপনার মনে। তবুও তাহার অজ্ঞাতে দৃষ্টি কেবল সেই দিকে যায়!

বিনোদবিহারী দেখিল, তাহার বিদ্রূপবাণ প্রভাতের লজ্জার বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না। তখন সে এক দিন সন্ধ্যায় তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। প্রভাত অসুস্থতার ওজর করিল। বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিল, "আমি দেখিতেছি, তুমি বেশ সুস্থ আছ। তোমার রোগ কেবল লজ্জা।" তাহার গমনে বিলম্ব ঘটিলে বিনোদবিহারী স্বয়ং পুনরায় আসিল। প্রভাত বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। শরীর ভাল নাই।" বিনোদবিহারী বলিল, "ও বাঁধা ওজর আমি শুনিব না। তুমি যদি না যাও, তবে আমি আর তোমার এখানে আসিব না।" ইহার উপর আর কথা চলে না। প্রভাত যাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু যেরূপ সাধারণ বেশে

সে এত দিন সম্মুখের বাড়ীতে যাইত, আজ আর সেরূপ হইল না; আজ আয়োজন অনেক।

পথে যাইতে যাইতে বিনোদবিহারী বলিল, "তোমার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমি এ কথা এখনও সকলকে বলি নাই।"

বিনোদবিহারী বলিল বটে, সে কথা সে সকলকে বলে নাই, কিন্তু সে বাড়ীতে তাহার আদর অভ্যর্থনার অতিশয্যে প্রভাতের বুঝা উচিত ছিল, সে কথা প্রকাশ পাইয়াছে—গোপন নাই।

সে বাড়ীতে সকলেই তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনোদবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথও তাহার সহিত আলাপ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে প্রভাত বহুবার এ বাড়ীতে আসিয়াছে; কিন্তু সে বিনোদবিহারীর বন্ধুরূপে। কাযেই তখন সে বিনোদবিহারীর বসিবার ঘরে যাইত, সেখানে তাহারই সহিত কথোপকথন হইত। এবার এই আদরে, আলাপে, যত্নে সে যেমন লজ্জিত হইতে লাগিল, তেমনই আনন্দ অনুভব করিল।

আহারের ব্যবস্থা বহির্বাটী ও অন্তঃপুরের মধ্যপথে—মর্ম্মরমণ্ডিতহর্ম্ম্যতল কক্ষে হইয়াছিল। অন্তঃপুরের দিকে দ্বার ভেজান ছিল; ভোক্তাদিগকে সেই দিকে সম্মুখ করিয়া বসিতে হইল। সেই সকল দ্বারের পশ্চাতে মহিলাদিগের অলঙ্কারশিঞ্জিত ও অঞ্চলবদ্ধ কুঞ্চিকাগুচ্ছের সঞ্চালনধ্বনিও

পুনঃপুনঃ শ্রুত হইতে লাগিল। প্রভাত বুঝিল, অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

সেই হইতে প্রভাতের সে বাড়ীতে গতায়াত কিছু ঘন ঘন হইতে লাগিল। বিনোদবিহারী প্রায়ই আসিত, এবং তাহাকে লইয়া যাইত। কিন্তু শোভা আর পূর্ব্বের মত তাহার সম্মুখে বাহির হইত না। কেবল একদিন বিনোদবিহারীর সহিত তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভাত দেখিল, সুবেশসজ্জিতা শোভা টেব্‌লের উপর একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস রাখিতেছে। প্রভাতকে দেখিয়া লজ্জায় তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল; সে নতদৃষ্টি হইয়া দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিল। বিনোদবিহারী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "পুস্তকখানা কি তোর মেজ বৌদিদি পাঠাইয়াছে?" শোভা উত্তর করিল না; সে একেবারে অন্তঃপুরে যাইয়া মেজ বৌদিদির সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল, "মেজ বৌদিদি, আমি আর কখনও তোমার কোনও কথা শুনিব না। এই জন্যই বুঝি আজ এত সাজান—চুল বাধা?" তিনি যত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুরঝি, কি হইয়াছে?" সে ততই রাগ করে। শোভার সেই লজ্জা-রাগরক্ত আননের ছবি প্রভাতের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গেল।

প্রভাত আকাশে কুসুমকানন রচনা করিতে লাগিল। সে কাননে কুসুমের পার্শ্বে কণ্টক নাই। সে উপবনে কেবল কুসুম, কেবল আনন্দ, কেবল সুখ। হায়, মুগ্ধ যুবকের কল্পনা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিবচন্দ্র কি ভাবিলেন?

হেমন্তের প্রভাতে রৌদ্র কেবল উপভোগযোগ্য মধুর হইয়া আসিতেছে। শিবচন্দ্র প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া আসিয়াছেন; চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। গ্রামের ডাক-হরকরা গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার গাত্রে একখানি অর্দ্ধছিন্ন মলিন বালাপোশ, পদে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলি। সে আসিয়া শিবচন্দ্রকে নমস্কার করিল। শিবচন্দ্র তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিল; তাহার পর ব্যাগের মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবচন্দ্রের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল।

খামের হস্তাক্ষর সুপরিচিত নহে। শিবচন্দ্র খামখানা দুই চারিবার নাড়া চাড়া করিলেন, পরে খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে বিরক্তিভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া শিবচন্দ্র ডাকিলেন, "লক্ষণ!" উত্তর না পাইয়া তিনি পুনরায় ডাকিলেন।

"আজ্ঞা যাই।"—বলিয়া পরক্ষণেই ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবচন্দ্র বলিলেন, "নবীনকে ডাকিয়া আন্।"

যে পাকশালায় আমরা পিসীমাকে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিতা দেখিয়াছি, সেই পাকশালার পশ্চাতে উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গন।

প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি পথ ; পথ উত্তরে বাটীর খিড়কীর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই দ্বিধাবিভক্ত প্রাঙ্গনের পূর্ব্বার্দ্ধে পথিপার্শ্বে বৃতি গঠিত করিয়া মধ্যে ভূমিখণ্ডে শবজীর বাগান করা হইয়াছে। পশ্চিমার্দ্ধে গোশালা। গোশালার সম্মুখে অনাবৃত ভূমিতে এক স্থানে মৃত্তিকা কিছু উচ্চ করিয়া তাহার মধ্যে কয়টি বৃহৎ মৃৎপাত্র প্রোথিত। কয়টি গাভী সেই সকল পাত্রে প্রদত্ত আহার্য্য আহার করিতেছে। অদূরে একটি গোবৎস এক গুচ্ছ বিচালি মুখে লইয়া কি দেখিতেছে। একটি গাভী সম্প্রতি প্রসূতা হইয়াছে ; তাহার দুগ্ধ সেদিন প্রথম পান করা হইবে। নবীনচন্দ্র স্বয়ং দাঁড়াইয়া দোহন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। গাভী বৎসের গাত্র লেহন করিতেছে ; স্নেহরসে তাহার আপীন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গোশালার ভৃত্য ইহার পার্শ্বে বসিয়াছে, দুই জানুর মধ্যে মার্জ্জিত, উজ্জ্বল পাত্র রক্ষা করিয়া দোহন করিতেছে। উষ্ণ দুগ্ধধারা সবেগে ভাণ্ডে পতিত হইয়া অমল শুভ্র ফেনহাস্যময় হইয়া উঠিতেছে।

লক্ষণ আসিয়া নবীনচন্দ্রকে সংবাদ দিল, বড়কর্ত্তা ডাকিতেছেন। নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।" কিন্তু শিবচন্দ্রের আর বিলম্ব সহিল না ; তিনি পত্র লইয়া স্বয়ং আসিয়া ডাকিলেন, "নবীন!"

"যাই, দাদা!" বলিয়া নবীনচন্দ্র দোহনকারীকে বলিলেন, "দেখিস্, যেন বৎসের জন্য পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ থাকে।"

দুই ভ্রাতা বহির্বাটীর অভিমুখে চলিলেন।

নাগপাশ।

সহসা শিবচন্দ্রকে গোশালায় যাইতে ও উভয় ভ্রাতাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পিসীমা রন্ধনশালা হইতে বাহিরে রোয়াকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, শিব ?"

শিবচন্দ্র বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ড।" "এই লও, পড়" বলিয়া তিনি নবীনচন্দ্রকে পত্রখানি দিলেন। নবীনচন্দ্র পড়িলেন,—

"যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

কিছু দিন আপনাদের সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

আপাততঃ নিবেদন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ বসু মহাশয় কলিকাতার এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মুখ্য কুলীন, বিশেষ ধনী। শ্রীমান প্রভাতচন্দ্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কলিকাতায় অনেক বড়লোক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধ আমাদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। যাহাতে এ বিবাহ হয়; আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। আপনি সত্বর সম্মতি দান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার প্রাণগতিক কুশল।

আপনি আমার নমস্কার জানিবেন ও শ্রীযুক্তা দিদি-ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইবেন ; নিবেদন ইতি।

বশংবদ

শ্রীহরিহর ঘোষ।"

শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, "সে কি? ও পাড়ার মিত্ররা আমাদের আশায় আর কোথাও মেয়ের সম্বন্ধ করিল না, সর্ব্বদা আমাদের সংবাদ লয়,। এখন কি হইবে?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, তুমি আর নবীন আদর দিয়া ছোঁড়াটার মাথা খাইলে; দেখ দেখি, এখন কি করা যায়? কে কৃষ্ণনাথ? তাহাকে চিনি না; কেমন বংশ, কেমন ঘর, কিছুই জানা নাই।"

পিসীমা আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

পত্র পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্রও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, শিবচন্দ্র পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি প্রভাতকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "পত্র লিখিয়াছে আর এক জন। ইহাতে প্রভাতের দোষ কি? সে ত কিছু লিখে নাই!"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "সে না জানিলে এ প্রস্তাব হইল কিরূপে? তাহারা কেমন করিয়া জানিল যে, তাহার ঘর করণীয়, সে অকৃতদার? কত ছেলেই ত কলিকাতায় পড়ে, কে তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ করে?"

"সে সব কিছুই ত এখন জানা যাইতেছে না। সন্ধান লইতে হইবে। হয় ত হরিহরই সম্বন্ধ করিতেছে।"

কত ছেলে কলিকাতায় পড়ে, কেহ তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ করে না—এ কথাটা শিবচন্দ্র পুত্রকে বিশেষরূপে অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন। কিন্তু শত ছেলের যাহা

হয় না, প্রভাতের তাহাই হইয়াছে,—ইহাতে পিসীমা শত ছেলের অপেক্ষা প্রভাতের শ্রেষ্ঠত্বই স্পষ্ট অনুভব করিলেন। তিনি বলিলেন, "সত্যই ত, এখনও ত কিছুই জানা যাইতেছে না!"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "ইহার আবার জানাজানি কি? আমি লিখিয়া দিতেছি, আমি কলিকাতার বড়মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিব না।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "মুখ্য কুলীন, বিশেষ হরিহর কুটুম্ব, একটা প্রস্তাব করিয়াছে, অমন ভাবে উত্তর দেওয়া কি ভাল হইবে?"

"তবে কি করিবে? না জানিয়া শুনিয়া সেখানে কায করিবে?"

"আমি তাহা বলিতেছি না। যদি বর করণীয় হয়—সম্বন্ধ আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তবেই কায করিব; নহিলে নহে। আমাদের ছেলে—মেয়ে নহে। সম্বন্ধ অনভিপ্রেত বোধ হয়, একটা কোনও কারণ বলিয়া জবাব দিলেই হইবে।"

"তবে চল; সেই পরামর্শ করি।"

"চলুন। আমি যাইতেছি।"

শিবচন্দ্র অগ্রসর হইলেন।

পিসীমা বলিলেন, "নবীন, কি বল দেখি?"

বড়বধূ ঠাকুরাণী আমিষ-পাকশালার দ্বারান্তরালে ছিলেন, এখন বাহির হইয়া ননন্দার নিকটে দাঁড়াইলেন।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দাদা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তাহারা সন্ধান পাইল কেমন করিয়া?"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিবি?"

"আমি কলিকাতায় যাই। দেখি, ব্যাপার কি। প্রভাতের মত জানি। যদি তাহার মতই হয়!"

"মিত্রবাড়ীর উহারা কি মনে করিবে?"

"মিত্রবাড়ী কায হয়, খুবই ভাল। একান্ত না হয়, কি করা যাইবে? তাঁহারা খুব চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা ত কোনও কথা দিই নাই। এখনকার ছেলে—বড় হইয়াছে, তাহার অমতে কায করা ভাল হইবে না।"

"ইহা তোমরাই করিলে। আমি কবে হইতে বলিতেছি, ছেলের বিবাহ দাও।"

বড়বধূ ঠাকুরাণী ননন্দাকে বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিবে, তাহার উপর ছেলের আবার কথা কি?"

নবীনচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এখন কি আর সে কাল আছে?"

নবীনচন্দ্র বহির্বাটীতে যাইতেছিলেন, পিসীমা তাঁহাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "দেখ্, নবীন, যদি প্রভাতের মতই জানিতে হয়, তবে না হয় সতীশকে দিয়া একখানা পত্র লিখাইয়া দে। তোর কাছে যদি লজ্জায় না বলে?"

নবীনচন্দ্র ভাবিলেন, প্রভাত তাঁহার নিকট যাহা বলিবে না, কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না; তিনি বলিলেন, "না। এখন এ কথা কাহাকেও বলিয়া কায নাই।"

নবীনচন্দ্র বহির্বাটীতে আসিলেন। শিবচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে ছিলেন। নবীনচন্দ্র ভ্রাতার নিকট বসিলেন।

নাগপাশ।

শিবচন্দ্র বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি ?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "হরিহর কুটুম্ব ; কখনও কোনও অনুরোধ করে নাই। সহসা রূঢ় উত্তর দিবেন ?"

"তবে কি লিখি ?"

"বরং লিখুন, নবীন কলিকাতায় যাইবে ; তাহাকে সকল বিষয় অবগত করাইবে। তাহার নিকট সব শুনিয়া উত্তর দিব।"

"তাহা হইলে তোমাকে যাইতে হয়।"

"কাযেই।"

"তবে তাহাই লিখি।"

তখন নবীনচন্দ্র লেখনী প্রভৃতি আনিলেন। শিবচন্দ্র মুক্তার মত অক্ষরে হরিহরকে পত্র লিখিলেন :—

"পরম পোষ্টৃবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম।

শ্রীমান প্রভাতচন্দ্র বাবাজীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছ। সে সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবার জন্য শ্রীমান নবীনচন্দ্র ভায়া কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। তিনি বাবাজীর বাসাতেই থাকিবেন।

এ বাটীর মঙ্গল। তোমার মঙ্গল-সংবাদ সর্ব্বদা পাইতে বাঞ্ছা করি। ইতি ; সাকিন ধূলগ্রাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।"

পত্রখানি ডাকঘরে প্রেরিত হইল।

শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, "দূর দেশ ; কেমন ঘর, কেমন বংশ, কেমন পরিবার, কিছুই জানিবার সুবিধা নাই। কেবল বাহির দেখিয়া কায করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। চিরজীবনের জন্য যাহাকে আনিতে হইবে, তাহাকে ভাল করিয়া না জানিয়া আনা কর্ত্তব্য নহে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তা' ত বটেই। তবে, ছোট মেয়ে, যেমন শিখান যাইবে, অবশ্যই শিখিবে।"

"তাহাই কি সকল সময় হয়, ভাই ? তুমি যাইতেছ ; কোনও কৌশলে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিও।"

নবীনচন্দ্র পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পিসীমা গৃহ-বিগ্রহের উদ্দেশে বলিলেন, "ঠাকুর, যেন কোনও অমঙ্গল না ঘটে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র কি করিলেন।

প্রভাত বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ছাত্রাবাসে আপনার কক্ষের দ্বারে চাবি খুলিতেছে, এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে নবীনচন্দ্র ডাকিলেন, "কে ও? প্রভাত আসিলি?" পার্শ্বের কক্ষের অধিকারী ছাত্রদ্বয়ের এক জন অসুস্থতা প্রযুক্ত বিদ্যালয়ে যায় নাই। তাহার গৃহ ধূলগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে।

প্রভাত দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; শয্যার উপর পুস্তকগুলি ফেলিয়া পিতৃব্যকে প্রণাম করিল; ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি? অসময়ে? বাড়ীর সব ভাল?"

নবীনচন্দ্র দেখিলেন, সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে; বলিলেন, "সব ভাল। তুই যে বড় রোগা হইয়াছিস!"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "আমি পল্লীগ্রামের লোক। চল, আমাকে তোদের সহর দেখাইয়া আনিবি।"

উভয়ে ভ্রমণে বাহির হইলেন। নবীনচন্দ্র প্রভাতের নিকট জ্ঞাতব্য কথার অবতারণার অবসর সন্ধান করিতেছিলেন। অবসর পাইতে বিলম্ব হইল না। রাজপথে আসিয়া নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, সম্মুখে বৃহৎ হর্ম্ম্যের দ্বারে দ্বারবান প্রভাতকে সেলাম করিল। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ী কাহার?"

প্রভাত উত্তর করিল, "কৃষ্ণনাথ বসুর।"

নবীনচন্দ্র মনে মনে হাসিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, "ও বাড়ীতে কাহারও সহিত তোর পরিচয় আছে নাকি ?"

প্রভাত বলিল, "কৃষ্ণনাথ বাবুর মধ্যম পুত্র বিনোদবিহারী আমার সহপাঠী ছিল।"

"খুব ত বড় বাড়ী! কৃষ্ণনাথ বাবু বড়লোক ?"

"হাঁ।"

"কৃষ্ণনাথ বাবুর কন্যার সহিত তোর বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে।"

প্রভাত কোনও কথা কহিল না; নতদৃষ্টি হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, তাহার কর্ণদ্বয় রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে,—সে এ কথা অবগত আছে। তিনি বলিলেন, "তোর মত জানিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।"

প্রভাত কোনও উত্তর দিল না; মুখ তুলিল না।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কি বলিস্ ? বল।"

প্রভাত বলিল, "আমার আবার মত কি ?"

"তোর মতই আবশ্যক। তোর মতেই আমার মত। তোর যদি ইচ্ছা থাকে, তবে দাদার মত করাইব।"

"তিনি অমত করিয়াছেন ?"

"অমত আর কি! তেমন আগ্রহ নাই।"

"তবে আমি কিছুতেই এখানে বিবাহ করিব না।"

নবীনচন্দ্র অন্য কথার অবতারণা করিলেন।

রাত্রিকালে আহারের পর প্রভাত তক্তপোষের উপর হইতে আপনার শয্যা নামাইল। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "শয্যা নামাইতেছিস্ কেন ?"

প্রভাত উত্তর করিল, "আপনার শয্যা রচনা করিব।"

"আর তুই ?"

"আমি নিম্নে শয়ন করিব।"

"কেন ? আমি নিম্নে শয়ন করিলে কি ক্ষতি হইত ?"

তিনি প্রভাতকে নিম্নে শয়ন করিতে দিবেন না; প্রভাতও তাঁহাকে নিম্নে শয়ন করিতে দিবে না। শেষে টেব্‌ল ও চেয়ার তক্তপোষের উপর স্থানান্তরিত করিয়া হর্ম্ম্যতলেই উভয়ের শয্যা রচিত হইল।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এখন বল, এ বিবাহ সম্বন্ধে তোর মত কি ?"

প্রভাতকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমি বড় মুখ করিয়া আসিয়াছি, তোর মত জানিয়া যাইব। ভাবিয়াছি, তুই আমাকে কিছু গোপন করিবি না।"

এবার প্রভাত বলিল, "বাবার যাহাতে অমত, আমি সে কায কখনই করিব না।"

নবীনচন্দ্র সস্নেহে প্রভাতের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "পাগল ছেলে, বাপমা'র সবই ত ছেলের সুখের জন্য। তাঁহার মতের ভার আমার রহিল। তুই তোর প্রকৃত মনোভাব আমাকে বলিবি না ?"

নবীনচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই অবশ্যই কোন দিন না কোন দিন মেয়েটিকে দেখিয়াছিস। মেয়েটি সুন্দরী?"

প্রভাত মস্তকসঞ্চালনে জানাইল—হাঁ।

নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিবাহে তোর ইচ্ছা আছে। না?"

প্রভাত নতমুখে রহিল।

নবীনচন্দ্র বুঝিলেন, বলিলেন, "যাহাতে এ বিবাহ হয়, আমি তাহা করিব। তুই ভাবিস্ না।"

প্রভাত ধীরে ধীরে বলিল, "বাবার অমতে আমি এ কাজ করিব না।"

"তাঁহার নিকট কি তোর সুখের অপেক্ষা আর কিছু বড়? সে ভয় করিস্ না। সে ভার আমার।"

রাত্রিকালে নবীনচন্দ্রের যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি তখনই দেখিলেন, প্রভাত জাগিয়া। তিনি বুঝিলেন, রোগ কঠিন।

প্রত্যুষে উঠিয়া নবীনচন্দ্র জাগ্রত প্রভাতকে বলিলেন, "তোর সকালে উঠা অভ্যাস নাই; ঘুমা। আমি ভবানীপুরে যাইব। হরিহরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিব।"

ভবানীপুরে যাইয়া নবীনচন্দ্র হরিহরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পত্র লিখিবার কারণ অবগত হইলেন, এবং তাহাকে মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করিয়া ফিরিলেন।

এ দিকে বিনোদবিহারী প্রভাতের নিকট আসিয়া নবীনচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া গিয়াছিল। হরিহর পূর্ব্বদিন শিবচন্দ্রের

পত্রের বিষয় রমানাথকে জানাইয়াছিল; তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া শ্যামাপ্রসন্ন বাবু কৃষ্ণনাথকে সে সংবাদ দিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্পক্ষণ পরেই বিনোদবিহারী পুনরায় আসিয়া জানিয়া গেল, তিনি ফিরিয়াছেন। তাহার পরই কৃষ্ণনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, আপনার শরণাগত—আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

নবীনচন্দ্র স্বাভাবিক বিনয়সহকারে বলিলেন, "আপনার সহিত কুটুম্বিতা ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা। আমি যাইয়া দাদাকে সব বলিব।"

কৃষ্ণনাথ পূর্ব্বেই বিনোদবিহারীকে দিয়া প্রভাতের নিকট সন্ধ্যায় নবীনচন্দ্রকে আহারের নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রভাত বলিয়াছিল, এক দিনের পরিচয়ে নিমন্ত্রণে তিনি কোনও কারণ দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণনাথ আর এক কৌশল করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনাথ পুনরায় নবীনচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে শ্যামাপ্রসন্ন। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আমার গৃহে আজ সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছে। আপনাকে পদধূলি দিতে হইবে।" নবীনচন্দ্র অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি যৌবনে সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছিলেন; সাধনায় সিদ্ধিলাভও হইয়াছিল। মৃদঙ্গবাদনে তিনি দেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি আর কোনও বাদ্যযন্ত্র

স্পর্শ করেন নাই, যে যন্ত্র যে চাহিয়াছে, সে যন্ত্র তাহাকেই দিয়াছেন।

কৃষ্ণনাথের বৃহৎ বৈঠকখানা আজ বিশেষরূপ সুসজ্জিত; কুসুমে, আলোকে, আবরণযুক্ত চিত্রে—সে বৃহৎ কক্ষ মনোরম। আর সেই সুসজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল কক্ষে নিপুণ বাদকের হস্তে বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি, সুগায়কের কণ্ঠোদ্ভূত সুস্বরলহরী।

কিছুক্ষণ সঙ্গীতের পর কৃষ্ণনাথ নবীনচন্দ্রকে বলিলেন, "বেহাই! অনুগ্রহ করিয়া একবার গাত্রোত্থান করিতে হইবে।"

কৃষ্ণনাথ ও শ্যামাপ্রসন্ন একান্ত জিদ করিতে লাগিলেন,—মিষ্টমুখ করিতেই হইবে অনন্যোপায় হইয়া নবীনচন্দ্র উঠিলেন।

পার্শ্বের কক্ষে আসিয়া নবীনচন্দ্র দেখিলেন, বিপুল আয়োজন; —বিবিধ রৌপ্যপাত্রে বহুবিধ আহার্য্য ও পানীয় সজ্জিত। সে সকলের সদ্ব্যবহার করা একের সাধ্যাতীত। নবীনচন্দ্র ভাবিলেন, সহরে আহারের আয়োজন প্রধানতঃ দেখাইবার জন্য।

আহারের সময় শ্যামাপ্রসন্ন আবার বিবাহের কথার উত্থাপন করিলেন। অন্য কথার মধ্যে কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আমি জামাতাকে দ্রব্যে বলুন বা নগদে বলুন, চারি সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

স্বভাবতঃ বিনয়ী নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে একটা কি ছিল, যাহা অন্যায় সহ্য করিতে পারিত না, আত্মসম্মানে আঘাত সহ্য করিত না। তিনি বলিলেন, "আমরা বড়মানুষ নহি; কিন্তু পুত্রের বিবাহ দিয়া টাকা লইতে পারিব না। শুনিয়াছি, পুত্রবিক্রয়প্রথা সহরে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামে যে কয় দিন

না যায়, সেই কয় দিনই ভাল। আমরাও কন্যার বিবাহ দিয়াছি ; কিন্তু বরপক্ষীয়গণ দরের কোনও কথা বলেন নাই।"

বুদ্ধিমান শ্যামাপ্রসন্ন বুঝিলেন, টাকার কথাটা প্রলোভনীয় না হইয়া বিপরীতফলপ্রসূ হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি বলিলেন, "সে কথা নহে। আপনারা মহৎ ব্যক্তি, আপনাদিগকে কি আমরা সে কথা বলিতে পারি ? কৃষ্ণনাথের এক মেয়ে, জামাতাকে কিছু যৌতুক দিতে ইচ্ছা করে, তাই আপনার অনুমতি চাহিতেছে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তাহাতে আমাদের মতামত কি ?"

শ্যামাপ্রসন্ন অন্য কথার উত্থাপন করিলেন।

কৃষ্ণনাথের কনিষ্ঠ পুত্র নলিনবিহারী শ্যামাপ্রসন্নকে কি বলিয়া গেল। শ্যামাপ্রসন্ন কৃষ্ণনাথকে বলিলেন, "যাও ; শোভাকে লইয়া আইস। শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া যাউক।"

কৃষ্ণনাথ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই সুবেশসজ্জিতা, বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা, অমলস্রগ্দামশোভিতা কন্যাকে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। শোভা নবীনচন্দ্রকে প্রণাম করিল। নবীনচন্দ্র যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণনাথের কন্যা সত্যই সুন্দরী।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণনাথের কুল শীল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলেন।

নবীনচন্দ্র পরদিন গৃহে যাইতে পারিলেন না ; ঘটকের নিকট কৃষ্ণনাথের কুলপরিচয় লইয়া আসিলেন। তিনি জানিলেন, কৃষ্ণনাথের সঙ্গে সম্বন্ধ সে হিসাবে স্পৃহনীয়।

সে দিন কৃষ্ণনাথ পুনরায় নবীনচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নবীনচন্দ্র সেইদিন রাত্রিতে গৃহে যাইবার জন্য যাত্রা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইল না। তিনি শিবচন্দ্রের এক পত্র পাইলেন।—নবীনচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয় তাঁহার একমাত্র সন্তান—নবীনচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যুর পর সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু ঘটে। এক্ষণে তিনি পীড়িত হইয়া নবীনচন্দ্রকে যাইতে লিখিয়াছেন। শিবচন্দ্র সেই পত্র পাঠাইয়াছেন, এবং স্বয়ং লিখিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের পক্ষে কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করাই কর্ত্তব্য।

সেই পত্র পাইয়া নবীনচন্দ্র কাশীযাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদ ও সম্পদ।

নবীনচন্দ্র কাশীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর মৃত। নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করায় বৃদ্ধ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু কন্যার মৃত্যুজনিত শোকে তিনি সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী জীবিতা থাকিতে কয়বার দৌহিত্রীকে আনাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বলিতেন, "আর সংসারের মায়া জড়াইও না।" পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি দৌহিত্রীকে আর নিকটে আনেন নাই; কিন্তু নবীনচন্দ্রের ও তাহার সংবাদ সর্ব্বদাই লইতেন।

তিনি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সংস্থানের পরিমাণ নবীনচন্দ্র জানিতেন না—এইবার জানিলেন। তাঁহার উইল রেজেষ্ট্রী আফিসে ছিল, নকল তাঁহার হাতবাক্সে ছিল। তাহার নির্দ্দেশ,—তাঁহার পঁয়ষট্টি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের পাঁচ হাজার টাকার কাগজ তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী কমলকুমারীর; এক হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া অর্থ তাঁহার ভৃত্যদিগকে দান করা হইবে; তিনি যে সকল দরিদ্রকে মাসিক সাহায্য করিতেন, চারি হাজার টাকার কাগজের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্দ্দেশমত তাহাদিগকে এককালীন দান করিতে হইবে; অবশিষ্ট সমস্ত কাগজ, দেশের ও কাশীর গৃহ, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার জামাতা শ্রীমান নবীনচন্দ্র দত্তের।

নবীনচন্দ্র কলিকাতার পথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কৃষ্ণনাথ সকল কথা শুনিলেন, এবং দ্বিগুণ আগ্রহে প্রভাতের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। প্রভাত আসিয়া খুল্লতাতকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র যখন গৃহে উপনীত হইলেন, তখন শিবচন্দ্র কোনও প্রতিবেশীর গৃহে একটা সামাজিক কার্য্যের জন্য ফর্দ্দ করিতে-ছিলেন। নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরের দ্বার হইতে দিদিকে ডাকিয়া প্রবেশ করিলেন। পিসীমা ও বড়বধূঠাকুরাণী তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিলেন। প্রভাতের কুশলবার্ত্তা ও কাশীর সংবাদের পর প্রভাতের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা উঠিল। নবীনচন্দ্রের মুখে কৃষ্ণনাথের প্রশংসা আর ধরে না। তিনি বলিলেন,—কৃষ্ণনাথ মুখ্য 'কুলীন, স্পৃহনীয় ঘর, বিশেষ ধনবান, অতি অমায়িক, তিনি যে কয় দিন কলিকাতায় ছিলেন, প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; মেয়েটি 'পরমাসুন্দরী'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাতের মন জানিলি?"

নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "দাদাকে বলিও না, তিনি শুনিলে রাগ করিবেন : এই সম্বন্ধেই ছেলের মত।"

"শিব কি মত দিবে?"

"তোমাকে আর আমাকে তাঁহার মত করাইতে হইবে। ছেলের অমতে কায করা হইবে না। তাহার সুখের অপেক্ষা কি আর কিছু বড়?"

বড়বধূঠাকুরাণীর মুখ গম্ভীর হইল।

পিসীমা বলিলেন, "কিন্তু, মিত্র বাড়ীর—"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "চুপ কর। ও কথা আর তুলিও না। একেই দাদার মত করান সহজ হইবে না; তাহাতে আবার তুমি যদি অমত কর, তবেই বিপদ। ছেলের যখন এ বিবাহে ইচ্ছা, তখন যাহাতে এ কায হয়, তাহাই করিতে হইবে।"

পিসীমা নীরব হইলেন। প্রভাতের সুখের অপেক্ষা আর কিছুই বড় নহে।

বড়বধূঠাকুরাণীর মুখ গম্ভীর দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আপনি যেন অমত করিবেন না!"

নবীনচন্দ্র স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, শিবচন্দ্র তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া গৃহে ফিরিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অগ্রজের নিকট নবীনচন্দ্র কাশীর সকল সংবাদ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারীদিগকে সংবাদ দিয়াছ?"

নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "দিয়াছি। লিখিয়াছি, তাঁহারা যথারীতি নিয়ম পালন করেন; শ্রাদ্ধ যে স্থানে করা আপনার মত হয়, তাঁহাদিগকে জানাইলে তাঁহারা আসিয়া কার্য্য করিবেন।"

"লিখিয়াছ, ব্যয় আমাদের?"

"লিখিয়া দিব।"

তাহার পর নবীনচন্দ্র কৃষ্ণনাথের কন্যার সহিত প্রভাতের

বিবাহের কথা পাড়িলেন। শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্বন্ধ কিরূপ বোধ হয়?"

নবীনচন্দ্র কৃষ্ণনাথের গুণের ও তাঁহার কন্যার রূপের প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করিলেন; বলিলেন, "প্রভাত যদি কলিকাতাতেই কায করে, তবে এখানে বিবাহ হইলে একটা মুরুব্বি হইতে পারে।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "সহরের 'বড়লোকে'র সঙ্গে কুটুম্বিতা,—ইহাতে আমার মন সরিতেছে না।"

"মেয়ে আনিব বই ত মেয়ে দিব না।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সেই ত বিপদ। গরীবের মেয়ে 'বড়মানুষে'র ঘরে পড়িলে সুখে থাকিতে পারে; কিন্তু 'বড়-মানুষে'র মেয়ে আমাদের ঘরে আসিলে তাহার যে কষ্ট হইবে।"

নবীনচন্দ্র অগ্রজকে জানিতেন; আগ্রহ না দেখাইয়া বলিলেন, "সুবিধা অসুবিধা সব বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

"তুমি কি বলিয়া আসিয়াছ?"

"আমি বলিয়া আসিয়াছি, আমি দাদাকে সব বলিব; তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।"

তাহার পর নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি বা প্রভাতের মতে এ সম্বন্ধ আসিয়াছে। আমি তাহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সে বলিল, আমার আবার মতামত কি? আপনি যাহা বলিবেন, সে তাহাই করিবে।"

কথাটা শুনিয়া শিবচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন—সন্দেহ কাটিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর কি বলিল?"

নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "প্রভাত যে ছাত্রাবাসে থাকে, তাহার সম্মুখেই কৃষ্ণনাথ বাবুর গৃহ ; তাঁহার এক পুত্র প্রভাতের সহপাঠী। তাঁহারা সন্ধান করিয়া হরিহরের মনিবকে ধরিয়াছিলেন ; তিনি হরিহরকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছিলেন।"

"তুমি এ সম্বন্ধ কিরূপ বিবেচনা কর ?"

"আমার বোধ হয়,—মন্দ নহে।"

"এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। দুই জনে পরামর্শ করিব।"

নবীনচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। তিনি জানিতেন, আর আগ্রহ প্রকাশ করিলে শিবচন্দ্রের সন্দেহ হইবে।

দেখিতে দেখিতে নবীনচন্দ্রের শ্বশুরের শ্রাদ্ধের সময় সমাগত হইল। শিবচন্দ্র গ্রামে কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। তাহাই হইল। শ্রাদ্ধের অধিকারীকে আনাইয়া শ্রাদ্ধ করান হইল।

এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রভাত গৃহে আসিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে ছুটী না থাকায় অধিক দিন থাকিতে পারিল না। নবীনচন্দ্র পূর্ব্বেই ভগিনীকে সাবধান করিয়াছিলেন, "দিদি, প্রভাতকে বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। এ বিবাহে যে তাহার ইচ্ছা আছে, সে যে মেয়ে দেখিয়াছে, আমরা যে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই এ বিবাহের পক্ষপাতী, দাদা যদি এ সন্দেহ করেন, তবে হয় ত তিনি বাঁকিয়া বসিবেন।"

প্রভাত চলিয়া গেল। নবীনচন্দ্র ভগিনীকে বলিলেন, "দিদি, দেখিলে ত,—ছেলের আর সে শ্রী নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলে অমন হইয়াছে। এবার ভাল করিয়া দাদাকে বলিয়া এ বিবাহে

তাঁহার মত করাও। তুমি নহিলে এ কায আর কেহ পারিবে না। তুমি দাদাকে ধর।"

শ্রাদ্ধের পর হইতেই পিসামা প্রভাতের বিবাহের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন, "আমি কবে মরি,—প্রভাতের ছেলে দেখা অদৃষ্টে নাই। যে দু'টাকে মানুষ করিয়াছি, তাহারা এখন আর কাছে থাকে না। বাড়ী শূন্য—বালকবালিকা নহিলে কি বাড়ীর শোভা হয়?" এইরূপ কথায় শিবচন্দ্র বিচলিত হইলেন; নবীনচন্দ্রকে বলিলেন, "নবীন, দিদি প্রভাতের বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, ছেলেও বড় হইয়াছে। একটা সম্বন্ধ স্থির কর।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দুই স্থানে সম্বন্ধ উপস্থিত; উভয় পক্ষই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।"

ইহার পর পিসীমা'র ও নবীনচন্দ্রের আগ্রহে কৃষ্ণনাথের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহে শিবচন্দ্রের আপত্তির হ্রাস হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দুই জনের আগ্রহ প্রবলতরভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

শেষে এক দিন সতীশচন্দ্রকে সংবাদ দেওয়া হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পল্লীলক্ষ্মী।

সন্ধ্যাকালে সতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিল। তখন পাখীরা নীড়ে নিদ্রিত, কৃষক ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত, গৃহে গৃহে শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িতেছে, পল্লীর কলরব ক্রমেই শান্ত হইতেছে। চন্দ্র কেবল উদিত হইতেছে,—জ্যোৎস্নালোকে ধূলিধূসর রাজপথ বৃহৎ অজগরের মত লক্ষিত হইতেছে। তৃণদলে কেবল শিশির সঞ্চিত হইতেছে। শীতের আকাশে তারকাকুল উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সতীশচন্দ্রের গৃহখানি অল্প দিন সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হইয়াছে, গৃহের প্রাঙ্গনে তরুলতা এখনও তেমন বর্দ্ধিত হয় নাই। পূর্ব্বে দক্ষিণদ্বারী চালাঘর ছিল। সতীশচন্দ্র যখন ইমারত গঠন করিতে চাহিল, তখন মা বলিলেন, "অগ্রে বাহিরের অংশ কর।" কিন্তু সতীশচন্দ্র তাহা শুনিল না; অগ্রে অন্তঃপুর শেষ করিল। বাহিরের অংশ এই বৎসর মাত্র শেষ হইয়াছে। ভূমির উপর গৃহের ভিত্তিস্তর উচ্চ; গৃহ অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত নহে,—সরল শোভায় সুন্দর, পল্লীগ্রামের বৃক্ষলতার শ্যামশোভার মধ্যে ছবিখানির মত প্রতীয়মান হয়; তাহাতে উপযোগিতা ও শোভা উভয়ই বিদ্যমান।

বাহিরে বসিবার ঘরের পার্শ্বের কক্ষে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া, হস্তপদাদি-প্রক্ষালনের পর সতীশচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!"

মা পুত্রের জন্য একখানি গালিচা পাতিয়া দিলেন। সতীশচন্দ্র

সিল। মা প্রাঙ্গনের অপর দিকে পাকশালায় যাইয়া কমলকে বলিয়া আসিলেন, "বৌমা, ভাত দাও; সতীশ আসিয়াছে।" ফিরিয়া আসিয়া মা পুত্রের আহারের আয়োজনে আসনাদি যথাস্থানে প্রদান করিলেন। এই সময় পার্শ্বের কক্ষে সতীশচন্দ্রের বর্ষমাত্রবয়স্ক পুত্র কাঁদিয়া উঠিল। মা তাহাকে আনিলেন। এ দিকে কমল অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া গেল। সতীশচন্দ্র আহার করিতে বসিল। মা পৌত্রকে অঙ্কে লইয়া তাহার নিকট বসিলেন; প্রদীপটি উস্কাইয়া দিলেন। মাতাপুত্রে কত কথা হইতে লাগিল।

আহারান্তে সতীশচন্দ্র বহির্বাটীতে আসিল। বসিবার ঘরে সেজে গেলাস জ্বলিতেছিল; সতীশচন্দ্র একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে দুই জন কৃষক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা একটা নূতন ফসলের চাষের কথা জানিতে আসিয়াছিল। সতীশচন্দ্রের উৎসাহে ও পরামর্শে তাহারা অল্পে অল্পে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিল। সতীশচন্দ্র তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিত, আবশ্যক স্থলে অর্থসাহায্যও করিত। সতীশচন্দ্র তাহাদিগকে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিল; তাহারা বুঝিল। বাঙ্গালার কৃষক পরিচিত ও পরিজ্ঞাত পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত নূতন পথে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করে না, সে রক্ষণশীলতা নিন্দনীয় নহে। সে নির্ব্বোধ নহে। কৃষিবিষয়ে তাহার অভাব, আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না। কেবল অবস্থায় কুলায় না বলিয়াই সে সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারে না।

কৃষকদিগকে বুঝাইয়া বিদায় দিয়া, সতীশচন্দ্র যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। ছেলে ঘুমাইয়া আছে; কমল হর্ম্ম্যতলে পাটীর উপর বসিয়া দীপালোকে 'রামায়ণ' পাঠ করিতেছে। লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবনে আনিয়া রামের আদেশ শুনাইতেছেন। পাঠ করিতে করিতে রাম, সীতা, দেশ, কাল, সব বিস্মৃত হইয়া রমণীহৃদয় রমণীর দুর্দ্দশাদুঃখে ব্যথিত হইতেছিল। সতীশচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। কমল মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, নয়নে অশ্রু টলটল করিতেছে। সেই দীপালোকে সমুজ্জ্বল —পূত অশ্রুর দীপ্তির তুলনায় হীরকের দীপ্ত দীপ্তি তুচ্ছ। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "পড়িতে পড়িতে কাঁদিতেছ?"

কমল সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; বলিল, "কই?" কিন্তু গলাটা বড় ধরাধরা কথা অশ্রুবাষ্পজড়িত, আর সেই কথা বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রু আঁখিতট ছাপাইয়া গড়াইয়া পড়িল।

সতীশ পত্নীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পড়িতেছিলে?"

কমল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সতীশ পড়িতে লাগিল। শুনিয়া কমলের অশ্রু দ্বিগুণ বহিতে লাগিল। শেষে স্বামীর মধুর কণ্ঠে সেই করুণাসিক্ত পুণ্য কাহিনী শুনিতে শুনিতে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সতীশ পুস্তক রাখিয়া পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইল। স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া কমল কাঁদিয়া মনের ভার লাঘব করিল।

সে স্থির হইলে সতীশ বলিল, "তোমার দাদার বিবাহ স্থির হইল।"

কমল জিজ্ঞাসা করিল, "মিত্রবাড়ী ?"

"না। কলিকাতায়।"

"জ্যেঠামহাশয়ের মত হইল ?"

"তাঁহার বড় মত ছিল না। তোমার বাবা আর পিসীমা বিশেষ জিদ করিলেন ; তাই অগত্যা তিনি মত দিলেন।"

"সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি বলিলে ?"

"শ্বশুর মহাশয় পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে প্রভাতের ইচ্ছা ; কাযেই আমি আর মতামত প্রকাশ করি নাই।"

"দাদা বুঝি আপনি সব স্থির করিয়াছে ?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "কেন, তাহাতে দোষ কি ?"

দোষ কি, তাহা বুঝান যায় না। তবে ইহা প্রচলিত প্রথা নহে, —তাই কেমন নূতন বোধ হয়। কমল চুপ করিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে কমল বলিল, "কিন্তু জ্যেঠামহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি ঠিক নহে ?—সহরের মেয়েদের অভ্যাস অন্যরূপ ; পল্লীগ্রামে কি তাহাদের অসুবিধা হয় না ?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব ? তবে আমরা পল্লীবাসী, পল্লীবাসিনী লইয়াই কাটাইলাম ;—প্রভাতের ভাগ্য নগরবাসিনী জুটে, সে ত সুখের কথা।"

কমল বলিল, "কেন, তোমার কি সেই ইচ্ছা হইয়াছে নাকি ?"

"যে যাহা না পায়, তাহার পক্ষে তাহার জন্য লোভ হওয়া কি আশ্চর্য্য ?"

"তা সাধ পূরাইতেই বা কতক্ষণ ?"—কমল রহস্য করিয়া কথাটা বলিল বটে, কিন্তু বলিতে তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল, সতীশ রহস্যচ্ছলে এ কথা বলিল ; কিন্তু রহস্যচ্ছলেও এ কল্পনা তাহার পক্ষে কষ্টকর। তাই তাহার হাসি অশ্রুসিক্ত।

সতীশ বলিল, "আর সাধাসাধিতে কায নাই। চল, শয়ন করি।" সতীশ পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

কমলের সব কষ্ট দূর হইল।

সে রাত্রিতে স্বামীস্ত্রীতে এই বিবাহ-সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক কথা হইল। কমল জিজ্ঞাসা করিল, "মা'কে বলিয়াছ ?"

সতীশ বলিল, "হাঁ। তাঁহার মত, দেশে বিবাহ হইলেই ভাল হইত।"

"পিসীমা যে সহজে মিত্রবাড়ীর সম্বন্ধ ছাড়িতে সম্মতা হইলেন ?"

"প্রভাতের ইচ্ছা বলিয়াই তিনি এ প্রস্তাবে মত করিয়াছেন—জিদ করিয়াছেন।"

"জ্যেঠামহাশয় বরাবরই বলেন, বাবার আর পিসীমা'র অতিরিক্ত আদরেই দাদা যাহা ইচ্ছা করে।"

"কিন্তু তোমার জ্যেঠাইমা'র মত ত জানা যায় নাই।"

"জ্যেঠাইমা কখনও বাবার ও পিসীমা'র কথার বিরুদ্ধে কিছু

বলেন না। আর তাঁহারা যখন জ্যেঠামহাশয়েরই মত করাইয়াছেন, তখন জ্যেঠাইমার মত ত সামান্য কথা।"

"প্রভাত স্বয়ং দেখিয়া স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতেছে—সে সুখী হউক; তাহাতেই আমাদের সুখ।"

"হাঁ। তাহা ছাড়া আমাদের আর অন্য ইচ্ছা নাই।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর।

মাঘ মাসে শোভার সহিত প্রভাতের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ শ্বশুরালয়ে আসিল। পাকস্পর্শাদি যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্বশুরালয়ে নববধূ শোভাময়ীর আদরযত্নের অন্ত রহিল না। পিসীমা'র ও কমলের যেন আর আহার নিদ্রা নাই; উভয়েই সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া ব্যস্ত। নবীনচন্দ্র—কেবল কিসে বধূর কোন রূপ অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজনে ব্যস্ত। বধূর সঙ্গে যে দাসদাসীরা আসিয়াছিল—তাহারাও যেন কুটুম্বের মত আদর পাইতে লাগিল। কিন্তু দাসীটির যেন কিছুতেই মন উঠে না। তাহার ব্যবহারে মনে হইত, সে পদে পদে মনে করিতেছে, —এত আদর যত্নও যেন শোভার পক্ষে যথেষ্ট নহে—সে বিষয়ে সে মনোযোগ না দিলে হইবে না। তাহার এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইলেন; কিন্তু পিসীমাও কিছু বলিলেন না; কুটুম্ববাড়ীর লোক—কিছু বলিলে নিন্দা হইবে।

এই আদর যত্নে শোভা যে প্রীতা না হইল, এমন নহে। কিন্তু সে আদর যত্ন প্রকাশের প্রণালী তাহার নিকট কেমন নূতন বলিয়া বোধ হইত। প্রায় এক পক্ষ কাল পরে পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে তাহার ভ্রাতৃজায়াদিগের নিকট শ্বশুরালয়ের সকলের ব্যবহারাদির যে অভিনয় করিত, তাহাতে যতই নিপুণতা থাকুক, শিষ্টতা ছিল না। তাহার জননী জানিতে পারিয়া একদিন তিরস্কার

করিলেন। সেই অবধি জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা আর সে অভিনয়দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু কনিষ্ঠা ছাড়িতেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নলিনবিহারীর পত্নীর সহিত শোভার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়ে সমবয়সী। চপলার পিতা কলিকাতার এক জন বিখ্যাত ধনী ছিলেন। চপলা তাঁহার একমাত্র সন্তান; পিতামাতার বিশেষ আদরের। তাহার পিতা তাঁহার এক মাতৃস্বসৃপৌত্রকে গৃহে রাখিয়া সন্তানেরই মত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাহার সহিত চপলার বিবাহ দিবেন। শিশিরকুমার যখন সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি এ প্রস্তাব করিলে গৃহিণী তাহাতে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনিও তাহার স্বভাবগুণে শিশিরকুমারকে স্নেহ করিতেন; কিন্তু তাহার সহিত চপলার বিবাহ দিতে সম্মতা ছিলেন না। ঘর-জামাই - ছিঃ! তাহাতে কি জামাতার সম্মান থাকিবে?

বড় ঘরে মেয়ের বিবাহ দিবেন, কুটুম্ব কুটুম্বিতায় সুখ হইবে—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কর্ত্তার কিন্তু অন্যরূপ অভিপ্রায় ছিল; এবং তিনি সেই ভাবেই শিশিরকুমারকে পালন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও যে তাহা না জানিত, এমন নহে। কিন্তু কর্ত্তার অভিপ্রায় অন্যরূপ, জানিয়াও গৃহিণী বিচলিতা হইলেন না। উভয়েরই সঙ্কল্প অটল রহিল। কন্যার বিবাহের কথায় কর্ত্তা আর কাণ দিতেন না। এই সময় কর্ত্তার ডাক পড়িল; কন্যার বিবাহ, বৈষয়িক ব্যাপার সব ফেলিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল।

শ্রাদ্ধাদির পর গৃহিণী শিশিরকুমারকে বলিলেন, "চপলার জন্য একটি পাত্র দেখ। আর ত রাখা যায় না।" শিশিরকুমার আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে আপনি সন্ধান করিয়া, পাত্র দেখিয়া নলিনবিহারীর সহিত চপলার বিবাহ দিল। ইহার পর শিশিরকুমার আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হৃদয়কে সংযত করিল,—ডেপুটীর পরীক্ষা দিয়া চাকরী লইয়া বিদেশে গেল; ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কার্য্যে আপনার দীর্ণ হৃদয়ের হতাশাবেদনা সহনীয় করিতে গেল। সহসা তাহার সঙ্কল্প-পরিবর্ত্তনে গৃহিণী বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। শেষে তিনি তাহার বিবাহের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে তাঁহার এ আদেশ পালন করিতে পারিল না। এখনও তিনি জিদ করেন। কিন্তু শিশিরকুমার বিবাহ করে নাই। তবে শিশিরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অব্যাহত আছে। সে ছুটী পাইলেই তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আইসে। তিনিও তাহাকে স্নেহ করেন। আবশ্যকে সেই তাঁহার প্রধান অবলম্বন।

চপলার পিত্রালয় হইতে প্রাপ্ত যৌতুক ও অম্বাধেয় অনন্য-সাধারণ। তাহাকে কখনও পিত্রালয়ে, কখন ভর্ত্তৃগৃহে থাকিতে হইত। তাহার জননীর আর কেহ ছিল না। অন্য বধূদিগের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। সে সুন্দরী; কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধরের গর্ব্বকুঞ্চন ও কথায় কথায় ঘৃণার ভাব যে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিত, তাহা সে বুঝিত না। বিশেষ, তাহার নয়নে স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টির পরিবর্ত্তে যে অপরিবর্ত্তন-

শীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা রমণীর সৌন্দর্য্যে শোভন নহে। সমবয়সী শোভার সহিত চপলার সখ্যভাব ছিল। শ্বাশুড়ীর কথায় অন্য বধূরা যখন শোভার নিকট তাহার শ্বশুরালয়ের আচার ব্যবহারের অভিনয়দর্শনে নিরস্তা হইলেন, তখনও তাহাকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে চপলার নিকট সে অভিনয় করিতে হইত। চপলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। পুষ্করিণীতে স্নান, পূর্ণকলসকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি পল্লীগ্রামের প্রচলিত প্রথা জানিয়া চপলা বিস্মিতা হইত; বলিত, "ঠাকুরঝি, তুমি কেমন করিয়া সেই সূর্য্যমামার দেশে ঘর করিতে যাইবে?" শোভা বলিত, "যখন যাইতে হইবে, তখন সে কথা হইবে।" চপলা বলিত, "তুমি যাইও না।" যেন যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণরূপে তাহারই মতের উপর নির্ভর করিতেছে!

প্রভাতের বিবাহের পরই কৃষ্ণনাথ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, জামাতা আর ছাত্রাবাসে না থাকিয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া বাস করে। কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই শিবচন্দ্র পুত্রকে বলিয়াছিলেন, সে যেন ছাত্রাবাসেও কাহারও সহিত না মিশিয়া অন্য কার্য্যে সময় নষ্ট না করিয়া পাঠে বিশেষ মন দেয়—পরীক্ষার আর এক বৎসরও নাই। বরং তাঁহার ইচ্ছা ছিল, প্রভাত শ্বশুরালয়ের অত নিকটে না থাকিয়া একটু দূরে থাকে। কারণ, তাহার উপর সরলহৃদয় নবীনচন্দ্রের যে পরিমাণ বিশ্বাস ছিল, শিবচন্দ্রের সে পরিমাণ বিশ্বাস ছিল না। তবে ঐ ছাত্রাবাসে দেশস্থ বহু ছাত্র আছে বলিয়া শিবচন্দ্র

প্রভাতকে স্পষ্ট করিয়া অন্য ছাত্রাবাসে যাইতে আদেশ করেন নাই।

গ্রীষ্মাবকাশে প্রভাত গৃহে আসিল। কিন্তু মন কলিকাতায় রহিল। পিসীমা পূর্ব্বেই ব'কে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথ গৃহে পীড়ার অজুহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; শিবচন্দ্র আর জিদ করেন নাই। প্রভাত গৃহে আসিল; কিন্তু এবার যেন গৃহে আর তেমন আকর্ষণ নাই। মুগ্ধ যুবকের কল্পনা পত্নীকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তিত হয়। জীবনের নিতান্ত দারুণ অভিজ্ঞতার পর মানুষ বুঝিতে পারে, প্রেমের অবারিত চঞ্চল আবেগই সুখের কারণ। অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ধাবিত হইয়া—অসম্ভব প্রেমের কল্পনা করিয়া তবে মানুষ বুঝিতে পারে, সে চাঞ্চল্যের ভিত্তির উপর সংসার সংস্থাপিত করা অসম্ভব; সে বিচার—সে বিবেচনা যৌবনের ধর্ম্ম নহে। তাহা যৌবনের ধর্ম্ম হইলে মানবের দুঃখ কষ্টের নিবিড় জলদে ইন্দ্রধনু শোভা পাইত না; সহস্র দুঃখ কষ্টে প্রেমের সুখ মানবকে সব ভুলাইতে পারিত না। বরং যৌবনের মোহ যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে জীবনে অনেক সুখ থাকিত। যে সময় আমরা কুসুমে মধুর গন্ধ, মলয়ে মদিরতা ও জ্যোৎস্নায় বিহ্বলতা অনুভব করিতে পারি, প্রিয়তমার প্রেমপ্রদীপ্ত আননে নিত্য নব শোভাদীপ্তি দেখিতে পাই,—সে সময় যত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, ততই সুখের, ততই আনন্দের; তাই জীবনের বসন্ত—যৌবনকাল সুখের। তখন পত্নীর দোষে অন্ধ হইয়া মানুষ গুণেই দৃঢ়লক্ষ্য হয়। তখন

তরুণ প্রেমের মধুরস্পর্শে হৃদয়ের কুসুমকানন বিকশিত। তখন অন্তরে বাহিরে কেবল প্রিয়তমা! তাই তরুণ যৌবনে—প্রেমাবেশে অতি নীরস হৃদয়েও রসসঞ্চার হয়—অতি অ-কবিও কবিতার রচনা করিতে পারে। কারণ, তখন সে হৃদয়ে সত্য সত্যই কবিতা অনুভব করে। হায়, সে সুখের যৌবন!

নবপরিণীত যুবক প্রভাতচন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। তাই গৃহে তাহার আর পূর্ব্বের মত আকর্ষণ ছিল না। সে পত্নীর চিন্তায় বিভোর ছিল; পত্নীর পত্রের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। এই সময় শিবচন্দ্রের নিকট কৃষ্ণনাথের পত্র আসিল। কৃষ্ণনাথ জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবচন্দ্রকে তাহাকে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শিবচন্দ্র পুত্রকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে আপত্তি করিলেন না। প্রভাত শ্বশুরালয়ে গেল।

প্রায় সপ্তাহ কাল পরে শিবচন্দ্র দুইখানি পত্র পাইলেন;—একখানি কৃষ্ণনাথের, অপরখানি প্রভাতের। কৃষ্ণনাথের কনিষ্ঠ পুত্র নলিনবিহারী কিছু দিন হইতে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল। গ্রীষ্মকালে তাহার পীড়া বাড়িয়া উঠায় চিকিৎসকের উপদেশে কৃষ্ণনাথ সপরিবারে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। তিনি প্রভাতকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। প্রভাত পিতার সম্মতি না পাইলে যাইতে চাহিল না। কৃষ্ণনাথ তাহার আপত্তি শুনিলেন না; বলিলেন, "আমি বৈবাহিক মহাশয়ের মত করিতেছি।" যাইবার

প্রস্তাব ও যাওয়া, উভয়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ের ব্যবধান হেতু শিবচন্দ্রের অনুমতি আনাইবার সুবিধা হয় নাই। যাইবার দিন কৃষ্ণনাথ শিবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। প্রভাত পত্রে লিখিল, সে বিশেষ আপত্তি করিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণনাথ শুনিলেন না।

এই পত্র পাইবার কয় দিন পূর্ব্বে শিবচন্দ্র পুত্রের কোনও সহপাঠীর নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নিষেধহেতু প্রভাত ছাত্রাবাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে যায় নাই বটে; কিন্তু অধিক সময় সেখানেই কাটায়, তাহার ছাত্রাবাসে বাস ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই পত্র পাইয়া তিনি আরও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু হৃদয়ে বিরক্তির অপেক্ষা স্নেহের অভিমানই প্রবল হইয়াছিল; প্রভাত তাঁহার অনুমতির অপেক্ষাও করিল না? তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। মনের অবস্থা স্থিরভাবে বিবেচনার পক্ষে অনুকূল নহে। তিনি নবীনচন্দ্রকে এ কথা না জানাইয়াই উত্তরে প্রভাতকে লিখিলেন;—"তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখ নাই। সুতরাং তোমাকে কোনও কথা লিখাই নিষ্ফল। তুমি বড় হইয়াছ। তোমার হিতাহিত তুমি বুঝিতে পার। এখন আর তোমার কার্য্য বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার অনুমতি বা উপদেশ অনাবশ্যক, তাহা আর দিব না।"

নবীনচন্দ্র দেখিলেন, অগ্রজের মুখ অন্ধকার; জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাতের পত্র পাইয়াছেন?"

শিবচন্দ্র উত্তর করিলেন, "পাইয়াছি?"

"ভাল আছে ?"

"হাঁ।"

এ দিকে পিতার পত্র যথাকালে প্রভাতের হস্তগত হইল। পিতার নিকট এমন কঠোর তিরস্কার সে কখনও ভোগ করে নাই। তাহার চক্ষুর সম্মুখে দিবসের আলোক যেন হরিদ্রাবর্ণ হইয়া গেল। সে পত্রখানি লইয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইল; বহু দূর যাইয়া একটু নির্জ্জন স্থানে একখানি শিলার উপর বসিল; পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল

প্রভাত বসিয়া ভাবিতে লাগিল; হৃদয়ে দারুণ বেদনার পার্শ্বে দুঃখ ফুটিয়া উঠিল;—পিতা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অবাধ্য হইবার কল্পনাও করিতে পারে না? সে ত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারে না। সে কি কখনও তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারে?

তখন দিবাবসান হইতেছে। দূরে তুষারসমাচ্ছন্ন কর্পূর-ধবল শৃঙ্গশ্রেণীর পশ্চাতে দিনান্ততপন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; কিন্তু পশ্চিমদিগন্তে সূর্য্যাস্তশোভা প্রকটিত হইতে না হইতে, আকাশে দুই চারিটি রেখায় বর্ণদীপ্তি বিকশিত হইতে না হইতে, কুজ্ঝটিকা উঠিয়া চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া দিল; ঘন কুজ্ঝটিকা-পুষ্ট বারিবিন্দু আপনার ভার বহিতে অসমর্থ হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। প্রভাতের হৃদয়েও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

হায়, স্নেহজাত অভিমান! এ জগতে তুমি বহু অতর্কিত বেদনার, যাতনার, মনঃকষ্টের কারণ।

প্রভাত গৃহে ফিরিল। তাহার পল্লীভবনের কথা, তাহার অতীত জীবনের কথা, বর্ত্তমানের কথা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কেবল নানা চিন্তার তরঙ্গতাড়নমধ্যে শোভার চিন্তা সমুদ্রসলিলে শিলাখণ্ডের মত স্থির অচঞ্চল রহিল।

পরদিন প্রভাত পিতাকে পত্র লিখিতে বসিল। কতবার লিখিল, কতবার ছিঁড়িল; কিছুতেই মনের মত হইল না। শেষে সে সে চেষ্টা ত্যাগ করিল; প্রস্তররুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত আপনার যাতনায় আপনই পীড়িত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টের উপহাস।

এ দিকে চার পাঁচ দিন প্রভাতের পত্র না পাইয়া ধূলগ্রামে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পিসীমা'র ও নবীনচন্দ্রের ব্যস্ততা আশঙ্কায় পরিণত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। নবীনচন্দ্র প্রত্যহ অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা, আজও পত্র আসিল না?" উত্তরে শিবচন্দ্র একদিন বলিলেন, "সে দেশ বেড়াইতে গিয়াছে; আমোদে আছে। আমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় নাই।" তিনি নবীনচন্দ্রকে কৃষ্ণনাথের ও প্রভাতের পত্র দুইখানি দিলেন।

নবীনচন্দ্র পত্র দুইখানি পাঠ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর দিয়াছেন?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ। লিখিয়াছি, তুমি ত আর আমার কথা শুনিবে না; যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি আর কিছু বলিব না।"

নবীনচন্দ্র বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিলেন;—সে মুখ অন্ধকার। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈবাহিকের পত্রের উত্তর দিয়াছেন?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "না।"

নবীনচন্দ্র যাইবার সময় পত্র দুইখানি লইয়া যাইলেন।

নবীনচন্দ্র সেই দিনই পত্র দুইখানির উত্তর লিখিলেন। তিনি কৃষ্ণনাথকে লিখিলেন ;—"আপনার পত্রে শ্রীমান্ নলিনবিহারীর পীড়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। শ্রীমান ওখানে যাইয়া কেমন আছেন, এবং সুস্থ হইয়াছেন কি না, জানিতে ব্যগ্র আছি। আপনাদের সকলের কুশলসংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন। বৈবাহিকা ঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার জানাইবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আর সকলকে আমার যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আমার মা'কে তাহার এই বুড়া ছেলের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন।"

প্রভাতকে তিনি লিখিলেন ঃ—

"প্রাণাধিকেষু,

বাবা, প্রায় এক সপ্তাহ তোমার পত্র পাই নাই। তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে আমরা কিরূপ ব্যস্ত হই, তাহা কি তুমি জান না? তোমার পত্র পাইতে কখনও এমন বিলম্ব হয় না, তাই আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। পত্রপাঠ পত্রের উত্তর দিবে। কোনও কারণে বিলম্ব করিবে না। তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে আমাকে দার্জ্জিলিং যাইতে হইবে। তুমি কবে ফিরিবে? তোমার ও মা'র মঙ্গল সংবাদ দিবে। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।"

পত্র যথাকালে প্রভাতের হস্তগত হইল। কৃষ্ণনাথও তাহাকে নবীনচন্দ্রের পত্র দেখাইলেন।

প্রভাত উভয় পত্রই পাঠ করিল। তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। যে ভালবাসে, সে দুঃখের অংশভাগী হইয়া দুঃখের আতিশয্য প্রশমিত করে; যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে, আনন্দের অংশ না দিলে তৃপ্তি হয় না। প্রভাত শোভাকে এ আনন্দের অংশ না দিয়া পারিল না। কৃষ্ণনাথ পূর্ব্বেই বিদ্রূপ করিয়া শোভাকে বলিয়াছিলেন, "শোভা, তোর বুড়া ছেলে পত্র লিখিয়াছে।"

প্রভাত পত্নীকে বলিল, "শোভা, কাকা পত্র লিখিয়াছেন। তোমার কথা লিখিয়াছেন। শুনিয়াছ?"

শোভা হাসিমুখে বলিল, "শুনিয়াছি।"

প্রভাতের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রভাত বলিল, "এবার কলিকাতায় ফিরিয়া ধূলগ্রামে যাইবে?"

শোভা বলিল, "যাইব।" কিন্তু স্বরে আগ্রহের অভাব।

প্রভাত পত্নীর মুখ চুম্বন করিল।

প্রভাত পরদিনই পিতৃব্যকে পত্র লিখিল। সে লিখিল;—

"আমি কলিকাতায় আসার পর আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্যালকের শিরঃপীড়া বাড়িয়া উঠে। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে দুই দিনের মধ্যে দার্জ্জিলিংএ আসা স্থির হয়। আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলে আমি অসম্মত হই; আপনাদের অনুমতি ব্যতীত যাইতে পারিব না। আমি শেষ পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, কাটাইতে পারিব। কিন্তু তাহা

হয় নাই। শ্বশুর মহাশয় আমার কোনও আপত্তি শুনেন নাই। তিনি বাবাকে পত্রও লিখিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে বাবাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার উপর রাগ করিয়া লিখিয়াছেন,—'তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখ নাই। সুতরাং তোমাকে কোনও কথা লিখাই নিষ্ফল। তুমি বড় হইয়াছ। তোমার হিতাহিত তুমি বুঝিতে পার। এখন আর তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার অনুমতি বা উপদেশ অনাবশ্যক। তাহা আর দিব না।' আমি অনন্যোপায় হইয়া আসিয়াছি। সে জন্য বড় লজ্জিত হইয়াছি। বাবার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ কষ্ট পাইয়াছি - কত কাঁদিয়াছি, বলিতে পারি না। আপনারা রাগ করিয়াছেন বলিয়া সাহস করিয়া পত্র লিখিতে পারি নাই। সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি যত সত্বর হয় যাইবার চেষ্টা করিতেছি। যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব।"

পত্র পাইয়া নবীনচন্দ্রের স্নেহার্দ্র হৃদয় প্রভাতের বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি শিবচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন, প্রভাতের পত্র পাইয়াছেন।

শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছে?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ। বৈবাহিক মহাশয় অত্যন্ত জিদ করিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। আপনি তিরস্কার করিয়াছেন, সে জন্য কত দুঃখ করিয়াছে।"

নবীনচন্দ্র উত্তরে প্রভাতকে লিখিলেন ঃ—

"প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্রে তোমাদের কুশলসংবাদ অবগত হইয়া নিঃশঙ্ক হইলাম। আমরা রাগ করিয়াছি ভাবিয়া পত্র লিখ নাই। অমন করিতে আছে? তুমি কি বুঝিতে পার নাই. দাদার কথা রাগের নহে—অভিমানের? আমাদের রাগ বল. অভিমান বল. তুমি ভিন্ন আর কে সহ্য করিবে? তুমি দাদাকে পত্র লিখ নাই; পত্রপাঠ লিখিও। বাবা. এ সবই তোমার; আমরা আর কয় দিন?

কমল কিছু দিন তোমার পত্র পায় নাই। সতীশ আজ সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সংবাদ দিও আমার আশীর্ব্বাদ তুমি জানিও; মা'কে জানাইও। মা কি এ বুড়া ছেলেকে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়া আছেন? ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।"

এই পত্র পাইয়াও প্রভাতের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু এ অশ্রু বেদনার নহে,—আনন্দের। সে আনন্দ পিতৃব্যের হৃদয়ে আপনার স্নেহাসন অবিচলিত জানিয়া।

প্রভাত পত্রখানি জামার পকেটে রাখিল। রাত্রিকালে জামা খুলিয়া শয়ন করিল। প্রভাতে উঠিয়া সে জামা পরিয়া বাহিরে আসিল; পকেটে হাত দিয়া দেখিল, পত্র নাই। পত্র নিশ্চয়ই জামা পরিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে। প্রভাত শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল; দেখিল, শোভা তাহার পত্র পড়িতেছে।

শোভা তাহার পত্র পড়িতেছে দেখিয়া প্রভাত একটু বিরক্ত হইল ; বলিল, "পত্র দাও।"

শোভা মুখ তুলিল ; প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "রাগা-রাগি কিসের ?"

প্রভাতের মুখ যেন রক্তহীন, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার প্রথম ইচ্ছা হইল, বলে, সে কথায় শোভার আবশ্যক নাই। কিন্তু পাছে শোভা দুঃখিতা হয় বলিয়া সে কথা বলিল না ; বলিল, "আমার শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল, বাড়ী না যাইয়া এখানে আসিয়াছি, তাই বাবা বোধ হয় রাগ করিয়াছেন।"

শোভার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইল। সে বলিল, "কি অন্যায় হইয়াছে ?"

"বাড়ীতে আবশ্যক ছিল।" কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য—এমন নহে। বলিতে বাধ-বাধ ঠেকিল।

শোভা পত্রখানা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাত পত্র লইয়া বাহিরে আসিল। সমস্ত দিন মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল।

শোভা ভাবিল, "কি অন্যায়টা হইয়াছে ? ইহাতেই রাগ ? ছোট বৌদি কি সাধে বলিয়াছে,—সেই সূর্য্যমামার দেশে কেমন করিয়া ঘর করিতে যাইব ?"

প্রভাত নবীনচন্দ্রের নির্দ্দেশমত পিতাকে পত্র লিখিল। নবীনচন্দ্র সে পত্রের উত্তর দিলেন। পূর্ব্বে বহুবার এমন হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে ও এবারে কিছু প্রভেদ ছিল। তাই

প্রভাত লিখিল, "বাবা আমাকে পত্র লিখেন না কেন? নিশ্চয়ই তাঁহার রাগ পড়ে নাই।"

উত্তরে নবীনচন্দ্র লিখিলেন, "দাদা পত্র লিখেন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ কেন? আমার পত্র পাইলে কি হয় না? দাদা নানা কার্য্যে ব্যস্ত; সর্ব্বদা তাঁহার সময় হয় না। তাহা তুমি জান। সেই জন্যই আমি তোমার পত্রের উত্তর দিয়া থাকি। তুমি ত কখনও তাহাতে কিছু মনে করিতে না। তুমি পূর্ব্বের মত তাঁহাকে পত্র লিখিবে।"

প্রভাত বুঝিল, নবীনচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু সন্দেহ মিটিল না; হৃদয়ে যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা অপসৃত হইল না।

ইহার পর হইতে প্রভাত প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আর এক পক্ষ পরেই সকলে ফিরিব। ব্যস্ত হইয়া অগ্রে যাইবার প্রয়োজন কি?" শেষে প্রভাত বলিল, "কলেজের ছুটী ফুরাইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে আসিয়াছিলাম। বাড়ীতে আবশ্যক আছে, বাড়ীর পত্র পাইয়াছি। একবার বাড়ী যাইব।" তাহার আগ্রহাতিশয়ে কৃষ্ণনাথ সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—জামাই যখন সত্য সত্যই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন আর পুনঃ-পুনঃ বাধা দিয়া কায নাই।

শোভার কিন্তু নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিল, প্রভাত দার্জ্জিলিংএ

আসাতে তাহার পিতা রাগ করিয়াছেন ; এবং তাহাই জানিয়া সে ব্যস্ত হইয়া গৃহে ফিরিল। পত্নী - বিশেষতঃ নবপরিণীতা. অল্পবয়স্কা পত্নী আবার কবে মনে করিয়া থাকে যে, সে ব্যতীত অপরের সম্বন্ধেও তাহার স্বামীর কর্ত্তব্য আছে ; স্বামীর উপর সে ব্যতীত আর কাহারও অধিকার আছে ?

প্রভাত গৃহে গেল। যাইবার সময় পত্নীর আঁধার মুখ দেখিয়া গেল। তাই ভাবিতে ভাবিতে গেল। বিচ্ছেদ কি কখনও সুখের হয় ? এক দিকে পিতার বিরক্তি. অপর দিকে পত্নীর আঁধার মুখ—উভয় চিন্তাই কষ্টের।

প্রভাত গৃহে আসিল। নবীনচন্দ্র তেমনই আগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গৃহে তাহার আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ক্রটী ছিল না। সতীশচন্দ্র তাহার আগমনসংবাদ পাইয়া একদিন স্বয়ং আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। হাস্য-পরিহাসে, বিদ্রূপে, রহস্যালাপে সে দিন কাটিয়া গেল।

কিন্তু প্রভাতের সন্দেহ ঘুচিল না। তাহার মনে হইল, যেন পিতার ব্যবহার বিরক্তিমুক্ত নহে। যখন সন্দেহের কোনও কারণ না থাকে, তখন যে ব্যবহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না. সন্দেহ-শঙ্কিত হৃদয়ে তাহা সহজেই অনুভূত হয়। বরং সন্দেহ-কলুষিত হৃদয়-দর্পণে অনেক সময় অবিকৃত দ্রব্যের প্রতিবিম্বও বিকৃত দেখায়।

প্রভাত বুঝিল না, তাহার উপর বিরক্তি তাহার স্নেহশীল পিতার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ। শিবচন্দ্র বুঝিলেন না,

তাঁহার সামান্য বিরক্তিও দীপ্ত অঙ্গারের মত পুত্রের হৃদয় দগ্ধ করে। একমাত্র পুত্রের ব্যবহারে দারুণ অভিমান স্নেহময় পিতৃহৃদয় পীড়িত করিতেছিল—স্নেহের প্রবাহপ্রকাশপথ রুদ্ধ করিয়া দারুণ বেদনা দিতেছিল। আবার পিতার অপরিম্লান স্নেহলাভে অভ্যস্ত পুত্রের হৃদয়েও পিতার সামান্য বিরক্তি হেতু দারুণ মর্ম্মবেদনা ও তাঁহার ব্যবহারে অভিমান জন্মিল। উভয়েরই হৃদয়ে বেদনা,—অথচ কেহই তাহা প্রকাশ করিলেন না। যদি প্রভাত একবার পূর্ব্বের মত পিতার কাছে সরলভাবে কোনও প্রয়োজনের কথা বলিত, তবে শিবচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত স্নেহস্রোতে সকল অভিমান ভাসিয়া যাইত। যদি শিবচন্দ্র একবার পূর্ব্বের মত বলিতেন, "প্রভাত, তুই এই কার্য্য কর" বা "তুই এই কার্য্য করিতে পাইবি না," তবে পুত্রের হৃদয়ের সকল ব্যথা অপনীত হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

ছুটী ফুরাইল। প্রভাত কলিকাতায় গেল। সে পিতার আঁধার মুখ দেখিয়া ভাবিতে ভাবিতে গেল,—আমার দোষ কি?

দ্বিতীয় খণ্ড।

দুঃখ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ষান্তে।

"ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামাই তোমাকে খুব ভালবাসেন ?"

প্রভাতের বিবাহের পর এক বৎসর গত হইয়াছে। মাঘ মাসের স্বল্পায়ু দিবসের অপরাহ্নে কৃষ্ণনাথের অন্তঃপুরস্থিত একটি কক্ষে বড় বধূ পশম মিলাইয়া ছেলের জন্য মোজা বুনিতেছেন। মধ্যমা পিত্রালয়ে পত্র লিখিতেছিলেন। তিনি পত্র লিখা শেষ করিয়া শোভাকে বলিলেন, "ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামাই তোমাকে খুব ভালবাসেন ?"

শোভা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কেন, মেজবৌদিদি, তোমার ঠাকুর-জামাই কি তোমার কাণে কাণে এ কথা বলিয়াছেন ?"

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "তুমি যতই পান খাও, তোমার ঠোঁট রাঙ্গা হয় না।"

বড় বধূ হাসিলেন।

শোভা বলিল, "আচ্ছা, আমি বলিয়া দিব, মেজবৌদিদি বড় দুঃখ করিয়াছে ; তুমি—"

কথা সমাপ্ত না হইতেই চপলা কক্ষে প্রবেশ করিল।

বড় বধূ চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটঠাকুরপো আজ কেমন আছেন ?"

চপলা বলিল, "কি জানি, বড় দিদি, জিজ্ঞাসা করিলে সেই একই উত্তর—সমানই আছি।"

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "যাহাই হউক, ভাল মন্দ কিছু ত বুঝা যায় ?"

চপলা বলিল, "ভাঙ্গিবেন, তবু মচকাইবেন না। যে দিন অসুখ বড় বাড়ে, সে দিনও কি সহজে সে কথা বলেন !"

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "কেন, মূর্খ মানুষ অসুখের কথা শুনিলে কিছু দোষ হয় নাকি ?"

চপলার নয়নে যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া গেল।

শোভা বলিল, "এবার পরীক্ষায় সফল হইতে না পারিয়া ছোটদাদার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

বড় বধূ বলিলেন, "বরাবর ভাল করিয়া 'পাস' করিয়া এই প্রথমবার চেষ্টা বৃথা হইল। বড় লাগিবারই কথা। তোমার বড় দাদা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, অসুস্থশরীরে পরীক্ষা দিয়া কায নাই। ঠাকুরপো শুনিলেন না। প্রাণান্ত করিয়া পড়াই বা কেন ?"

চপলা বলিল, "'পাস' করা কি এতই কঠিন কায ?" সে শিশিরকুমারের অক্ষুণ্ণ সাফল্যের কথা ভাবিতেছিল।

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "আর 'পাসে' কায নাই। অমনই ঠাকুরপো মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না।"

শোভা বলিল, "কেন, মেজবৌদিদি, ও কথা বল কেন ?"

"তোমার ভাই, তুমি কি দোষ দেখিতে পাইবে ? আজকালকার

ছেলেরা দুই পাত ইংরাজী উল্টাইলেই গর্ব্বে আর মাটীতে পা দেয় না। বাপ মা'কেই বড় গ্রাহ্য করে! আর সব ত পরের কথা।"

বড় বধূ বলিলেন, "তাহা নহে। ছোটঠাকুরপো বরাবরই ঐ রকম, গোলমাল ভালবাসে না, পড়া শুনা লইয়াই থাকিতে চাহে। এই যে এত অসুখ—ডাক্তার বলে, পুস্তক স্পর্শ করিও না, তবু কি পড়া ছাড়িয়াছে ?"

শোভা বলিল, "তাই ত অসুখ সারিতেছে না।"

মধ্যমা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ও কেবল বাহাদুরী। লোকে বলিবে, বড় ভাল ছেলে,—বিদ্বান। তাই ও সব।"

বড় বধূ বলিলেন, "তাহা নহে। বিশেষ পুরুষমানুষ, বিদ্বান হইবে, সে ত ভাল আকাঙ্ক্ষা।"

এমনই নানা আলোচনা হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে চপলাকে উঠিতে দেখিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবৌদিদি, যাইতেছ যে ?"

চপলা বলিল, "যাই, দাসীকে সব গুছাইয়া লইতে বলি। মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সকাল সকাল গাড়ী আসিবে, হিম না লাগে।"

"এবার কয় দিন সেখানে থাকিবে ?"

"তাহা এখন কেমন করিয়া বলিব ? এবার কত দিন পরে যাইতেছি !"

"কত দিন ত খুব,—এখনও এক মাস পূর্ণ হয় নাই।"

নাগপাশ।

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "ভাল ;—'চালন বলেন, সূচ ভাই, তুমি, কেন ছেঁদা ?' ঠাকুরঝি, তুমিই বুঝি বড় এক মাস শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া আসিয়াছ ?"

চপলা হাসিয়া বলিল, "সে সূর্য্যমামার দেশে এক বার যাইলে আর সহজে আসিতে হইবে না। সে দেশে কি পথ ঘাট আছে ? কেবল বন। আচ্ছা, ঠাকুরঝি, বনে খুব বাঘ আছে ? ডাকাত আছে ?"

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "ঠাকুরঝি অনেক দিন ঘর করিয়া আসিয়াছে কি না,—তাই সব জানে!"

বড় বধূ চপলাকে বলিলেন, "ছোট ঠাকুরপোর অসুখ দেখিয়া যাইতেছ, এবার শীঘ্র ফিরিও।"

চপলা বলিল, "কি জানি। মা যেমন বলিবেন, তেমনই হইবে।" চপলা চলিয়া গেল।

মধ্যমা বধূ শোভাকে বলিলেন, "ঠাকুরঝি, পূজার সময় না হয় একটা ছুতা করিয়া কাটাইয়াছিলে, এবার লইয়া যাইতে চাহিলে কি হইবে ?"

শোভা বলিল, "তখনকার ভাবনা তখন। এখন চল, কাপড় কাচিতে যাই।"

দুই জনে উঠিলেন।

শারদীয়াপূজার সময় পিসীমা র আগ্রহে শিবচন্দ্র বধূকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শোভার জননী তাহাতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। কিন্তু সে কথা শুনিয়া শোভা এমন ক্রন্দন

আরম্ভ করিয়াছিল যে, অতিরিক্ত স্নেহশীল কৃষ্ণনাথ তাহাতে একান্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ধূলগ্রামের দত্তগৃহে দুর্গোৎসব ছিল না; থাকিলে কৃষ্ণনাথ শোভাকে না পাঠাইয়া পারিতেন না। কৃষ্ণনাথ চতুর বন্ধু শ্যামাপ্রসন্নের শরণ লইলেন। শ্যামাপ্রসন্ন প্রথমে বলিলেন, "এক ঘরের এক বধূ; লইয়া যাইতে চাহিয়াছে, পাঠাইয়া দাও। না হয়, এবার অল্প দিন থাকিয়া আসিবে।"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "এখন পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর নহে।"

"কলিকাতাই বা কি এমন স্বাস্থ্যকর? সেখানে ম্যালেরিয়া নাই ত?"

"কি জানি? প্রথমবার যাইবে,—এখন থাক। বিশেষ সে বড় কাঁদিতেছে। দিন কতক পরেই যাইবে।"

শেষে শ্যামাপ্রসন্নের পরামর্শমতে কৃষ্ণনাথ বৈবাহিককে লিখিলেন, "আপনি শোভাকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনার বধূকে আপনি লইয়া যাইবেন, তাহাতে আমার আর কথা কি? তবে আপাততঃ শোভার শরীর বড় ভাল নাই। অল্প দিন হইল, তাহার জ্বর হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকগণ এখন যাইতে পরামর্শ দেন না। এ বিষয়ে আপনি যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, আদেশ করিবেন।"

শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "আর অধিক কিছু লিখিয়া কায নাই। তাহারা ভাল লোক। দেখিও. ইহাতেই হইবে।"

সত্য সত্যই তাহাই হইল। এই পত্র পাইয়া শিবচন্দ্র আপাততঃ

বধূকে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। শোভা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রভাত পূজাবকাশ গৃহেই কাটাইয়াছিল। হৃদয়ে যে নিবিড় ছায়া লইয়া সে পূর্ব্ববার গৃহ হইতে গিয়াছিল, এবার সে ছায়া নিবিড়তর হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু অপনীত হয় নাই। হৃদয়ে একবার দাগ পড়িলে সহজে দূর হয় না। নদীর অবাধ স্রোতের মুখে একবার যদি ক্ষুদ্র বাধা পড়ে, তবে সলিলবাহিত পলি সেই স্থানে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে প্রবাহপথ রুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। স্নেহের স্রোতে একবার যদি সন্দেহের বাধা পড়ে, তবে সে বাধা অচিরে দূর করিও—নহিলে বিপদ নিবারণ করা অসম্ভব হইবে।

প্রভাতের পরিবর্ত্তন এবার নবীনচন্দ্রের স্নেহান্ধ নয়নেও প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রভাত আপনি হয় ত এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারে নাই। মানুষ যেমন আপনার শারীরিক বৃদ্ধি সহজে বুঝিতে পারে না, তেমনই তাহার আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও সহজে তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না। জীবনে ও হৃদয়ে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার ও ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং সহজে অনুভূত হয় না।

কিন্তু প্রভাত যেন আর সে প্রভাত ছিল না। সে পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সে পরিবর্ত্তনের সূচনা তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তখন স্নেহশীলা পিসীমা ও স্নেহশীল নবীনচন্দ্র তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। সুবর্ষণে শস্যশীর্ষ যেমন স্বল্পকালমধ্যে পূর্ণ ও পুষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে, এখন সুবিধা পাইয়া

সেই পরিবর্ত্তন তেমনই পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিধার প্রধান উপকরণ—অর্থ। তাহার জন্য প্রভাতকে ভাবিতে হইত না। শিবচন্দ্র যাহাই করুন, তাহার আবশ্যক বাড়িয়াছে বলিয়া নবীনচন্দ্র গোপনে প্রতিমাসে তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ পাঠাইতেন। তদ্ভিন্ন তাহার আপনারও অর্থ ছিল। কৃষ্ণনাথ বিবাহকালে জামাতাকে যে অর্থ দিয়াছিলেন, শিবচন্দ্র তাহা স্পর্শ করেন নাই। সে টাকা প্রভাতের নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। শিবচন্দ্র সে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। যৌবনে—অভিভাবকহীন অবস্থায় প্রচুর অর্থের মত কুসঙ্গী আর নাই। সংসারের ভাব বুঝিবার পূর্ব্বে মানুষ ব্যয় করিতেই ভালবাসে—তাহার আনন্দ ব্যয়ে, সঞ্চয়ে নহে।

পূজার অবকাশ শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রভাত কলিকাতায় ফিরিয়া গেল; পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী।

প্রভাত চলিয়া যাইবার পর শিবচন্দ্র এক দিন নবীনচন্দ্রকে বলিলেন, "নবীন, আমার সন্দেহ হইতেছে, প্রভাত বড় অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আচরণ ও ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া আমি শঙ্কিত হইয়াছি। এখন হইতে সাবধান করা প্রয়োজন।"

নবীনচন্দ্র মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাহাকে কিছু বলিয়াছেন?"

"না। আমি কিছু বলি নাই। আমি সেবার তিরস্কার করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার মন ভারি হইয়াছে। তুমিও তাহাতে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছ। তাই আমি কিছু বলি নাই।

বিশেষ, এখন সে বড় হইয়াছে। আর শাসনের সময় নাই। যদি তাহাকে কলিকাতার প্রভাব হইতে দূরে আনিয়া আবার আমাদের কাছে রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত।”

“কিন্তু—পাঠের—”

“তাহাই বলিতেছি। আর তাহা হইবে না। আমরাই তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়াছি; এখন তাহার বদ্ধমূল উচ্চাশা উন্মূলিত করা সঙ্গত হইবে না। তুমি তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া সদুপদেশ দাও।”

নবীনচন্দ্র এ কথার যাথার্থ্য বুঝিলেন; শেষে বলিলেন, “পরীক্ষার আর কয় মাস মাত্র আছে। এই কয়টা মাস কাটুক।”

শিবচন্দ্র বলিলেন, “কিন্তু অভ্যাস প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে সহজে ছাড়িতে পারিবে না।”

শেষে স্থির হইল, এই কয়টা মাস আর কিছু বলা হইবে না।

দত্ত-গৃহে চিন্তার ছায়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক।

ফাল্গুনের শেষ। সন্ধ্যা হইয়াছে। ছাত্রাবাসে প্রভাতের কক্ষ-দ্বার-সম্মুখে বারান্দায় একটা কেরোসিনের চুল্লীতে জল গরম হইতেছে; প্রভাত চা'র আয়োজন করিতেছে; পাত্রগুলি সুদৃশ্য। পার্শ্বের কক্ষে গিরিজানাথ কাগজ বিছাইয়া তৈল ও লবণ সংযোগে মুড়ী আহারোপযোগী করিতে ব্যস্ত ছিল; পার্শ্বেই গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা সংগৃহীত ছিল। পেয়ালা চামচের শব্দ পাইয়া গিরিজানাথ বলিল, "প্রভাত, চা করিতেছ?"

প্রভাত বলিল, "হাঁ; চাই?"

"এক পেয়ালা দিও, ভাই।"

প্রভাত দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল; এক পেয়ালা লইয়া গিরিজানাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাখি কোথায়?"

যে সব বাক্সে কেরোসিন-তৈল-পূর্ণ 'টিন' আইসে, তাহারই একটার উপর গিরিজানাথ পুস্তক রাখিত. সেটার উপর আর স্থান ছিল না। তাহা দেখিয়া গিরিজানাথ বলিল, "বিছানার উপর রাখ।"

প্রভাত বলিল, "খানিকটা পড়ুক!"

গিরিজানাথ হাসিয়া বলিল, "ও বিছানায় খানিকটা চা পড়িলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।"

"না। তাহাতে কায নাই।"- বলিয়া প্রভাত হর্ম্ম্যতলে পিরিচ পেয়ালা রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আপনার চা লইয়া প্রভাত নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল; টেবলের উপর রাখিয়া চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। সে কক্ষে এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবরণহীন হর্ম্ম্যতলে মাদুর ও গালিচা পড়িয়াছে; অলঙ্কারশূন্য কক্ষপ্রাচীর সুদৃশ্য চিত্রে শোভিত হইয়াছে; খেলো টেবল্ ও হাতাহীন চেয়ারের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট সেক্রেটেরিয়েট টেবল্ ও চক্রযুক্তচরণ আফিসচেয়ার আসিয়াছে; মূল্যবান আলমারী ষ্টীল ট্রাঙ্কের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়াছে। টেবলের উপর বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে; আলোক কাচগোলকের মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। টেবলের উপর উৎকৃষ্ট আধারবদ্ধ শোভার ফটোগ্রাফের উপর সে আলোক পড়িয়াছে।

এক চুমুক চা পান করিয়া প্রভাত পুস্তক খুলিল; পড়িল;—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥"

দেবাদেশে যোগমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য বসন্তসহায় রতিপতি হিমাচলে মহাদেবের আশ্রমে উপনীত। অচিরে মলয়-সঞ্চারে ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল বিচঞ্চল হইয়া উঠিল; অশোকতরু ফুলভারাবনত ও বনভূমি ভ্রমরঝঙ্কারঝঙ্কৃত হইল; বসন্তলক্ষ্মীর অভিনব শ্রী প্রতিভাত হইয়া উঠিল; জীবজগতে প্রেমচাঞ্চল্য প্রকাশিত হইল; এমন কি, বসন্তোত্থাপিত প্রেমরস উদ্ভিজ্জগণকেও আকুল করিল। পাঠ করিতে করিতে প্রভাত পরীক্ষা, পাঠ্য—

ভুলিয়া গেল; উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে কবিতারস আস্বাদন করিল। তাহার আপনার হৃদয়ে যৌবনসুলভ প্রেমচাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠিল। যুবকের কল্পনা প্রেমকে বেষ্টন করিয়া ফিরে।

চিত্ত সংযত করিয়া প্রভাত টীকা পাঠ করিতে চেষ্টা করিল; পড়িল বটে, কিন্তু সে পাঠ হৃদয় স্পর্শ করিল না। কয়বার চেষ্টা করিয়া শেষে সে পুস্তক রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বার হইতে সতীর্থ রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিল; "প্রভাত, পড়িতেছ?"

প্রভাত উত্তর দিল, "না। ভিতরে আইস।"

রমণীমোহন একখানি মাসিকপত্র হস্তে লইয়া প্রবেশ করিল; প্রভাতকে সেখানি দেখাইয়া বলিল, "আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।"

"কি কবিতা?"

"বসন্ত।"

"আমি এখনই 'কুমারসম্ভবে' হিমাচলে অকাল-বসন্তোদয়ের বর্ণনা পাঠ করিতেছিলাম।"

"আমার কবিতায় সে বর্ণনার ছায়া পাইবে।"

"পড়, শুনি।"

রমণীমোহন পাঠ করিতে লাগিল:—

"হিম-ঋতু-অবসানে জাগিছে ধরার প্রাণে
আকুল-পুলক-দীপ্ত নবীন যৌবন;

বুকে রুদ্ধ প্রেমধারা বহিতে পারে না ধরা,—
তাই ফুলে ফুলময় বন—উপবন ;
আকুল বকুলবাসে কি মোহ পবনে ভাসে,
কি প্রেম-মদিরা পানে বিহগ বিহ্বল,
তাই বিহগীরে তা'র ডাকিছে সে বারবার
অধীর কূজনে তা'র ফুটে প্রেমকল ;
মুকুলিত আম্রশাখে কোকিল কুহরি' ডাকে ;
অশোকের অগ্নিশিখা সুনীল গগনে ;
মলয়ের সাড়া পেয়ে সুপ্তিশেষে দেখে চেয়ে
কিংশুক, করুণ ঢালে সুরভি পবনে ;
বিলোল-তটিনীকূলে বিকশিত-তরুমূলে
শ্যাম শষ্পশয্যা'পরে লুটিছে মলয় ;
অব্যর্থ কুসুম-শরে প্রেম জাগে চরাচরে –
প্রেমের স্বপন ছায় মানব-হৃদয়।

রসাবেশে কৃষ্ণসার স্পর্শে শৃঙ্গে আপনার
সুখ-নিমীলিত-আঁখি মৃগীরে আপন ;
পদ্মগন্ধী জলধারা শুণ্ডে তুলি' আত্মহারা
প্রেমে করী করিণীরে করিছে অর্পণ ;
প্রিয়া সহ মধুব্রত এক পুষ্পে পান-রত,
অধীর গুঞ্জন তা'র প্রেম-অনুরাগে ;

চক্রবাক প্রেমসুখে দিতেছে প্রিয়ার মুখে—
অর্দ্ধভুক্ত, সুকোমল মৃণাল সোহাগে;
পল্লবিত শাখা-করে তরুরে হৃদয়ে ধরে'
লতাবধূ—অঙ্গে শোভে কুসুমভূষণ;
সে প্রেমপরশরাগে তরুর হৃদয়ে জাগে
সুষমাসৌরভভরা নবীন যৌবন;
নবস্ফুট হৃদি-কূলে সুপ্ত প্রেম আঁখি খুলে,
হৃদিকুঞ্জে বাজি' উঠে প্রণয়-কূজন;
কুসুমকুন্তলা ধরা মিলন-মাধুরী-ভরা,
প্রেমের বাঁশরী-রবে বিকল ভুবন।

বসন্তে সরম টুটে' মালতী, মাধবী ফুটে,
কেশরকুসুমে বসে ভ্রমরের দল,
লবঙ্গলতিকা ঘ্রাণে কি মোহ আবেশ আনে,
প্রেমপরিমলপানে পবন পাগল;
বিহগের অঙ্গে আর ধরে না লাবণ্যভার—
নবপক্ষে শোভে কিবা বর্ণ সুমুজ্জ্বল;
স্বচ্ছনীর সরোবরে শুভ্র হংস খেলা করে,
নীল জলে শোভে যেন শ্বেত শতদল;
সুনীল গগনতলে বলাকা ভাসিয়া চলে,—
গগনে লম্বিত যেন তারকার হার;

কপোতদম্পতি আসি' পান করে সুখে ভাসি'
গলিত-রজত-ধারা নির্ঝরের ধার ,
মৃগযুগ ফুল্লপ্রাণে চাহে ও উহার পানে,
আয়তলোচনে ফুটে প্রেমের কিরণ ;
চরাচরে নাহি আর বিষাদের অন্ধকার,
ললিতলাবণ্যে ভাসে প্রেমের স্বপন ।

আজি মলয়ের রথে এসেছে নন্দন হ'তে
আকুলপুলকদীপ্ত প্রণয় চঞ্চল ;
তাই আজ চরাচরে কি আলোক খেলা করে ;
কি প্রেম পীযূষপানে জগৎ বিহ্বল !
প্রণয়ের রক্তরাগে হৃদয়ে বসন্ত জাগে,
সুখস্বপ্নসুখাবেশে মোহিত হৃদয় ;
প্রেমের কিরণ লাগি' কি মাধুরী উঠে জাগি ;
চরাচরে কি আনন্দ দিব্য প্রেমময় !
নয়নে প্রেমের আলা, হৃদয়ে প্রেমের জ্বালা,
সরস প্রেমের কান্তি—নবীন যৌবন ;
অধরে প্রেমের ভাষা, বুকে ভরা ভালবাসা,
অন্তরে বাহিরে প্রেম বিশ্ববিমোহন ।
তৃষিত হৃদয় টানে তৃষিত হৃদয় পানে ;
তৃষিত নয়ন চাহে তৃষিত নয়নে ;

তৃষিত অধর 'পরে ; তৃষিত চুম্বন ঝরে ;
তৃষিত হৃদয় খুঁজে হৃদয় ভুবনে।

শুনিয়া প্রভাত বলিল, "বেশ হইয়াছে। কিন্তু 'অশোকের অগ্নিশিখা' কেন? বসন্তে অগ্নিসেবনের ব্যবস্থা! কেন ভ্রমণাদির মধ্যে তোমার নিকট কি অগ্নিসেবনই প্রশস্ত বোধ হইল?"

উভয়েই হাসিল।

প্রভাত বলিল, "এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে 'অগ্নিশিখা' কায নাই।"

প্রভাত সাগ্রহে বহু কাব্য পাঠ করিয়াছিল; তাই তাহার বন্ধু কবিতা সম্বন্ধে তাহার মত অবধানযোগ্য বিবেচনা করিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করা যায়?"

প্রভাত বলিল, "'রক্তকেতু' করিতে পার। বসন্তে প্রেমের দণ্ডপতাকাদির কল্পনা নূতন নহে। জয়দেব বসন্তে প্রস্ফুটিত কেশর কুসুমকে মদনমহীপতির কনকদণ্ড বলিয়াছেন। মধুসূদন প্রমীলার সহচরীর পৃষ্ঠবিলম্বিত বেণীর কথায় বলিয়াছেন, 'কামের পতাকা যথা উড়ে মধুমাসে'। 'কেতু' মন্দ হয় না।"

কিছুক্ষণ কথার পর বন্ধু চলিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রভাত ভাবিতে লাগিল। বসন্তসমাগমে কালিদাসের সেই প্রেমচাঞ্চল্যের বর্ণনা; তাহার পর বন্ধুর কবিতা,—"তৃষিত হৃদয় খুঁজে হৃদয় ভুবনে।" সুর মিলিয়াছিল। তখন বাসন্তী জ্যোৎস্নায় গগন প্লাবিত। প্রভাত কক্ষবাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল—বাতায়নপথে জ্যোৎস্নালোক তাহার বিরহশয়নের উপর আসিয়া পড়িল।

এ৬

জ্যোৎস্নালোকে মানব-হৃদয়ে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। জ্যোৎস্নালোকে শিল্পীর নয়নে ধরণী অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন লাবণ্যে সুন্দর হইয়া উঠে। জ্যোৎস্নালোকে কবির কল্পনা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। জ্যোৎস্নালোকে প্রেম প্রবল হইয়া উঠে। দিবালোকের সাধারণ প্রেম চন্দ্রালোকে অসাধারণ হইয়া উঠে। যে প্রেম দিবালোকে সংযত থাকে, জ্যোৎস্নালোকে তাহা কূলপ্লাবী হইয়া উঠে। মলয়বীজিত, জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে প্রভাতের প্রেম চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রভাত উঠিয়া বারান্দায় আসিল। সম্মুখে কৃষ্ণনাথের উপবন-বেষ্টিত গৃহ,—কোলাহলহীন—শান্ত যেন সুপ্ত। সিংহদ্বার রুদ্ধ। দক্ষিণ দিকে যে কক্ষে শোভার অধিকার, সে কক্ষের একটি বাতায়ন অর্দ্ধমুক্ত। সেই বাতায়নপথে কক্ষ হইতে আলোক বাহির হইতেছে। প্রভাত ভাবিতে লাগিল, সে যেমন নিদ্রাহীন নিশীথে পত্নীর কথা ভাবিতেছে, ঐ দীপালোকিত কক্ষে শোভাও কি তেমনই জাগিয়া তাহার কথা ভাবিতেছে না?

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত সুপ্ত গৃহের বাতায়নে নিবদ্ধদৃষ্টি প্রভাতচন্দ্র কল্পনায় কত সুখস্বপ্নের রচনা করিতে লাগিল। শোভার কত কথা, কত ব্যবহার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে সব স্মৃতি সুখের। প্রেম সুখস্মৃতি সযত্নে রক্ষা করে। প্রেমদীপ্ত স্মৃতি সুখের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবতী।

পরীক্ষা দিয়া কয় দিন পরেই প্রভাত গৃহে গেল।

শোভার শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কৃষ্ণনাথের পত্নী স্বামীকে বলিলেন, "পাঠাইতে হইবে।" কিন্তু শোভা এবারও পূর্ব্ববারের মত ক্রন্দন বাহির করিল। যৌবনের অতৃপ্ত কামনা যে তাহাকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিল না, এমন নহে। কিন্তু বিবাহের পর এই এক বৎসর সে পরিচিত পিতৃগৃহেই স্বামীকে পাইয়াছে; স্বামিলাভের জন্য পরিচিত জীবনের সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করিবার আবশ্যক হয় নাই। ভ্রাতৃবধূদিগের মধ্যে চপলার সহিত তাহার অধিক সৌহার্দ্য। চপলা অনেক সময় পিতৃগৃহে কাটাইত। তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। শোভা ভাবিত, চপলাই সুখী। এবার শোভাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছে শুনিয়াই চপলা তাহার নিকট আসিল। শোভা আলুলায়িতকুন্তলে বাতায়নে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিল। চপলা পশ্চাৎ হইতে তাহার চুল ধরিয়া টানিল। "উহু—হু—" করিয়া শোভা ফিরিল। বয়স্যাদিগের সহিত ব্যবহারে চপলার চাঞ্চল্য অনেক সময় এইরূপ শারীরিক পীড়নে আত্মপ্রকাশ করিত। তাহার চিমটি, ঘাড়ে পড়া, চুল ধরিয়া টানা—এই সকল ভালবাসার অত্যাচারে সমবয়সী শোভা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চপলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি, ঠাকুরঝি, এবার নাকি শ্বশুরবাড়ী ঘর করিতে যাইতেছ?"

শোভার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে হর্ম্ম্যতলে বসিল। চপলা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। চপলা বলিল, "স্বামীর জন্য শ্বশুরবাড়ী যাওয়া। ঠাকুরজামাই ত এই দুই দিন গিয়াছেন। আবার ত শীঘ্রই আসিবেন। তবে সে দেশে যাওয়া কেন? সে দেশের কথা তোমার কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার সে দেশে যাইবার কথা বলিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।"

শোভা বলিল, "কিন্তু কি করিব?"

"কোন রকম করিয়া বৎসর দুই কাটাইতে পারিলেই হইল। তাহার পর ঠাকুরজামাই ত এখানেই কায করিবেন।"

"কিন্তু এখন কি করি? মা কিছুতেই শুনিবেন না।"

"বাবা শুনিবেন। তুমি দেখিও। আর যদি নিতান্তই যাইতে হয়, দশ পনের দিনের মধ্যে ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইও। সেখানে যাইয়া যেন স্থির হইয়া থাকিও না।"

শোভা এই পরামর্শমত কায করিল। তাহার ক্রন্দনে কৃষ্ণনাথ বিচলিত হইলেন; গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করা যায়?"

কৃষ্ণনাথের পত্নী বলিলেন, "পাঠাইতেই হইবে। চিরকাল সব মেয়েই স্বামীর ঘর করিতে যায়। তোমার অতিরিক্ত আদরেই মেয়ের সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি। কেন, ঘরজামাই করিবে নাকি?"

"কিন্তু বড় যে কাঁদাকাটি করিতেছে!"

"করুক। বাড়াবাড়ি ভাল নহে।"

গৃহিণীর নিকট সহানুভূতি না পাইয়া কৃষ্ণনাথ বন্ধু শ্যামা-

প্রসন্নের শরণ লইলেন। শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "সে কি কথা? তাহারা যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়াছে। লেবু অধিক কচলাইলে তিক্ত হইয়া উঠিবে। আমি সেই সময়ই বলিয়াছিলাম, পল্লীগ্রামে বিবাহ দিবে,- ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। এখন মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবে না, এও কি হয়? শেষে তাহারা বিরক্ত হইবে।"

কৃষ্ণনাথ কোথাও সহানুভূতি পাইলেন না। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বয়ং শিবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন,—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পীড়া বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমবার কন্যাকে পাঠাইতে কিছু আয়োজন আবশ্যক—তাহা সময়সাধ্য। কিন্তু এখন এ অবস্থায় পাঠাইতে হইলে তাঁহাকে কিছু বিব্রত হইতে হয়।—ইত্যাদি।

পত্র পাইয়া শিবচন্দ্র একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু এবার বিরক্তি বৈবাহিকের উপর,—পুত্রের উপর নহে; কাযেই তাহাতে অভিমানলেশ ছিল না। বিশেষ পুত্র নিকটে।

কৃষ্ণনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। শোভাকে এবারও শ্বশুরালয়ে যাইতে হইল না। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা শোভা ভাবিল,—ভালই হইল।

যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রভাত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। শিবচন্দ্র দুঃখিত হইলেন। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে সান্ত্বনা দিলেন। প্রভাত পুনরায় কলিকাতায় পড়িতে গেল। নবীনচন্দ্রের যাহা বুঝাইয়া বলিবার কথা ছিল, তাহা আর বলা হইল না। প্রভাত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া দুঃখিত

হইয়াছে—এ সময় সে কথা বলিতে নবীনচন্দ্রের মন সরিল না,—পাছে সে ব্যথা পায়।

আশ্বিন মাসে পুনরায় বধূকে আনিবার কথা উঠিল। শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, "নবীন, লোকে নিন্দা করিবে; বড়মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিয়া এত দিনে একবার বধূকে আনিতে পারিলাম না।" নবীনচন্দ্র সেই দিনই প্রভাতকে পত্র লিখিলেন,—"এই আশ্বিনমাসেই বধূমাতাকে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছি। তুমি সঙ্গে আনিবে। যাহাতে আসা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া লিখিও। আর না আসা ভাল দেখায় না।"

প্রভাত শোভাকে বলিল, "শোভা, পূজার ছুটীতে আমি বাড়ী যাইব। তোমাকে এবার যাইতে হইবে।"

শোভা উত্তর দিল না। প্রভাত দেখিল, তাহার মুখ গম্ভীর হইল। সে আদর করিয়া তাহার ভরা গণ্ডে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল; বলিল, "মুখ আঁধার কেন?"

শোভা তবু উত্তর দিল না দেখিয়া প্রভাত বলিল, "আমি একা যাইব? তুমি যাইবে না?"

না যাইবার যে বিশেষ সঙ্গত কারণ ছিল না, শোভা আপনি তাহা জানিত। সে বলিল, "তুমি যাইতে বল, যাইব।"

প্রভাত আনন্দে অধীর হইল; সাগ্রহে পত্নীর মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বর্ষণ সত্ত্বেও যেমন বর্ষার আকাশে মেঘ লাগিয়া থাকে, তেমনই শোভার আননে একটু আঁধার রহিয়া গেল—ঘুচিল না। প্রভাত আপনার অঙ্গুলিতে শোভার এক গুচ্ছ চুল জড়াইতে

জড়াইতে বলিল, "দেখিবে, নূতন স্থান বেশ লাগিবে।" শোভা কিছু বলিল না।

আশ্বিন মাসে শোভা শ্বশুরালয়ে গেল।

বধূকে গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিত করেন, শোভার শাশুড়ীর এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শোভার তাহাতে আদৌ আগ্রহ ছিল না। পিসীমা সহজে তাহাকে কোনও কায করিতে দিতেন না। ভ্রাতৃজায়া কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, "ছেলেমানুষ। শিখিবার সময় হউক; সবই শিখিবে।" নবীনচন্দ্র অবশ্যই পিসীমার সমর্থক ছিলেন। পান সাজিলে মা'র হস্ত কর্কশ হইবে; পাকশালার তাপ তাহার সহিবে না; অন্য গৃহকর্ম্মে সে শ্রান্ত হইবে – ইত্যাদি। শোভা আসিলে কমল পিত্রালয়ে আসিয়াছিল; সেও ভ্রাতৃজায়াকে অজস্র যত্নে কর্ম্ম হইতে দূরে রাখিত। এমন কি, শিবচন্দ্রের পত্নী এবার স্বামীর সম্পূর্ণ সহানুভূতিও পাইলেন না। শিবচন্দ্রও বলিলেন, "ব্যস্ত কেন? সময়ে সবই শিখিবে। যদি শিখাইয়া লইতে না পার, সে তোমাদের দোষ।" তাহারও বধূকে আদর করিবার ক্রটী ছিল না।

এত আদর যত্ন যে শোভার হৃদয় স্পর্শ করিত না, এমন নহে। কিন্তু সে এই সংসারে স্থায়ী হইয়া—ইহারই অঙ্গীভূত হইবার কল্পনা করে নাই। করিলে সে যে সংসারে সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল—সকলের স্নেহভাজন হইয়াছিল—সামান্য চেষ্টায়—সহজে সেই সংসারের হইয়া যাইত। সে চেষ্টাও আপনি আসিত। বিশেষ নবীনচন্দ্রের ও পিসীমা'র উচ্ছ্বসিত স্নেহ তাহার হৃদয়কে

কোমল করিয়াছিল—এ সময় পরিবর্ত্তন সহজেই সংঘটিত হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

আশ্বিনের শেষে একদিন অপরাহ্নে শোভা দ্বিতলে আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে কয়খানি শুভ্র অভ্র আকার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। শোভা সম্মুখে বর্ষাবারিপাতে প্রচুরপল্লবশ্যাম বৃক্ষলতা দেখিতেছিল। প্রভাত কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, দ্বারে পাদুকা ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে যাইয়া পশ্চাৎ হইতে শোভার কর্ণাভরণে আদর করিয়া টোকা মারিল। কর্ণমূলে সামান্য বেদনা লাগিল;—কিন্তু সে বেদনা সুখের। শোভা ফিরিয়া দেখিল,—প্রভাত।

প্রভাত দেখিল, শোভার মুখখানি প্রফুল্ল। কিন্তু তাহার নয়নে দৃষ্টিতে অতৃপ্তিদীপ্তি সে দৃষ্টি কোমলতাসিক্ত নহে।

প্রভাত বলিল, "শোভা, নূতন দেশ কেমন লাগিতেছে?"

শোভা বলিল, "কেন?"

"থাকিতে পারিবে ত?"

শোভা মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি থাকিতেছি না?"

প্রভাত আদর করিয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিল। শোভা সে সোহাগের প্রতিদান দিল। প্রভাত বলিল, "আমার কলেজ খুলিতে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে। আমি কলিকাতায় যাইব।

বৈশাখের অপরাহ্নে যেমন মেঘান্ধকার দেখিতে দেখিতে দিবসের আলোক অপহৃত করিয়া দেয়,—তেমনই দেখিতে দেখিতে

শোভার মুখের সে প্রফুল্লভাব দূর হইয়া গেল। সে বলিল, "আমাকে লইয়া যাইবে না?"

প্রভাত বলিল, "তুমি অগ্রহায়ণ মাসে যাইবে।"

"তুমি আমাকে লইয়া চল।"

প্রভাতকে নিরুত্তর দেখিয়া শোভা পুনরায় বলিল, "তুমি চলিয়া যাইলে আমি থাকিতে পারিব না।"

শোভার কথায় প্রভাত যেমন বিপদে পড়িল, তেমনই আনন্দিত হইল। শোভা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না! সে পুনরায় শোভার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। শোভা পুনরায় বলিল, "আমাকে কিন্তু লইয়া যাইতে হইবে।"

প্রভাত চলিয়া গেল। শোভা বাক্স হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া পিতাকে পত্র লিখিল।

এ দিকে পত্নীর অবিরল অশ্রুধারায় প্রভাতের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল, এবার না হয় এই মাসেই শোভা ফিরিয়া যাউক;—পরবার আসিয়া অধিক দিন থাকিবে।

পত্নীর অশ্রুবিপ্লুত মুখখানির কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত কলিকাতায় গেল।

এ দিকে কন্যার পত্র পাইয়া কৃষ্ণনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি গৃহিণীকে বলিলেন, "শোভাকে আনাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "দিন কতক যাউক না কেন?" কিন্তু গৃহিণী মুখে যাহাই বলুন, তাঁহারও চিত্ত সেই প্রবাসিনী কন্যার

জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। সে তাঁহার একমাত্র কন্যা ;—বড় আদ-রের। তাই কৃষ্ণনাথ দুই চারিবার বলিতেই গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, লিখিয়া দাও। পত্র লিখিলে সেই দিনই ত আর তাহারা পাঠাইবে না।"

কৃষ্ণনাথ শিবচন্দ্রকে লিখিলেন, "বাড়ীতে সব অসুখ যাইতেছে। এ সময় শোভাকে পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সকলেই তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। আপনার অনুমতি হইলে আনিবার ব্যবস্থা করিব।"

প্রভাত যে দিন গৃহ হইতে গেল, তাহার পর দিন এই পত্র শিবচন্দ্রের হস্তগত হইল। শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে ডাকিয়া পত্র দিলেন। পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন. "বাড়ীতে সব অসুখ করিয়াছে ?"

শিবচন্দ্র একটু হাসিলেন ; বলিলেন, "গত পরশ্বও পত্র পাইয়াছি ; তাহাতে কাহারও অসুখের কথা ছিল না।" তখন নবীনচন্দ্রেরও মনে পড়িল,—পূর্ব্বদিন শোভা পিত্রালয় হইতে পত্র পাইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, সব ভাল ?" উত্তরে শোভা বলিয়াছিল. "ভাল।" তিনি ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আজ এরূপ লিখিবার কারণ ?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "প্রভাত বাড়ী হইতে গিয়াছে। তাঁহারা আর এখানে কন্যা রাখিতে ইচ্ছুক নহেন।"

শুনিয়া সরলহৃদয় নবীনচন্দ্রের নয়নদ্বয় বিস্ময়বিস্ফারিত হইল। তিনি বলিলেন. "আমি প্রভাতকে পত্র লিখিয়া দিতেছি।"

"তাহাকে পত্র লিখিয়া কি হইবে? সে ইহার কিছু জানে না। তাহাকে লিখিলে সে মন খারাপ করিবে। সে চঞ্চল-প্রকৃতি; হয় ত বধূমাতার প্রতি বিরক্ত হইবে।"

"তবে কি লিখিবেন?"

"তাঁহারা যখন পীড়ার কথা বলিয়া কন্যাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি পাঠাইব; অভদ্রতা করিব না। তাঁহাদের বিবেচনা তাঁহাদের কাছে। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব।"

জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শিবচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু আর আনাইবার কথা আমাকে বলিতে পারিবে না। তোমরা যাহা হয় করিও

নবীনচন্দ্র ভাবিলেন, সে জন্য চিন্তা করি না। এ রাগ থাকিবে না।

এক দিকে জ্যেষ্ঠ, অপর দিকে প্রভাত, আর এক দিকে কুটুম্ব—তিন দিকের আকর্ষণে নবীনচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। তিনি সকলকে সুখী করিতে ও সুখী দেখিতে ইচ্ছা করিতেন।

শিবচন্দ্র বৈবাহিককে লিখিলেন, "আপনি গৃহে অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীমতী বধূমাতাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি করিতে পারি না। আপনি ভাল দিন দেখিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন।"

শোভা পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল।

নাগপাশ।

প্রভাত জানিতে পারিল না পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। রবিকরোজ্জ্বল নীলাম্বরের এক প্রান্তে যে বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যুৎকেতন অন্ধকার মেঘে পরিণত হইতেছিল, তাহা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল না। সে সম্ভাবনার কথা তাহার মনে পড়িল না,—তাই সে সে দিকে চাহিয়া দেখিল না।

ইহার পর শোভার সন্তান-সম্ভাবনা হইল। সুতরাং, তখন আর তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব উঠিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছায়া।

যেমন নিকটে অন্য তাড়িতপ্রবাহ থাকিলে বিদ্যুৎ আপনি তাহা জানিয়া প্রবল হয়, তেমনই স্নেহের আকর্ষণে হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হয় তাই প্রভাত ক্রমে শ্বশুর-পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভার পক্ষেও ধূলগ্রামে ঘর করিতে যাইবার কল্পনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছিল।

পরীক্ষা দিয়া প্রভাত গৃহে গেল। শোভার যাওয়া ঘটিল না।

বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ;—বাতাস যেন অনল-শিখা, তাহার স্পর্শ ক্লেশকর। আকাশে চাহিতে চক্ষু ক্লিষ্ট হয়। আহার,—উপবেশন,—শয়ন,—কিছুতেই সুখ নাই—দেহে যেন দৌর্ব্বল্যকাতরতা ; দেহের সমস্ত শক্তি যেন অবিরল-ধারায় বাহির হইয়া যাইতেছে। যাহার নিতান্ত আবশ্যক, সে ভিন্ন আর কেহ রৌদ্রতপ্ত রাজপথে বাহির হইতেছে না। রাজপথ প্রায় শূন্য।

কৃষ্ণনাথের অন্তঃপুরে যে কক্ষে বধূত্রয়ের সহিত শোভা বসিয়াছিল, সে কক্ষে সকলেই যেন শ্রান্ত। বড় বধূ চপলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট ঠাকুরপো আজ কেমন ?"

গ্রীষ্মাগমে নলিনবিহারীর শিরঃপীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিকিৎসকগণ নানা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। এক বিষয়ে সকল চিকিৎসক একমত,—কিছুকাল মানসিক

শ্রমমাত্র করা হইবে না। আপাততঃ স্থানপরিবর্ত্তনে কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু মানসিক শ্রম থাকিলে নিস্তেজ স্নায়ু সতেজ হইবে না। কিন্তু সেই মানসিক শ্রমবিরতিই নলিনবিহারীর পক্ষে অসম্ভব; তাহার হৃদয়ে যদি কোনও সুখ থাকে, তবে সে পুস্তকের- যদি কিছুতে তাহার সুখ থাকে, তবে সে পত্নীর প্রতি প্রেমে ও পুস্তকের সাহচর্য্যে। মানসিক শ্রমবিরতির কথা কল্পনা করিলে, তাহার বহুদিনের চেষ্টায় সংগৃহীত ও সঞ্চিত পুস্তকরাশির মধ্যে বসিয়া তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। প্রত্যেক পুস্তকের সহিত কত স্মৃতি বিজড়িত! সুখে, দুঃখে, সাফল্যে, অসাফল্যে, সম্পদে, বিপদে, গৌরবে, অপমানে সে সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছে;-- সুখে সুখ শতগুণ বাড়িয়াছে, দুঃখে সে সান্ত্বনা পাইয়াছে; তাহাদের সাহচর্য্য-ত্যাগ কি তাহার পক্ষে সম্ভব?

বড়বধূর কথার উত্তরে চপলা বলিল, "দেখিয়া বোধ হইল, খুব যন্ত্রণা হইতেছে। বড়দিদি, গত কল্য বড় ডাক্তারগণ কি বলিয়া গিয়াছেন?"

বড়বধূ অপ্রিয় সত্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মধ্যমা বধূ বলিলেন, "তাঁহারা বলিয়াছেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথার কি সব খারাপ হইয়াছে; ভাল রক্ত যায় না। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

চপলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইবে?"

মধ্যমা বধূ বলিলেন, "তাঁহারা বলেন, লিখাপড়া একেবারে

ছাড়িয়া দিলে শরীর ক্রমে সুস্থ হইতে পারে। রোগ একেবারে না সারুক, খুব কমিয়া যাইবে। সে কথা বলিয়া ত সকলে হার মানিয়াছে।"

বড়বধূ বলিলেন, "পড়াশুনায় এমন মন প্রায় দেখা যায় না। চপলা, তুমি বিশেষ করিয়া ধর। শরীরের বড় ত আর কিছুই নহে!"

শোভাও চপলাকে বলিল, "তুমি ভাল করিয়া বল। নহিলে হইবে না।

চপলা কি বলিতে যাইতেছিল। মধ্যমা বধূ বলিলেন, "বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল; ভেড়া বলে কত জল! চপলা বলিলে ত সব হইবে! পোড়া কপাল ভালবাসার; ছাই আর পাঁশ। আজ যদি চপলা মরে, তবুও ঠাকুরপো বই লইয়া বেশ সুখে থাকিতে পারিবে। এমন আর দেখিও নাই, শুনিও নাই। লিখাপড়া ত অনেকেই করে। তাই বলিয়া কি স্ত্রীকে এমন তাচ্ছীল্য করে? ছিঃ! ছিঃ!"

বড়বধূ ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলেন; কিন্তু সে নিষেধে কোনও ফল ফলিল না। মধ্যমা বধূ দ্রুত এত কথা বলিয়া যাইলেন। শুনিয়া বড়বধূ ও শোভা সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কি একটা কাযের ছুতা করিয়া চপলা উঠিয়া গেল। সে চলিয়া যাইলে বড়বধূ মধ্যমাকে বলিলেন, "তুমি ভাল কায কর নাই। অমন কি বলিতে আছে?"

তিনি বলিলেন, "কেন, আমি কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি?"

"সত্য হইলেও কি অমন করিয়া বলিতে হয়? আর, ভালবাসা সকলের কি একই রকমের হয়?"

মধ্যমা বধূ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "নাঃ! রকম রকম হয়।"

"ছোট ঠাকুরপো এখন পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত; যদি তাহাতে অধিক মন হয়, তবে সেই কি দোষের? অমন ধীর, নম্র, বিদ্বান ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। এ কথা সকলেই বলে। কোন দিন মুখে একটি উচ্চ কথা নাই।"

শোভা বলিল, "এমন কি ভৃত্যদিগকেও উচ্চ কথা কহেন না।"

মধ্যমা বধূ আত্মপক্ষসমর্থনের চেষ্টা করিলেন।

শোভা বলিল, "তুমি যাহাই বল, মেজ বৌদিদি, তোমার অমন করিয়া বলা ভাল হয় নাই।"

বড়বধূ বুঝিতে পারেন নাই যে, নলিনবিহারীর যশই মধ্যমা বধূর বিচারে তাহার সকল দোষের মূল! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত নলিনবিহারীর বয়সের অনেক পার্থক্য,—প্রায় দশ বৎসর। বিনোদবিহারীর সহিত কনিষ্ঠের বয়সে অল্প দিনের অনৈক্য। বিদ্যালয়ে কনিষ্ঠ বিনোদবিহারীকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল; যশেও তাহাই হইয়াছে। তাহাই মধ্যমা বধূর অসহনীয়। তাই বলিয়াছি, বড়বধূ বুঝিতে পারেন নাই যে, নলিনবিহারীর যশই মধ্যমা বধূর বিচারে তাহার সকল দোষের মূল।

সে দিন আপনার ঘরে যাইয়া চপলা ভাবিতে বসিল। মধ্যমা বধূর কথাগুলি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল। বিষ শরীরে একবার প্রবেশ করিলে দেহের সকল শক্তি বিকৃত করিয়া ফেলে। চপলা ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি সে এমন অভাগিনী যে, লোকে তাহাকে কৃপার পাত্র বিবেচনা করে? মেজদিদি বলিয়াছে, পোড়া কপাল ভালবাসার! সে মরিলেও তাহার স্বামীর দুঃখ হইবে না? ভাবিতে চপলার নয়নে জল আসিল। যে পথে তাহার পর্য্যবেক্ষণ চালিত হইল, সে পথে মধ্যমা বধূর স্বেচ্ছাকৃত সন্দেহের কুজ্ঝটিকা ছিল তাই সবই কেমন বিকৃত দেখাইতে লাগিল। সত্যই ত নলিনবিহারী কোন দিন বাক্যের বা কার্য্যের আতিশয্যে আপনার প্রেম প্রকাশ করে নাই! তবে তাহা প্রেমহীনতার পরিচয়? নহিলে মেজদিদি অমন বলিবে কেন? বাতাবিক্ষুব্ধ হ্রদের জলরাশি যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, চপলার বালিকাহৃদয় তেমনই একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। নলিনবিহারীর পীড়াও বাড়িতে লাগিল; চপলার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও বাড়িতে লাগিল। মধ্যমা বধূর কুটিল ইঙ্গিত তাহার সন্দেহানলে ইন্ধন যোগ করিতে লাগিল।

এই সময় প্রভাতের পরীক্ষার ফল বাহির হইল,—প্রভাত এবারও অকৃতকার্য্য হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া প্রভাত কলিকাতায় আসিল;—আবার পড়িবে।

কৃষ্ণনাথের আফিসে একটি ভাল কর্ম্ম খালি ছিল। তিনি প্রভাতের নিকট প্রস্তাব করিলেন, বাজার যেরূপ, তাহাতে 'পাস' করিয়াও যে সহসা বিশেষ কিছু হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। যদি সে ইচ্ছা করে, এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। তাঁহার আফিস;—তিনি কায শিখাইয়া লইবেন। বেতনও নিতান্ত অল্প নহে, আজকাল সহজে সেরূপ বেতনের কর্ম্ম জুটে না। কালে,—তিনি অবসর গ্রহণ করিলে—সে মুৎসুদ্দির কাযও পাইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ছেলেরা কেহ কার্য্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। তাহারা কর্ম্মের অনুপযুক্ত।

উপর্য্যুপরি দুইবার পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইয়া প্রভাত নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল।—সে সম্মত হইল।

প্রভাত কার্য্যে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়া পিতাকে ও পিতৃব্যকে পত্র লিখিল। তাহার পত্র পাইয়া শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, "উন্নতি কবে হইবে, স্থির নাই। বর্ত্তমান বেতনে যে বাসাখরচ নির্ব্বাহ হওয়াই দুষ্কর! যদি আর পড়িতে না চাহে, বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই ভাল হয়।"

নবীনচন্দ্র প্রভাতকে লিখিলেন, "দাদার ও আমার শরীর ক্রমেই অপটু হইয়া পড়িতেছে। তোমার বাড়ী থাকা আবশ্যক হইতেছে। এখন হইতে সব বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। আমরা অনেক দিন হইতে এ কথা মনে করিতেছি। পাছে তুমি মনে কর, তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছ বলিয়া আমরা এ কথা

বলিতেছি—এই জন্য এবারও তোমাকে বলি নাই। আমাদের মতে তুমি বাড়ী আসিলেই ভাল হয়।"

যথাকালে প্রভাত এই পত্র পাইল। কিন্তু স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের কথা পড়িয়া ও ইংরাজী সমাজে তাহার গৌরবের বিবরণ দেখিয়া সে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; আগ্রহাতিশয়ে ভুলিয়া গিয়াছিল, গৃহে যাহা কিছু তাহারই, এবং তাহার রক্ষণ তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠকে বুঝাইলেন,—প্রথম ঝোঁক কিছু প্রবলই হয়। কিছু দিন পরেই চাকরীর নেশা ছুটিয়া যাইবে।

নবীনচন্দ্র বুঝাইলেন বটে, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিবচন্দ্র তাহাই বুঝিলেন কি না সন্দেহ।

প্রভাতের এ কার্য্যগ্রহণ বিষয়ে তাহার ও কৃষ্ণনাথের সম্মতি ছিল; আর কাহারও তাহা অভিপ্রেত ছিল না।

চপলা শুনিয়া বলিল, "শুধু শুধু চাকরী করাই বা কেন?" গৃহিণী শুনিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "লোকে কি ভাল বলিবে?"

শুনিয়া কৃষ্ণনাথ কিছু বিরক্ত হইলেন। সকলেই তাঁহার মতের বিরোধী! তিনি বলিলেন, "তোমরা সব ঐ রূপ বুঝ। শ্যামাপ্রসন্ন বলে, 'এক শত, দেড় শত টাকা বেতন পায়, এমন ছেলে ত কলিকাতাতেও অনেক জুটিল; তাহার জন্য পল্লীগ্রামে যাইবার আবশ্যক ছিল না।' এখনকার দিনে এক শত দেড় শত টাকা বেতন কি সহজ কথা? হাকিম বৎসরে কয়টা হয়?

হইলেই বা কি বেতন ? মরিবার সময় পাঁচ শত। উকীল এখন কুড়ি টাকায় চারি গণ্ডা। আমি বসাইয়া দিয়া যাইতে পারিলে তাহার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তোমার ছেলেদের একটারও ত সে ক্ষমতা হইল না! কেবল খরচ করিতে পারেন। প্রভাত ত ভাল ছেলে।" গৃহিণী নলিনবিহারীর অস্বুস্থতার ওজর করিলেন। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আর দুই জন ? আমি মুখে রক্ত তুলিয়া যাহা করিলাম, তাহা রাখিয়া খাইবার ক্ষমতা হইলেই বাঁচি।"

গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে ত ? পরের ছেলে ;—তাহারা কি বলে—" কৃষ্ণনাথ বাধা দিয়া বলি-লেন, "বলাবলি আর কি ? তাঁহাদের ক্ষমতা হয়, ভাল কায করিয়া দিবেন। কর্ম্ম কায পথে পড়িয়া আছে কি না ; কুড়াইয়া লইলেই হইল ! চাকরী তত সুলভ নহে।"

কৃষ্ণনাথ কিছু উত্তেজিত হইয়াই কথাগুলা বলিয়াছিলেন। নহিলে সচরাচর তিনি এমন কথা বলেন না। উত্তেজনা-হেতু কণ্ঠস্বরও কিছু উচ্চ হইয়াছিল। শোভা পার্শ্বের কক্ষে ছিল। সে সব শুনিতে পাইল।

পিতার সেই কথা শোভার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,— "শ্যামাপ্রসন্নও বলে, 'এক শত, দেড় শত টাকা বেতন পায়, এমন ছেলে ত কলিকাতাতেও অনেক জুটিত ; তাহার জন্য পল্লীগ্রামে যাইবার আবশ্যক ছিল না'।" চপলাও শুনিয়া বলিয়াছে,— "শুধু শুধু চাকরী করাই বা কেন ?"

কৃষ্ণনাথ প্রস্তাব করিলেন, প্রভাতের পক্ষে আর বৃথা ছাত্রাবাসে থাকা অনাবশ্যক। কিন্তু জামাতা গৃহে থাকে, তাহা গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল না। কারণ, তাহাতে জামাতার আদর থাকে না। শোভারও তাহাতে মত ছিল না। প্রভাতও এক কথায় সম্মত হইল না। কিন্তু ছাত্রাবাসেও আর তাহার সুবিধা হইত না। তাহার সময়ের ছাত্রাবাসবাসীরা প্রায়ই পাঠ শেষ করিয়া গিয়াছে; এখন নূতন দল আসিয়াছে। কিন্তু পিতা কি মনে করিবেন? শেষে সে ছাত্রাবাসে একটি ঘর রাখিল। অবস্থান প্রায় শ্বশুরালয়েই হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কন্যা।

আষাঢ়ের অপরাহ্ন। নিশাবসান হইতে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্ষণের আর বিশ্রাম ছিল না। এখনও বর্ষণ শেষ হয় নাই - প্রশমিতবেগ হইয়াছে মাত্র। এখনও পথিপার্শ্বে পয়ঃপ্রণালীপথে আবিল জলধারা শুষ্কবংশপত্র ও তৃণাদি ভাসাইয়া লইয়া বহিয়া যাইতেছে। খাল, বিল, পল্বল—পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে দিবালোক ম্লান, রবির কিরণগোলক দৃষ্টিগোচর হয় না। এখন আকাশ জুড়িয়া মেঘ; —কোথাও ধূসর, কোথাও নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তি, কোথাও প্রভিন্ন অঞ্জন তুল্য, মেঘ মেঘের উপর দিয়া নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইতেছে, বারি বর্ষণ করিতেছে, লঘু হইয়া পবনের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছে! চারি দিকে ভেকের আনন্দ-কোলাহল। সতীশচন্দ্রের গৃহের সম্মুখে, পথের অপর পারে বৃহৎ কদম্ববৃক্ষ কুসুমসম্পদে সম্পদশালী হইয়াছে; গৃহপ্রাঙ্গনে কুটজশিশুও কুসুমে পূর্ণ।

কমল শাশুড়ীকে বলিল, "মা, বেলা পড়িয়া আসিল। আজ যে আর বৃষ্টি ধরে, এমন বোধ হয় না। চল, ঘাট হইতে আসি।"

শাশুড়ী বলিলেন, "আজ তোমার ঘাটে যাইয়া কায নাই। তুমি অমলকে রাখ; আমি আসি।"

"কেন, আমার কি হইয়াছে, মা?"

"মা, তোমার শরীর যে সারিতেছে না। এখনও সারিয়া উঠিতে পার নাই। আবার কয় দিন হইতে একটু একটু কাশিও দেখিতেছি।"

"আমার কোনও অসুখ নাই। তোমরা মিছামিছি ভয় পাও।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "অসুখ না থাকিলেই বাঁচি। মা লক্ষ্মী, তুমি এক দিন পড়িলে কি সংসার চলে? তুমিই সংসার রাখিয়াছ।" পৌত্রের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "কি বল, খোকাবাবু?"

খোকাবাবু তখন একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্বকে কাগজের তৃণ ভোজন করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পিতামহীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু পিতামহী কক্ষত্যাগের উদ্যোগ করিবামাত্র তিনি তাহাতে ঘোর আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন;—এমন কি, অশ্ব তৃণ, সব ত্যাগ করিয়া পিতামহীর অঞ্চল ধারণ করিলেন। তখন পিতামহী তাহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন,—তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাকে একটি পুতুল দিয়া জননীর নিকট থাকিতে সম্মত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন।

কমল পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিল। কয় মাস পূর্ব্বে কমলের সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যভাগে দুর্ঘটনা ঘটিবার পর হইতে কমল শরীর আর পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় নাই। স্নেহশীলা মা তাহাতে চিন্তিতা হইয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র সে জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিল। মাতাপুত্রে সর্ব্বদা কমলকে সাবধানে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সে অধিক কায করিতে যাইলে মা বাধা দিতেন।

মা যাইবার অল্পক্ষণ পরেই সতীশচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

কমল বলিল, "মা ঘাটে গিয়াছেন। কি চাহি?"

"তোমাকে যাইতে বারণ করিতে আসিয়াছি।"

"সে আর মা'কে বলিয়া দিতে হইবে না।"

সতীশ আদর করিয়া পত্নীর গণ্ডে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল; বলিল, "গরম জামা পর নাই কেন?"

কমল বলিল, "কেন, আমার কি হইয়াছে? তোমরাই 'অসুখ'—'অসুখ' করিয়া আমাকে রোগী করিবে।"

সতীশ পত্নীর মুখচুম্বন করিল, বলিল,—"না, তোমার কোনও অসুখ নাই। আমি বলিতেছি, তাই একটা গরম জামা পর।

"আচ্ছা, পরিব।"

"'আচ্ছা, পরিব'—বলিলে আমি শুনি না। আমি অমলকে দেখিতেছি। তুমি যাও, গরম জামা পরিয়া আইস।"

"কি ব্যস্ত মানুষ! কথা বলিলে আর বিলম্ব সহে না!"

কমল স্বামীর আদেশপালন করিতে গেল। যে সত্য সত্যই ভালবাসে, সে যদি ভালবাসা-জাত ভিত্তিহীন আশঙ্কা বশতঃও কোনও অন্যায় আদেশ করে, তবুও হৃদয় সে আদেশ-পালনে সুখ পায়।

কমল ফিরিয়া আসিয়া বসিল। সতীশচন্দ্র পুত্রের সহিত খেলা করিতেছিল। সেও বসিল। কমল জিজ্ঞাসা করিল, "আসন পাতিয়া দিব ?"

সতীশ বলিল, "না।"

তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে কত কথা হইতে লাগিল। সে সব কথা সাংসারিক হিসাবে অনাবশ্যক; কিন্তু প্রেমের হিসাবে অত্যাবশ্যক। তাহার মধ্যে কত বিদ্রূপ, কত রহস্য—তাহাতে কত আনন্দ,—কত সুখ!

দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া গেল। মা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শাশুড়ীর পদধ্বনি শুনিয়াই কমল কক্ষান্তরে যাইতেছিল। মা বলিলেন, "বৌমা, সতীশকে খাবার দাও।"

সতীশ জননীকে বলিল, "মা, এ বাদলায় না হয় ঘাটে না-ই যাইতে ?"

মা বলিলেন, "সতীশ, বৌমা কিন্তু যাইতে চাহিতেছিল। দুষ্ট মেয়ে কিছুতেই সাবধান থাকিতে চাহে না। শরীর ত সুস্থ হইতেছে না। আবার আজ কয় দিন হইতে কাশি হইয়াছে। তুই কল্যই একবার ডাক্তারকে আনা।"

সতীশ বলিল, "আচ্ছা।"

সতীশ আহার করিয়া যাইলে কমল শাশুড়ীর সহিত খুব ঝগড়া করিল,—"কেন, আমার কি হইয়াছে ?"

মা বলিলেন, "মা, শরীর যে শোধরাইতেছে না।"

কমল বলিল, "মা, তোমার বৃথা ভয়।"

পরদিন গ্রামের ডাক্তার আসিলেন। তিনি নাড়ীতে জ্বর পাইলেন না; রোগের স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অগত্যা বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। রোগী দেখিলে ঔষধের ব্যবস্থা করা রীতি।

ইহার কয় দিন পরেই কমলের স্পষ্ট জ্বর প্রকাশ পাইল। সতীশ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মা চিন্তিতা হইয়া শিবচন্দ্রকে ও নবীনচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন; তাঁহাদিগকে বলিলেন, "গ্রামের ডাক্তারকে ত দেখান হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, একবার কলিকাতায় লইয়া যাইয়া ভাল ডাক্তার দেখাইয়া আনা হয়। শরীর শোধরাইতেছে না।

সকলেরই সেই মত হইল। স্থির হইল, চিকিৎসা সম্বন্ধে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবার জন্য পক্ষকালের জন্য কমলকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।"

কমল আপত্তি করিয়া বলিল, "আমার কোনও অসুখ নাই।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "মা, না হয় আমি, নবীন, অমল—তিন ছেলে বেড়াইতে যাইব। মা কি ছেলেদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে?"

নবীনচন্দ্র প্রভাতকে বাড়ী ভাড়া করিতে লিখিয়া দিলেন।

শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, তিনি ও বড়বধূ সঙ্গে যাইবেন,—গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবেন। পিসীমা'র যাইতে চাহিবার প্রধান কারণ,—কয় মাস প্রভাতকে ও শোভাকে দেখেন নাই।

শেষে তাহাই স্থির হইল ;—সকলেই যাইবেন, এবং এক পক্ষকাল সেথায় থাকিয়া কমলকে ডাক্তার দেখাইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

গ্রামের ডাক্তারের চিকিৎসায় ও বিশেষ সতর্কতায় কমলের জ্বর কয় দিনেই বন্ধ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পুত্র।

কমলকে লইয়া সকলে কলিকাতায় আসিলেন। প্রভাত বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। সে ছাত্রাবাসে আপনার কক্ষটিও ঝাড়িয়া, গুছাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শিবচন্দ্রের জানিতে বিলম্ব হইল না যে, পুত্রের ছাত্রাবাসে বাস নামমাত্র। তিনি বিরক্ত হইলেন। পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র প্রভাতকে যাহা লিখিয়াছিলেন, এবার শিবচন্দ্র স্বয়ং পুত্রকে তাহা বলিলেন। তিনি বলিলেন,—তাঁহার শরীর ক্রমে অপটু হইয়া পড়িতেছে, সে দেশে যাইলে ভাল হয়। প্রভাত স্পষ্ট "না" বলিতে পারিল না; তবে ভাবে শিবচন্দ্র বুঝিলেন, তাহার কর্ম্মত্যাগ কবিবার ইচ্ছা নাই। তখন তিনি বলিলেন, "যদি এখানে থাকিতেই হয়, তুমি বাসা কর। আর ছাত্রাবাসে থাকা ভাল দেখায় না।" প্রভাত সম্মত হইল। শিবচন্দ্র বৈবাহিককেও এ কথা বলিলেন। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "এ দুইটা মাস যাউক। তাহার পর যাহা স্থির করেন হইবে। এখন একা এক বাসায় থাকা—" শিবচন্দ্র ইহাতে আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

ধূলগ্রাম হইতে সকলে কলিকাতায় আসিবার পর দিনই কৃষ্ণনাথের পত্নী বৈবাহিকাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শোভা সঙ্গে আসিল। তাঁহারা যাইবেন শুনিয়া চপলা সঙ্গে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। গৃহিণী

তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যাতায়াতেই কুটুম কুটুম্বিতা বাড়ে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, চপলা অদ্ভুত জীব দেখিবার আশায়—কৌতূহলবশে যাইতে চাহিয়াছিল। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইলেন।

বৈবাহিকার ব্যবহারে অল্পে তুষ্টা পিসীমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বধূকে পাখা করিবার জন্য যে এক জন দাসী পাখা লইয়া আসিয়াছিল, সেটা পিসীমা'র কাছেও ভাল লাগিল না। পিসীমা বধূকে কত আদর করিলেন; আপনি পাখা লইয়া তাহাকে ব্যজন করিলেন। কমল অজস্র যত্নে যেন তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিল। কমলের শাশুড়ীর পক্ষেও আদরের ত্রুটী হইল না। কন্যার এইরূপ আদর দেখিয়া গৃহিণীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

চপলা কিন্তু নবাগতাদিগের কথার উচ্চারণে ও ব্যবহারে নূতনত্ব লক্ষ্য করিতেছিল, এবং লক্ষ্য করিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য মৃ মৃদু হাসিতেছিল। শিবচন্দ্রের পত্নীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই তাঁহার মুখ গম্ভীর।

গৃহে ফিরিয়া গৃহিণী কুটুম্বদিগের অশেষ প্রশংসা করিলেন; সকলকে কন্যার সৌভাগ্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। এ দিকে চপলা তাহার লক্ষিত উচ্চারণের ও ব্যবহারের যে অভিনয় করিল, তাহা মধ্যমা বধূর মুখরোচক বোধ হইলেও, বড় বধূর ভাল বোধ হইল না। শোভা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। নলিনবিহারী সে অভিনয়ের বিষয় অবগত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল; বলিল,—"এরূপ ব্যবহার শোভন নহে। মানুষমাত্রেরই বিশেষত্ব

আছে। বিশেষত্ব তোমারও আছে, আমারও আছে। তাহা লইয়া কেহ বিদ্রূপ করিলে কি আমাদের ভাল লাগে? তাঁহারা পূজ্য। আর ওরূপ করিও না।" চপলা ইহাতে আপনাকে অপমানিতা বিবেচনা করিল।

পিসীমা কালীঘাটে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কৃষ্ণনাথের পত্নী তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ব্যবহারে পিসীমা ও প্রভাতের জননী বিশেষ তুষ্ট হইলেন তিনি কয় দিন আসিবার পর তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে পিসীমা ও প্রভাতের জননী একদিন কমলকে লইয়া কৃষ্ণনাথের গৃহে গমন করিলেন।

সে দিন শোভা সযত্নে তাঁহাদের সেবা করিল। বড় বধূর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইলেন। কিন্তু মধ্যমা বধূর ও চপলার ব্যবহারে বিরক্তি ও বিদ্রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহা পিসীমা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু প্রভাতের জননী তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ইহাতে যেমন বিস্মিত, তেমনই বিরক্ত হইলেন। সহরের মেয়েরা কি কুটুম্বের সহিত এইরূপ ব্যবহার করে?

স্বামীর হৃদয়ের সন্দেহের ছায়া পত্নীকেও স্পর্শ করিয়াছিল; তাই প্রভাতের জননীরও যন্ত্রণা। সেই পুত্রেই তাঁহার সব আশা;—সেই পরিবারের সর্ব্বস্ব। তাহার সামান্য দুর্ব্যবহারে তাঁহার যাতনা। পুত্র জননীর সকল আশার কেন্দ্র। সেই জন্যই পুত্রের সামান্য দুর্ব্যবহারে জননীর হৃদয় ব্যথিত হয়। বিশেষ, সে বেদনা ফুটিবার নহে; তাহা তুষানলের মত অহরহঃ হৃদয় দগ্ধ করে।

প্রধান প্রধান চিকিৎসক ডাকাইয়া কমলকে দেখান হইল। কেহ কোনও রোগ স্থির করিতে পারিলেন না। শরীর যথেষ্ট সবল নহে,—এই পর্য্যন্ত। কয় দিন পরীক্ষার পর স্থির হইল, ফুসফুসও যথেষ্ট সবল নহে। এখনও কোনরূপ বিকৃতি সূচিত হয় নাই; সাবধানে থাকিলে দৌর্ব্বল্য দূর হইতে পারে। তবে সাবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষণে সহরের ধূলিধূমসমাচ্ছন্ন বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে; এবং পল্লীগ্রামের নির্ম্মল বায়ুতে উপকার হইবে। দুর্ভাবনার ঘনান্ধকার কাটিয়া আশার অরুণ-কিরণবিকাশসূচনা দেখা গেল। সকলেই সুখী হইলেন। গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

পিসীমা'র ও নবীনচন্দ্রের প্রস্তাবে শোভা কয় দিন তাঁহাদের নিকটে ছিল। তাহার জননী জিদ করিয়া তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই কয় দিনের আদর যত্নে তাহার হৃদয় কোমল হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহার ব্যবহারে কেহ নিন্দনায় কিছু লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এই সময় সকলের গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ হইল।

বধূর সাধ দিয়া সকলে ধূলগ্রামে ফিরিলেন। যাইবার সময় পিসীমা শোভাকে আদর করিয়া পুনঃপুনঃ বলিয়া যাইলেন, "মা, আশ্বিন মাসে বাড়ী যাইতে হইবে। ঘর আঁধার হইয়া আছে। তুমি না যাইলে কি হয়?", প্রভাতের জননীও বধূকে সেই কথা বলিলেন। কমল বলিল, "বৌদিদি, আশ্বিন মাসে যাইবে ত?" শোভা কোনও স্থির উত্তর দিতে পারিল না।

এ কয় দিন প্রভাত যে পিতার নিকটে ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার ব্যবহারে নবীনচন্দ্রের হৃদয়ের প্রান্তস্থিত আশঙ্কার অতি সামান্য অন্ধকার দূর হইয়া গেল। কিন্তু লোক-চরিত্রবিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিবচন্দ্রের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি জানিতেন, পুত্র স্বভাবতঃ মন্দ নহে; তাহার একমাত্র দুর্ব্বলতা,—সে চঞ্চলচিত্ত,—অব্যবস্থিতচিত্ত। সে যখন যে প্রভাবে পড়ে, তখন সেইরূপ হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সে জন্মাবধি যে প্রভাবে গঠিত ও বর্দ্ধিত, সে প্রভাব তাহার হৃদয়ে পুনরায় সংস্থাপিত করা,—তাহাকে পুনরায় সেই পরিচিত—পুরাতন প্রভাত করিয়া তুলা অসম্ভব নহে। সে জন্য কেবল তাহাকে অন্য সকল প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় সেই পুরাতন পথে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে গৃহের প্রভাব সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, তাহার হৃদয়ে সহজে কোনও প্রভাবের স্থায়িত্বের আশা করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। এ বারের এ প্রভাব অতি সামান্য;—তাঁহারা যাইতে না যাইতে সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির মত দূর হইয়া যাইবে।

সেই কথা বুঝিয়াই শিবচন্দ্র পুত্রকে নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি যদি সে কথা স্পষ্ট করিয়া নবীনচন্দ্রকে বলিতেন, তবে নবীনচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইতেন। তিনি যদি স্বয়ং দৃঢ়ভাবে চঞ্চলচিত্ত পুত্রকে বলিতেন, "তোমার আর এখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন। তুমি চল; দেশে থাকিতে হইবে।"—তাহা হইলে পুত্র অসম্মতি-

আপনে সাহসী হইত না। কিন্তু যে দুর্জ্জয় অভিমানে তিনি পুত্রকে লিখিয়াছিলেন,—"তুমি বড় হইয়াছ। তোমার হিতাহিত তুমি বুঝিতে পার। এখন আর তোমার কার্য্য বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার অনুমতি বা উপদেশ অনাবশ্যক।" এবারও পুত্র এক কথায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহাব সহিত যাইতে চাহে নাই বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে সেই অভিমান প্রবল হইয়া উঠিল। সেই জন্য তিনি আর জিদ করিয়া তাহাকে যাইতে বলিলেন না।

মাহেন্দ্রক্ষণ কাটিয়া গেল;—যে সুযোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে সুযোগ ব্যর্থ হইল।

শিবচন্দ্র দেশে ফিরিলেন।—হৃদয়ের ভার অপনীত হইল না।

প্রভাত কলিকাতায় রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

শ্রাবণের শেষে প্রভাতের একটি পুত্র হইল। ধূলগ্রামে দত্ত-গৃহে আনন্দের আর সীমা রহিল না। প্রায় বিশ বৎসর পরে গৃহে সন্তানের আবির্ভাব। সকলেরই হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শিবচন্দ্রও পৌত্রকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; এক মাস না যাইতেই স্বয়ং নবীনচন্দ্রকে বলিলেন, "নবীন, বধূমাতাকে কবে আনা যায়?"

প্রভাতের পুত্রকে দেখিবার জন্য নবীনচন্দ্রের ব্যাকুলতা জ্যেষ্ঠের ব্যাকুলতাকে পরাভূত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন. "ভাল দিন দেখুন দেখি।"

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আজই ব্যস্ত হইয়া দিন দেখিয়া কি হইবে? আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে ত আসা হইবে না।"

"তার আর কয় দিন আছে? এখনই লিখিয়া দেওয়া যাউক।"

শিবচন্দ্র সেই প্রস্তাব করিয়া কৃষ্ণনাথকে পত্র লিখিলেন। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে সে কথা লিখিলেন।

এই পত্রের কথায় কৃষ্ণনাথের পত্নী কিছু বিপন্না হইলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। শ্বশুরালয়ে তাঁহার আদর যত্ন দেখিয়া তিনি উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথ যখন আগ্রহ করিয়া জামাতাকে

তাঁহার গৃহে থাকিতে বলেন, গৃহিণী তখন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, কন্যা কখনও নিকটে থাকে না; এখন হইতে তাহাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এবার কন্যা 'ঘর করিতে' যাইবে; শ্বশুরালয়ে বাস করিতে যাইবে,—তাই মাতৃহৃদয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে নিষ্প্রভ করিতে লাগিল। বিশেষ প্রসবের অল্পদিন পরে কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবে,—এখনও তাহার শরীর দুর্ব্বল। তিনি ভুলিয়া যাইলেন, সে কেবল তাঁহারই কন্যা নহে,—পরন্তু সেই দূর পল্লীভবনেও দুই জন রমণী তাঁহার সেই কন্যার জন্য হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহ লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—তাঁহারা তাহাকেই গৃহের সৌন্দর্য্য, নয়নের আনন্দ ও হৃদয়ের তৃপ্তি করিতে প্রয়াসী; ভুলিলেন, শিবচন্দ্র শিশু পৌত্রের দর্শন জন্য ব্যগ্র; বুঝিলেন না, স্নেহশীল নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে আর বিলম্ব সহিতেছে না।

গৃহিণীর এই ভাবই কৃষ্ণনাথের পক্ষে যথেষ্ট হইল। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না পাঠাইবার সম্বন্ধে তিনি কখনও গৃহিণীর সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহার এই অস্থিরতাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া শিবচন্দ্রকে লিখিলেন, প্রসূতিকে এত অল্প দিনে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ শরৎকালে পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর নহে। এই দুই কারণে চিকিৎসকগণ এখন শোভাকে পাঠাইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি প্রভাতকেও তাহাই বুঝাইলেন। শোভার ও শিশুর শরীর অসুস্থ হইবার আশঙ্কায় প্রভাতও মনে করিল, এখন না

যাইলেই বা ক্ষতি কি? না হয় কিছুদিন পরেই যাইবে। শিবচন্দ্রের বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য। অব্যবস্থিতচিত্ত পুত্র যখন যে প্রভাবে পড়ে, তখন সেই প্রভাবেই প্রভাবিত হয়। সেও নবীনচন্দ্রকে লিখিল, চিকিৎসকগণ এখন শোভাকে পল্লীগ্রামে পাঠাইতে মত দিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকাই শ্রেয়ঃ।

কৃষ্ণনাথের পত্র পাইয়া শিবচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এ পত্রে কৃষ্ণনাথের পূর্ব্বের সব পত্রের বিনয়েরও অভাব ছিল। শিবচন্দ্র ভ্রাতাকে সে পত্র দেখাইলে নবীনচন্দ্র আর তাঁহাকে প্রভাতের পত্রের কথা বলিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "আমি কলিকাতায় যাই।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "না। তোমার যাইয়া কায নাই। যথেষ্ট অপমান হইয়াছে। আর কেন? বহুবার বধূকে আনিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলাম; তাঁহারা পল্লীগ্রামে মেয়ে পাঠাইবেন না।"

"প্রভাতকে লিখিব?"

"সেও আমাদের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়াছে। নহিলে বৈবাহিকের এ সাহস হইত না।"

শিবচন্দ্রের কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি যে কথা বলিলেন—সে কথা মনে করিতে হৃদয় যেন ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন। সে আননে অতি

দারুণ দুঃখের ছায়া। তিনি বলিলেন, "আপনি বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন। সে তেমনই আছে।"

শিবচন্দ্র আর কোনও কথা বলিলেন না : দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নবীনচন্দ্র সেই দিনই কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন। শিবচন্দ্র সে কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, "যাইয়া কায নাই।"

নবীনচন্দ্র আশা করিতেছিলেন, তিনি যাইলে আর কোনও গোল হইবে না। ভ্রাতার সেই কষ্টার্ত্ত কণ্ঠস্বর তখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল ; সেই বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি তিনি তখনও দেখিতেছিলেন। তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই তিনি সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিলেন ; জীবনে এই প্রথম জ্যেষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেন।

নবীনচন্দ্র কলিকাতায় যাইয়া ছাত্রাবাসে উঠিলেন। প্রভাত সেথায় নাই। ছেলেরা বলিল, সে শ্বশুরালয়ে থাকে। শুনিয়া নবীনচন্দ্র বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু এমন ভাব দেখাইলেন যে, ছেলেরা মনে করিল,—তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয় অবগত ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া প্রভাত সংবাদ পাইল, ছাত্রাবাস হইতে তাহাকে দুইবার ডাকিতে আসিয়াছিল। সে ব্যস্ত হইয়া ছাত্রাবাসে আসিল ; দেখিল, নবীনচন্দ্র আসিয়াছেন। সে ঘর খুলিল। ঘর বহুদিন বন্ধ ছিল। দ্রব্যাদিতে ধূলি

জমিয়াছে। ছাত্রাবাসের ছেলেদের সহায়তায় কোনরূপে ঘর পরিষ্কৃত হইল। তাহারা প্রায় সকলেই ধূল গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসী; নবীনচন্দ্রকে জানিত, এবং তাঁহার স্বভাবগুণে তাঁহাকে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। বিশেষ পল্লীগ্রামে অন্য সম্বন্ধ না থাকিলেও পরিবারে পরিবারে গ্রাম্য সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই,--তাহা মনুষ্য-সমাজের প্রশস্ত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র ছেলেদের কাহারও কাকা, কাহারও জেঠা মহাশয়, কাহারও মামা ইত্যাদি। যাহাদের সহিত সেরূপ কোনও সম্বন্ধ ছিল না, তাহারও অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। সংসার-সংঘাতে মানুষ স্বার্থপর হইবার পূর্ব্বে,-- তাহার হৃদয়ের উদারতা সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, মানুষের আদর্শ অতি সমুন্নত থাকে; ক্রমে তাহার অবনতি ঘটে। তাই যুবকদিগের মধ্যে সহজে বন্ধুত্ব জন্মে; তাহারা সহজে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে; মহৎ অনুষ্ঠানে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ; তাহা-দিগকে ছাড়িয়া কোনও মহৎ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আবার নবীনচন্দ্রের মত স্নেহশীল ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সহজে, যেন আপনা হইতেই হইয়া যায়। কাযেই ছেলেরা তাঁহাকে পাইয়া যেন স্বজনসমাগমের আনন্দলাভ করিল।

সে যে শ্বশুরালয়ে স্থায়ী হইয়াছে, নবীনচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়াছেন,—এই লজ্জায় প্রভাত তাঁহার নিকট মুখ তুলিতে পারিতেছিল না; এবং এখন কি করিবে, এই চিন্তায় বিব্রত

হইতেছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্রের ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সে অপ্রতিভভাব কতকটা দূর হইল। পাছে ছাত্রাবাসের ছেলেরা জানিতে পারে,—তিনি প্রভাতের শ্বশুরালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার বিষয় অবগত ছিলেন না,—এই আশঙ্কায় নবীনচন্দ্র সে ভাবের আভাষমাত্র ব্যবহারে প্রকাশ হইতে দিলেন না।

সন্ধ্যার পরই নবীনচন্দ্র প্রভাতকে বলিলেন, "তুই যা, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। আমার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

প্রভাত সে কথায় কাণ দিল না।

প্রভাতের গমনে বিলম্ব ঘটিল; কৃষ্ণনাথের গৃহ হইতে ভৃত্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে পুনরায় বলিলেন, "তুই যা।" সে গেল না। ভৃত্য জানিয়া গেল, "জামাই বাবু"র কাকা আসিয়াছেন।

ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিলে কৃষ্ণনাথ স্বয়ং ছাত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীনচন্দ্র তখন আহারে বসিয়াছেন।

বৈবাহিককে দেখিয়া নবীনচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বড় অসময়ে আসিয়াছেন। আপনিও প্রিয়, পাতেও প্রিয়। আমি এখন কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখি?"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "সে জন্য ভাবিবেন না। আমি এখানেই বসিতেছি। আপনার 'দু' কূল বজায় রবে।' সব ভাল ত?"

"আপনাদের আশীর্ব্বাদে সব মঙ্গল।"

কৃষ্ণনাথ হর্ম্ম্যতলেই বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এক

জন যুবক একখানি চেয়ার আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্রের অনু-রোধে কৃষ্ণনাথ তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহসা কি মনে করিয়া ?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "একবার দেখিতে শুনিতে আসিলাম। মা'কেও অনেক দিন দেখি নাই। বিশেষ ভাইটির সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে।"

নবীনচন্দ্রের আহার শেষ হইলে কৃষ্ণনাথ বৈবাহিককে বলিলেন, "চলুন, আমার ওখানে পদধূলি দিতে হইবে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "পূর্ব্বেই যাইতাম। কিন্তু প্রভাতের আসিতে বিলম্ব হইল, সন্ধ্যা হইয়া গেল,—সেই জন্য আজ আর যাই নাই। আগামী কল্য প্রভাতেই যাইয়া ভাইকে দেখিয়া আসিব।"

"এখানে অসুবিধা হইবে।"

নবীনচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আমার কোনও অসুবিধা নাই। বরং সুবিধার জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি এই সব সোনার চাঁদ ছেলে,—ইহারা কেহ আমার পর নহে। দেখুন না,—সবগুলি সব কায ছাড়িয়া আমার কাছে রহিয়াছে। উহারা আমাকে ছাড়িবে না।"

ছেলেরাও বলিল, তাহারা নবীনচন্দ্রের কোনও অসুবিধা হইতে দিবে না।

অগত্যা কৃষ্ণনাথ বিদায় হইলেন।

নবীনচন্দ্র প্রভাতকে পুনরায় বলিলেন, "তুই যা। সকালে

আবার দেখা হইবে।” তথাপি প্রভাত রহিল দেখিয়া তিনি কৃষ্ণনাথকে বলিলেন, “প্রভাতকে লইয়া যাউন। আমার কোনও অসুবিধা হইবে না।”

শেষে প্রভাত শ্বশুরের সঙ্গে গেল।

সে রাত্রিতে নবীনচন্দ্রের ভাল নিদ্রা হইল না। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ছায়া গাঢ়তর।

পর দিন প্রভাতেই প্রভাত আসিল। নবীনচন্দ্র তাহার সহিত যাইয়া যথারীতি ভ্রাতুষ্পৌত্রকে দেখিলেন। শিশু তাঁহার ক্রোড়ে ক্রন্দন করিল না। কৃষ্ণনাথ রহস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার লোক চিনিয়াছে। আমি লইতে যাইলেই কাঁদে "

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আমি ভাই। আমার কাছে কাঁদিলে চলিবে কেন?"

শোভা আসিয়া প্রণাম করিল। নবীনচন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "মা, রোগা হইয়াছ। পরের বাড়ী বুঝি যত্ন হয় না? অনেক দিন পরের বাড়ী আছ। চল, ভাইকে লইয়া দেশে যাই; ঘর আলো হইবে।"

শোভা লজ্জায় মুখ নত করিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র আবার বলিলেন, "বাড়ীতে সকলেই ভাইটিকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। আমি কয় দিন থাকিয়া ভাইকে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি।" অঙ্কস্থিত শিশুকে বলিলেন, "কি বল, ভাই? চল, বাড়ী যাইতে হইবে "

কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "অবশ্যই যাইবে। কিন্তু এখন পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "গ্রামের স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল। কোনও পীড়া নাই।"

"কিন্তু ডাক্তাররা যাইতে নিষেধ করিতেছেন।"

"ডাক্তারদের সব কথা শুনিবেন না সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিতে তাঁহাদের মত আর কেহ নাই। কেবল বৃথা আশঙ্কা।"

কৃষ্ণনাথ যেন কিছু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এখন যাওয়া হয় না।"

শোভা কৃষ্ণনাথের একমাত্র কন্যা। কৃষ্ণনাথের স্নেহ স্বভাবতঃই অধিক। সেই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয় "মানুষ" হয় নাই। কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহ যেন অতিরিক্ত ও অপরিমিত। তাই তিনি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন;—কন্যাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে চাহিতেন না. তিনি জামাতাকে তাহার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন;—এবং জামাতার ব্যবহারে সে বিষয়ে সফলযত্ন হইবার আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছিলেন। তাই কৃষ্ণনাথ সাহস করিয়া এমন কথা বলিতে পারিলেন।

নবীনচন্দ্র বিস্মিত হইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

কৃষ্ণনাথের পত্নী যখন শুনিলেন যে, নবীনচন্দ্র শোভাকে লইতে আসিয়াছেন. তখন তিনি বলিলেন,—মেয়েকে পাঠাইতে হইবে। কৃষ্ণনাথ তাহাতে আপত্তি জানাইলে তিনি বলিলেন, "না। যখন বৈবাহিক স্বয়ং আসিয়াছেন—তখন পাঠান অবশ্যকর্ত্তব্য। নহিলে তাঁহার অপমান করা হইবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ী সব রাগ করিলে তখন মেয়ের কি হইবে?"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "সে ভার আমার। আমি বৈবাহিককে বুঝাইব।"

"তুমি যতই বুঝাও, এ কায ভাল হইবে না। তাহাদের বধূ,— তাহারা লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে; এ সময় না পাঠাইলে পরে ভুগিতে হইবে।"

কৃষ্ণনাথ গৃহিণীর পরামর্শ শুনিলেন না।

এ দিকে নবীনচন্দ্র প্রভাতকে বলিলেন, "প্রভাত, আমি মা'কে লইতে আসিয়াছি। দেশে দাদা, দিদি, বড় বধূ, কমল, সকলেই খোকাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।"

প্রভাত বলিল, "চিকিৎসকগণ এ সময় পল্লীগ্রামে যাইতে নিষেধ করিতেছেন।"

নবীনচন্দ্র বুঝিলেন, কৃষ্ণনাথের কথার প্রতিধ্বনি। তিনি বলিলেন, "তুই ত জানিস, গ্রামের স্বাস্থ্য এ সময় ভাল। যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, আমি রাখিয়া যাইব। এখন না যাইলে দাদা দুঃখিত হইবেন।"

প্রভাত কিছু বলিল না।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তুইও বাড়ী চল্। মা'কে লইয়া চল্।"

প্রভাত ধীরে ধীরে বলিল,—"এখন—না যাইলে—হয়—না?"

নবীনচন্দ্র যেন বিশেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।" তাহার পর বলিলেন, "আফিসের বেলা হইল, তুই যা।"

প্রভাত চলিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র হৃদয়ে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আসিলে সব গোল মিটিবে; তিনি বধূকে লইয়া যাইবেন; ভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রের

মনোমালিন্য দূর হইবে। সে আশা পূরিল না। তিনি স্নেহবশে যে বিশ্বাসে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ব্যর্থ বিশ্বাসের বিষম বেদনা তাঁহাকে ব্যথিত করিল;—হৃদয় কাতর হইয়া পড়িল। স্নেহে বিষম আঘাত লাগিল। তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে প্রভাত ও কৃষ্ণনাথ আসিয়া দেখিলেন, নবীনচন্দ্রের মুখে বিষাদকালিমা। অল্প সময়ে তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রভাত বিস্মিত হইল। কৃষ্ণনাথের ও প্রভাতের কক্ষে প্রবেশের বিষয় নবীনচন্দ্র জানিতেও পারিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন, গৃহের চারি দিকে যদি অনল জ্বলিয়া উঠে, তবে কেমন করিয়া নিবাইব?

কৃষ্ণনাথের কণ্ঠস্বরে নবীনচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুস্থ হইয়াছেন না কি?"

নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, "না।"

কৃষ্ণনাথ মধ্যাহ্নে নবীনচন্দ্রকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সে নিমন্ত্রণ কাটাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং থাকিতে পারিবেন না বলিয়া কৃষ্ণনাথও বিশেষ জিদ করেন নাই। শেষে কৃষ্ণনাথ রাত্রিতে আহারের জন্য জিদ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনাথ তাঁহার কথা আমলেই আনেন নাই। তিনি এখন বলিলেন, "চলুন।" নবীনচন্দ্র যত বলেন, কৃষ্ণনাথ কিছুতেই শুনেন না। শেষে নবীনচন্দ্র

করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "ক্ষমা করুন। আজ আহার করিতে পারিব না।"

কৃষ্ণনাথ তাহার পর নানা কথা বলিতে লাগিলেন। নবীনচন্দ্রের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। ক্রমে কৃষ্ণনাথ শোভাকে লইয়া যাইবার কথা তুলিলেন; বলিলেন, "শোভা এখন এখানে থাকুক। ইহার পর লইয়া যাইবেন।"

নবীনচন্দ্র কি ভাবিতেছিলেন, তিনি বড় অন্যমনস্ক;—সে কথার উত্তর দিলেন না।

কৃষ্ণনাথ বিদায় লইয়া দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। প্রভাত তখনও বসিয়া রহিল। নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আমি আজই বাড়ী যাইব।"

কৃষ্ণনাথ ফিরিলেন; অনেক বলিলেন,—তাহা কিছুতেই হইবে না,—নবীনচন্দ্রের বৈবাহিকা বড় রাগ করিবেন,—অন্ততঃ এক দিন থাকিয়া যাইতেই হইবে—ইত্যাদি।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "একটু কাযে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। কায শেষ হইয়াছে,—আর বিলম্ব করিব না।"

কৃষ্ণনাথ তাহাতে অনেক আপত্তি করিলেন; তাহার পর বিদায় লইলেন। প্রভাত তখনও বসিয়া রহিল। পিতৃব্যের এমন ভাব সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সে-ও কি ভাবিতেছিল।

প্রভাত বসিয়া রহিল। নবীনচন্দ্র মনে করিলেন, প্রভাতকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন; একবার—আর একবার চেষ্টা

করিবেন। কিন্তু পারিলেন না। বেদনায়—যাতনায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; মুখে কথা ফুটিল না।

প্রভাতও কয়বার কি জিজ্ঞাসা করিবার,—কি বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইল। তুমি আর বিলম্ব করিও না।"

নবীনচন্দ্র কখনও তাহাকে "তুই" ভিন্ন "তুমি" বলিতেন না। সে স্নেহসম্ভাষণে বঞ্চিত হইয়া প্রভাত যে ব্যথা অনুভব করিল না—এমন নহে। সে কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু উঠিল না,—বসিয়া রহিল।

ক্রমে নবীনচন্দ্রের যাইবার সময় হইল। যান গৃহদ্বারে আসিল। নবীনচন্দ্র প্রভাতকে বলিলেন, "বাবা, তবে আমি যাই।" কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

প্রভাত বলিল, "আমি ষ্টেশনে যাইব।"

"আমার সহিত দ্রব্যাদি বিশেষ কিছু নাই। কষ্ট করিয়া যাওয়া অনাবশ্যক।"

নবীনচন্দ্র যখনই কলিকাতায় আসিতেন, যাইবার সময় প্রভাত তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিত;—প্রতিবারই বিদায়কালে তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। সে কথা আজ প্রভাতের মনে পড়িল। সে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কিন্তু গাড়ীতে উভয়ে কোনও কথা হইল না। উভয়েই চিন্তামগ্ন।

ষ্টেশনে আসিয়া প্রভাত বলিল, "আমি টিকিট কিনিয়া আনি।"

নবীনচন্দ্র টাকা দিলেন। প্রভাত টিকিট আনিল। তাহার পর নবীনচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। প্রভাত গাড়ীর পিত্তল-হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। প্রভাত পিতৃব্যকে প্রণাম করিল। নবীনচন্দ্র কোনও কথা কহিতে পারিলেন না,—আপনার উভয় করতল প্রভাতের মস্তকে সংস্থাপিত করিলেন; মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—চিরসুখী হও।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নবীনচন্দ্র ভাবিলেন, যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা বলিলে ভাল হইত। প্রভাত মনে করিল, যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল, তাহা বলিলেই ভাল করিত। দারুণ যাতনায় নবীনচন্দ্রের বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল। প্রভাত হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিল। যে সুযোগ আবার আপনি আসিয়াছিল, সে সুযোগও বহিয়া গেল। ব্যবধান কমিল না—বরং বাড়িল।

ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত ফিরিল।

ট্রেণে বসিয়া দুশ্চিন্তাকাতর নবীনচন্দ্রের কেবল আর এক দিনের কথা মনে হইতে লাগিল। সে দিন শোভার সহিত বিবাহে প্রভাতের ইচ্ছা জানিয়া তিনি সে বিবাহে ভ্রাতার মত করাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে এই পথে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। সে যেন সে দিন! নবীনচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নবীনচন্দ্র গৃহের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, দাদা শুনিয়া কি মনে করিবেন—কত কষ্ট পাইবেন! তখন মনে পড়িল, তিনি লোকচরিত্রাভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠের

অমতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তিনি নিজে বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন; —সব ব্যর্থ হইয়াছে! যে বিশ্বাসে তিনি দুঃখেও সুখ পাইতেন -সে বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্র গৃহে উপনীত হইলেন। ভ্রাতার মুখ দেখিয়া শিবচন্দ্র শঙ্কিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, সব ভাল ত?"

নবীনচন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—ভাল।

শিবচন্দ্র বুঝিলেন, তাঁহার আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে—নবীনচন্দ্র বিফলযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ভ্রাতাকে আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সে কথা উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর।

নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি স্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানের পর উভয় ভ্রাতা একত্র আহারের জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পিসীমা ও বড় বধূ ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, প্রভাত, বৌমা, খোকা—সব ভাল আছে ত?"

নবীনচন্দ্র মুখ তুলিতে পারিলেন না। নতদৃষ্টি রহিয়াই বলিলেন,—"হাঁ।"

"বৌমা কবে আসিবে?"

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখন কেহ আসিবে না।—" যেন সব অপরাধ তাঁহার।

শিবচন্দ্রের হৃদয়ে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইল।

প্রিয়তম ভ্রাতার অপমান শিবচন্দ্রের হৃদয়ে শেলসম বাজিল। দত্তগৃহে বিষাদের গাঢ়তর ছায়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গৃহান্তরে।

নবীনচন্দ্র যাইবার কয় দিন পরে প্রভাত পিতার পূর্ব্বনির্দ্দেশমত কৃষ্ণনাথের নিকট স্বতন্ত্র বাসা করিবার প্রস্তাব করিল। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "এখানে তোমার কি অসুবিধা হইতেছে?"

অসুবিধার কথা কিছু বলিতে না পারিয়া প্রভাত বলিল, "বাবার ইচ্ছা আমি স্বতন্ত্র বাসা করি।"

কৃষ্ণনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তাহা কিছু বলেন নাই। তবে তাঁহারা কেহ আসিলেও অসুবিধা হয়। আর—শ্বশুরালয়ে—"

"তাঁহারা সর্ব্বদা আসেন না। আসিলেও দুই এক দিনের অধিক থাকেন না। সে অবস্থায় বৃথা ব্যয় করিয়া বাসা করিবার প্রয়োজন কি? শ্বশুরালয়ে বাস! —কেন, তুমি ত আর ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছ না। ও সব পল্লীগ্রামের কথা।—ইহাতে দোষ কি?"

প্রভাত আর কোনও কথা কহিল না।

কৃষ্ণনাথ পুনরায় বলিলেন, "ছাত্রাবাসে একটা ঘর রাখিয়া বৃথা ব্যয় বাড়ান অনাবশ্যক। ওটা ছাড়িয়া দাও।"

শেষে তাহাই হইল। প্রভাত স্বতন্ত্র বাসা করা দূরে থাকুক —ছাত্রাবাসের ঘরটিও ছাড়িয়া দিল; তবে তখনও সে মনে করিল, আর কিছু দিন পরে—একটা সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় বাসা করিবার

প্রস্তাব করিবে; এবং মনকে বুঝাইল, সে সুযোগ নিশ্চয়ই আসিবে। মনের মত কাপুরুষ আর নাই। সে অতি সহজেই ইচ্ছার মতে মত দেয়—অসম্ভবকেও সম্ভব বুঝে।

কিন্তু সুযোগ ঘটা দূরে থাকুক, বরং সে প্রস্তাব করিবার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইল। শীত শেষ হইতে না হইতে নলিনবিহারীর শিরঃপীড়া বাড়িয়া উঠিল।

জামাতা শ্বশুরগৃহে বাস করেন, কৃষ্ণনাথের পত্নীর সে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণনাথ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখেন নাই, তাই তিনি প্রভাতকে তাহার পরিবার হইতে দূরে ও আপনার নিকট আনিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। গৃহিণী বুঝিয়াছিলেন, স্নেহের বন্ধন একবার বিচ্ছিন্ন হইলে আর সহজে যুক্ত হয় না; স্নেহের সম্বন্ধে আঘাত লাগিলেও তাহা আর সহজে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তাই তিনি কন্যাকে তাহার শ্বশুরের সংসার হইতে দূরে রাখিবার সঙ্কল্প না, করিয়া বরং তাহাকে সেই সংসার-ভুক্তা দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান হয় ত পুত্রদিগের অভিপ্রেত হইবে না, বধূরা তাহাতে অসন্তুষ্টা হইবে; তাহাতে কন্যাজামাতার আদর থাকিবে না। এই সকল কারণে তিনি প্রভাতের পিতৃগৃহের সহিত সম্বন্ধ শিথিল করা ভাল বিবেচনা করিলেন না। যদি একবার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে বিপদ ঘটিবে। শোভাকে এক দিন শ্বশুরের ঘরে যাইতেই হইবে,—এখন সে অভ্যাস করা ভাল। বিশেষ তিনি শ্বশুরালয়ে শোভার যে আদর দেখিয়া আনন্দোৎফুল্লা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশা ছিল, সে

সহজেই সে গৃহের গৃহলক্ষ্মীর আসন অধিকার করিতে পারিবে। তাই নবীনচন্দ্র শোভাকে লইতে আসিলে তিনি কৃষ্ণনাথকে মেয়ে পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। তাই প্রভাতকে শ্বশুরালয়বাসী হইতে দেখিয়া তিনি শঙ্কিতা হইয়াছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণনাথ যখন তাঁহার কথা শুনিলেন না, প্রভাতও যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিল না,—তখন অনন্যোপায় হইয়া গৃহিণী সর্ব্ব-প্রযত্নে কন্যাজামাতাকে আগুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা,—পাছে পুত্রদিগের বা বধূগণের ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ পায়; পাছে স্বার্থহানিশঙ্কিতদিগের কোন কথায় উপেক্ষার আভাষ থাকে; পাছে কন্যাজামাতার এমন মনে করিবার অবকাশ ঘটে যে, তাহাদের সে গৃহে অবস্থান সকলের অভিপ্রেত নহে।

গৃহিণীর মনেও সুখ ছিল না।

কিন্তু প্রভাতও কৃষ্ণনাথের মত ভবিষ্যতের বিষয় বিবেচনা করিল না। যে পরিবারের সেই সর্ব্বস্ব, সেই পরিবারের সহিত তাহার সম্বন্ধ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। সে কি ভাবিয়া কি করিল? সে আপনার কর্ম্মে আপনই বদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল।

কন্যার পক্ষে পিত্রালয়ে বাস সুখের। বিশেষ, যাহার ঘরকে আপনার ঘর করিয়া লইতে হয়, যাহার প্রেমে রমণী নূতন জীবন লাভ করে, নূতনে অভ্যস্তা হইয়া শেষে পরিচিত পুরাতনকেই নূতন বলিয়া মনে করে, সেই স্বামীও নিকটে। তবুও শোভার কেমন ভাল বোধ হইতেছিল না। সকলে যাহা পায়, তাহা না

পাইয়া সে আপনাকে অধিকারে বঞ্চিতা মনে করিতেছিল। চপলার ভ্রাতা ভগিনী নাই, পিত্রালয়ে সবই তাহার, তথাপি সে শ্বশুরালয়ে আইসে। সকলের যাহা হয়, তাহার কেন তাহা হইল না? এক এক বার তাহার এমনও মনে হইত, সেই পল্লীভবন, সেই পল্লীজীবন, তাহাতেও ত নূতনত্বের আকর্ষণ ছিল! সময় সময় সে ভাবিত, যখন সে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, তখনও সে বালিকা; কিছু ভাল বুঝিতে পারিত না। এখন একবার যাইয়া দেখিলেও হয় সে পল্লীজীবন সুখের, কি দুঃখের। সেই পল্লীভবনে তাহার অসীম যত্নের কথা,' পিসীমা'র ও নবীনচন্দ্রের অপরিম্লান আদরের স্মৃতি তাহার মনে পড়িত। প্রভাত শ্বশুরের উপদেশে চাকরী করিতেছিল, তাহাও শোভার অভিপ্রেত ছিল না। শ্যামা-প্রসন্ন প্রভাতের সে কার্য্যের সমর্থন করেন নাই,—সে কথা শোভা শুনিয়াছিল। সে কথা সে সহজে ভুলিতে পারিতেছিল না; শ্যামাপ্রসন্নের সে কথা যখন তখন তাহার মনে পড়িত। চপলা সে কথা শুনিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিল। সে কথাও শোভা ভুলে নাই। তাহার পর প্রভাতের শ্বশুরালয়ে অবস্থান। প্রভাত শ্বশুরের নিকট স্বতন্ত্র বাসা করিবার প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে শোভাকে সে কথা বলিয়াছিল। শোভা সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিল। সে একা এক গৃহের গৃহিণী! দায়িত্বের অভিজ্ঞতা জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার গৌরব হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। বালক প্রবীণপদবাচ্য হইতে কত আকাঙ্ক্ষা করে; বালিকা গৃহিণী সাজিতে ভালবাসে। গৃহিণীর সহস্র জ্বালা শোভা জানিত না; তাই তাহার গৌরবে

আকৃষ্টা হইয়াছিল; সাগ্রহে প্রভাতের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল। পিতা সে প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে সে পিতার উপর রাগ করিয়াছিল। প্রভাতের শ্বশুরালয়ে অবস্থান তাহার ভাল বোধ হইত না।

* * * *

যে বীজ ঊষর ভূমিতে উপ্ত হয়, তাহা সামান্য প্রতিকূল অবস্থায় বিনষ্ট হয়,—অঙ্কুরিত হয় না। চপলার প্রেমের তাহাই হইয়াছিল। সে শৈশব হইতে যখন যাহা চাহিয়াছে, সকলে তাহাকে তাহাই দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। সে ধনবান পিতার একমাত্র সন্তান,—জনকজননীর বড় আদরের। তাহার পর পিতার মৃত্যু হইতে সে-ই জননীর সর্ব্বস্ব। শ্বশুরালয়েও সে শাশুড়ীর ব্যবহারে পদে পদে অপর বধূদিগের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিত। তাহার ধনগর্ব্ব তাহার রূপগর্ব্বকে স্ফীত করিয়াছিল। সে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব-গর্ব্বে এমনই ভ্রান্ত হইয়াছিল যে, ভ্রান্তিবশে স্বামীর ব্যবহারেও আপনার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়প্রাপ্তির আশা করিত। কিন্তু নলিন-বিহারীর প্রেমে স্বার্থসন্ধান ছিল না,—সে প্রেম ও স্বার্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভালবাসে নাই। তাই সে পত্নীর ব্যবহারে নিন্দনীয় কিছু দেখিলে তাহার সংশোধনে চেষ্টা করিত। চপলার তাহা ভাল লাগিত না। বিশেষ নলিনবিহারীর প্রেমে যে গাম্ভীর্য্য ছিল, চঞ্চলা চপলা তাহার গরিমা বুঝিতে পারিত না। সে চাঞ্চল্য-সহচর হৃদয়ে বিশালতার উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাহাতে তাহার চটুলতায় অভ্যস্ত হৃদয় ছাপাইয়া যাইত। তাই সে নলিন-

বিহারীর প্রেমে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। সে প্রেমের বাহ্যিকবিকাশ ব্যতীত সন্তুষ্ট হইত না। তাহার সকল দুঃখ—সকল অসন্তোষ তাহার মনের দোষে উৎপন্ন হইত।

শীত শেষ হইতে না হইতে নলিনবিহারীর শিরঃপীড়া পুনরায় বাড়িয়া উঠিল। সেই সময় শিশিরকুমার বদলি হইল। নূতন কর্ম্মস্থানে যাইবার পথে শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিল;—দুই দিন মাত্র থাকিবে।

শিশিরকুমার আসিয়া নলিনবিহারীর পীড়ার কথা শুনিয়াই তাহাকে দেখিতে আসিল। শিশিরকুমার যে স্থানে বদলি হইয়াছিল, সে স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর। শিশিরকুমার পুনঃপুনঃ নলিনবিহারীকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিল; বলিল, "এখানে শরীর সারিতেছে না; চলুন, বেড়াইয়া আসিবেন। দেখিবেন, সহরের বাহিরে যাইলেই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেন। সহরের বাতাস শিরঃ-পীড়ার পক্ষে অপকারী। আমি মফঃস্বলে থাকি,—এখন সহরে আসিলেই কেমন দুর্গন্ধ বোধ হয়; বাতাস যেন আর লঘু বোধ হয় না।"

শুনিয়া নলিনবিহারী একটু হাসিল।

শিশিরকুমার পুনরায় বলিল, "সেখানে কোনও গোলমাল নাই। শরীর সহজেই সুস্থ হইবে। আমি যাইয়া পত্র লিখিব। আপনাকে যাইতেই হইবে।"

শিশিরকুমার কৃষ্ণনাথের নিকটেও এই প্রস্তাব করিল। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "আমি ত পুনঃপুনঃ বলিতেছি, কোথাও যাইয়া

দিন কতক থাকিয়া আইস। সেবার দার্জ্জিলিং যাইয়া কিছু সুস্থ হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কোথাও যাইতে চাহে না ; যাইলেও থাকিতে পারে না। আরও দোষ, পড়াও ছাড়িবে না· সকলেই বলিলাম, 'পরীক্ষা দিও না।' কিছুতেই শুনিল না। তাহার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখনও ঝোঁক—পরীক্ষা দিবে।"

"আর শ্রম করিতে দিবেন না।"

"আমি ত বলি, পরীক্ষা দিয়া কি হইবে ? কিছুতেই সে কথা শুনে না। পড়া বন্ধ করে না।"

"আমি যাইয়া পত্র লিখিব। আপনি উঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

"সে ত ভাল কথা।"

শিশিরকুমার গৃহে ফিরিল।

চপলার জননী সেবারও শিশিরকুমারকে বিবাহের জন্য বিশেষ জিদ করিতে লাগিলেন ; বলিলেন, "আমি একা আর এ শূন্য পুরীতে বাস করিতে পারি না। তুমি বিবাহ কর। কখনও চপলা, কখনও বধূ আমার কাছে থাকিবে। এখানে যে আমার মুখে জল দিবার কেহ নাই!"

শুনিয়া শিশিরকুমারের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে বলিল, "মা, চপলার ছেলে মেয়ে হউক, তাহারা আপনার কাছে থাকিবে। যদি কখনও কোনও আবশ্যক হয়, আমাকে আদেশ করিলেই আমি আসিব।"

মা তথাপি জিদ করিতে লাগিলেন শেষে শিশিরকুমার

বলিল, "মা, আর যে আদেশ হয়, করুন; আমাকে ও আদেশ করিবেন না।"

পরদিন চপলা পিত্রালয়ে গেল। সে দিন তাহার মাসীমা ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই কেমন আছে?"

চপলার জননী বলিলেন, "কিছুতেই ত সারিতেছে না। শিশির বদলি হইয়াছে। গত কল্য এখানে আসিয়াই ছুটিয়া দেখিতে গিয়াছিল।"

"সে কি বলিল?"

"দেখিয়া আসিয়া অবধি মুখ আঁধার করিয়া আছে; বলিতেছে, 'মা, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থান খুব ভাল। নলিনকে লইয়া যাইতেই হইবে। আপনাকেও যাইতে হইবে।' সে ছেলে সহজে বিচলিত হয় না। তাই তাহার এ ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে।"

"শিশির বিবাহ করিল না?"

"না, দিদি। সে কথা বলিলে বলে, 'মা, ও আদেশ করিবেন না।' "

"শিশির জামাইকে যাইবার কথা বলিয়াছে?"

"সে ত বলিয়াছে। তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। এখন যাওয়া হইলে বাঁচি।"

"তাই ত। শিশির কবে যাইবে?"

"সে আজই যাইবে। বলিতেছে, বাসা ঠিক করিয়াই পত্র লিখিবে। যদি আবশ্যক হয়, নিজেই আসিবে। সে কি স্থির হইয়া আছে? দেখিয়া আসিয়া অবধি কেবল ঐ কথা বলিতেছে। তাই ত আমার আরও ভয় হইয়াছে।"

"তুমি একবার যাও। বেহাইনকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।"

"যাইব। আমি ত আর, দিদি, ভাবিয়া উঠিতে পারি না। আমারই কপাল পোড়া; নহিলে এমন হইবে কেন?"

"আহা, তখন যদি শিশিরের সঙ্গে চপলার বিবাহ দিতে। সোনার চাঁদ ছেলে; অমন ছেলে হাজারে একটি মেলা ভার। জামাইবাবুর বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তখন তুমিই অমত করিলে। শিশিরও আর বিবাহ—"

এই সময় চপলা কক্ষে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশঙ্কা।

"কমল. তুমি নিশ্চয়ই কোন রূপ অত্যাচার করিয়াছ।"

শ্রাবণের মধ্যাহ্ন। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পল্বল ভেককলরবমুখরিত।

কমলের জ্বর হইয়াছে। সে কন্থায় অঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। কন্থায় বিচিত্র সূচিকার্য্য—শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পসম্বন্ধে যে সুরুচি হারাইয়া আমরা বিদেশ হইতে আনীত বিজাতীয় শিল্পজাতের মোহে মুগ্ধ হইয়া জাতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি,—প্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আজ যে সুরুচির শোচনীয় অভাব তাহা এখনও রক্ষণশীলতার শেষ আশ্রয় রমণীমণ্ডলে বিদ্যমান। কন্থার সূচিকার্য্যে সেই সুরুচি স্বপ্রকাশ। কমল শয়ন করিয়া আছে। সতীশ তাহার শিয়রে বসিয়া। সে বলিল, "কমল, তুমি নিশ্চয় কোনও অত্যাচার করিয়াছ।"

কমল বলিল, "না।"

সতীশ তাপমান যন্ত্র আনিয়া পত্নীর দেহে তাপ পরীক্ষা করিতে বসিল; সস্নেহে তাহার ললাট হইতে চূর্ণকুন্তলজাল সরাইয়া সেই তপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল। কমলের নয়ন মুদিয়া আসিতে লাগিল। সে কয়বার বলিল, "তুমি কেন কষ্ট করিতেছ?" সতীশ শুনিল না।

তাপ লইয়া সতীশ দেখিল, জ্বর খুব প্রবল হইয়াছে। ধীরে ধীরে কমলের নয়নপল্লব নিদ্রায় মুদিত হইয়া গেল। সতীশ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর উঠিল: অতি ধীরপদে বাহির হইয়া গেল—পাছে কমলের নিদ্রাভঙ্গ হয়। মা দালানে ছিলেন; অমল তাঁহাব কাছে গল্প শুনিতেছিল। সতীশ বলিল, "মা, জ্বর খুব প্রবল।"

মা বলিলেন, "আমি যাইয়া বসিতেছি। তুই একটু বিশ্রাম করিতে যা।"

সতীশ পুত্রকে বলিল, "অমল বাবু, চল, আমরা বাহিবে যাই।"

অমল বাবু সে বিষয়ে বিশেষ ব্যগ্রতা জানাইলেন না। সতীশ-চন্দ্র বলিল, "ছবি দেখাইব।" তখন অমলবাবুর আপত্তি দূর হইল। পুত্রকে লইয়া সতীশ বাহির-বাটীতে গেল। মা যাইয়া জ্বরকাতরা বধূর শিয়রে বসিলেন।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ঔষধ, পথ্য ও নিয়মের বাঁধাবাঁধিতে কমল কয় মাস ভাল ছিল। ক্রমে শাশুড়ীর ও সতীশের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও নিয়মের বাঁধাবাঁধির হ্রাস হইতে লাগিল। প্রথমে যেরূপ বাঁধাবাঁধি থাকে, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়াই থাকে। এ দিকে হেমন্ত-অন্তে শীত আসিল। কমল শরীরে দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সামান্য অসুখে সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন বলিয়া সে সে কথা প্রকাশ করিল না। বৈশাখের প্রথমে সেই দুর্ব্বলতা আর সতীশচন্দ্রের শঙ্কাতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। সতীশ বলিল, "কমল, নিশ্চয় তোমার অসুখ করিয়াছে।" কমল কিছুতেই সে কথা স্বীকার করিল না।

কমল স্বীকার না করিলেও সতীশচন্দ্র আবার ঔষধ, পথ্য ও নিয়ম সম্বন্ধে বাধাবাঁধি করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের দুই মাস কাটিল। তাহার পর অবর্ষণদীর্ণ ধরাবক্ষে বর্ষার জলধারা বর্ষিত হইল। দেখিতে দেখিতে ধরণীর ধূসর অঙ্গ নবোদ্গত তৃণাঙ্কুরে হরিৎশোভা ধারণ করিল; বৃক্ষলতা প্রচুরপল্লবপুষ্ট হইয়া উঠিল, জলধরশীকর-সঙ্গশীতল সমীরণে কেতকীকদম্বরেণু ভাসিতে লাগিল। কমলের শরীর আবার অসুস্থ হইল। বর্ষার আর্দ্রতায় তাহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সতীশ লক্ষ্য করিল; মাও লক্ষ্য করিলেন। উভয়েরই উৎকণ্ঠার অন্ত রহিল না।

বিশেষ বাঁধাবাঁধি সত্বেও কমলের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। শ্রাবণের প্রথমে জ্বর প্রকাশ পাইল।

কমলের জ্বরের সংবাদ পাইয়া শিবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই চিন্তিত,—সকলেই উৎকণ্ঠিত। স্থির হইল, কমলকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রবল জ্বর না ছাড়িলে, বর্ষা একটু না ধরিলে লইয়া যাওয়া যায় না। তখন জিলা হইতে বড় ডাক্তার আনান স্থির হইল; লোক গেল।

জিলা হইতে যে ডাক্তার আসিলেন, তিনি রোগিণীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া শঙ্কিত হইলেন, বলিলেন, "আমি এ জ্বর সারিয়া দিতেছি। তাহার পর আপনারা রোগিণীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন,—তদনুসারেই কার্য্য করুন।"

ডাক্তারের এই কথায় সকলের আশঙ্কা কমিল না, বরং বাড়িল।

আট দিন ভোগের পর জ্বর ছাড়িল। রোগিণীকে অন্নপথ্য

দিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন। কিন্তু যাইবার সময় আবার বলিলেন, "বিলম্ব না করিয়া রোগিণীকে কলিকাতায় লইয়া যাউন।"

সতীশ নিভৃতে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, সত্য বলুন।"

ডাক্তার দেখিলেন, তাহার নয়নে ভীতিভাব, তাহার কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠাকম্পিত। তিনি বলিলেন, "বিশেষ কিছু নহে। তবে শরীর বড় দুর্ব্বল ; দীর্ঘকাল ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন।"

ডাক্তারের কথায় সতীশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কলিকাতায় যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল।

সতীশ বলিল, "বাসা ভাড়া করিবার জন্য প্রভাতকে পত্র লিখি!"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমি বা নবীন – কেহ যাইয়া ভাড়া করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।" পুত্রের ব্যবহারে তিনি এমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র বুঝাইয়া বলিলেন, "দাদা, সতীশ পত্র লিখিবে, লিখুক। আমাদের দুঃখের কথা আর বাহিরে জানাইয়া ফল কি?"

শিবচন্দ্র বুঝিলেন ; বলিলেন, "আচ্ছা। সতীশ লিখে লিখুক।"

শেষে তাহাই হইল।

চারি দিন পরে প্রভাতের পত্র আসিল। কমলের পীড়ার সংবাদে সে বিশেষ উৎকণ্ঠা জানাইয়াছে ; সংবাদ দিয়াছে, বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

এ দিকে বর্ষার প্রকোপও শান্ত হইল। কলিকাতায় যাইবার

সকল আয়োজন স্থির ছিল ; কেবল কমলের দৌর্ব্বল্য ও বর্ষা—এই উভয় কারণে যাওয়া ঘটে নাই। সুতরাং পত্র পাইয়া আর যাইতে বিলম্ব হইল না।

যাইবার কয় দিন পূর্ব্ব হইতে কমল আবার বড় অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। চক্ষু জ্বালা করে, মাথা ধরে, আহারে রুচি নাই, মুখ বিস্বাদ,—শরীরে সুখ নাই। কমলের ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছিল। শরীরের শক্তি ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল ; অথচ সে ক্ষয় ধীরে ধীরে হইতেছিল,—সহজে অনুভূত হয় না। নিয়তির কঠোর কার্য্য প্রকৃতি যেন স্নেহবশে যথাসম্ভব যাতনাবিহীন করিতেছিল।

প্রথমে স্থির হইয়াছিল, শিবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সতীশচন্দ্রের জননী ও সতীশচন্দ্র কমলকে লইয়া কলিকাতায় যাইবেন। শিবচন্দ্র স্বয়ং যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। কিন্তু বৈষয়িক কার্য্যের অনুরোধে তাঁহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। তিনি বলিলেন, কার্য্য শেষ করিয়াই যাইবেন। চিকিৎসাদি সম্বন্ধে তিনি নবীনচন্দ্রকে অনেক উপদেশ দিলেন ; কিন্তু পুত্রের সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিলেন না।

নবীনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের জননী কমলকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। দত্ত-পরিবারে সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন। শিবচন্দ্র সংবাদের আশায় পথ চাহিয়া রহিলেন। পিসীমা'র ও বড় বধূর আশঙ্কা যেন অসহনীয় হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর সত্য।

কমল কলিকাতায় আসিল। প্রভাত রেলওয়ে-ষ্টেশনে ছিল। সে কমলকে দেখিয়া শঙ্কিতনেত্রে পিতৃব্যের দিকে চাহিল। যে কৃশতা দিনে দিনে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যাঁহারা কমলকে প্রত্যহ দেখিতেন, তাঁহাদের নিকট সে কৃশতার স্বরূপ স্বপ্রকাশ হয় নাই। প্রভাত প্রথম দর্শনে সে কৃশতা দেখিয়া শঙ্কিত হইল। সে সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন জ্বর হইয়াছে?" সতীশ সবিশেষ বলিল। প্রভাত সকলকে বাসায় লইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতেই ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার সমস্ত অবস্থার কথা শুনিলেন; বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোনরূপ মত প্রকাশ করিলেন না। সতীশ ও প্রভাত উভয়েই জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ দেখিলেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "আগামী কল্য আবার দেখিয়া বলিব।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে শোভা ননন্দাকে দেখিতে আসিল। শোভাকে পাইয়া কমলের যেন আর আনন্দ ধরে না। সে কেমন করিয়া তাহাকে যত্ন করিবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শোভা যত বলে, "ঠাকুরঝি, তুমি অসুস্থশরীরে ব্যস্ত হইও না। আমার জন্য ব্যস্ত কেন?" কমল ততই যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

শোভার বর্ষমাত্রবয়স্ক পুত্র শচীকে কমল আদরে বিব্রত করিয়া

তুলিল। এমন কি, সে সহজে নবীনচন্দ্রকেও শিশুকে লইতে দিতে সম্মত হইল না। শোভা বলিল, "ঠাকুরঝি, তোমার পরিশ্রম হইবে। তুমি উহাকে ক্রোড় হইতে নামাও।"

কমল ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "শচীবাবুকে লইতে পরিশ্রম! শচীবাবু, আর মা'র কাছে যাইও না। চল, আমরা বাড়ী যাইব।"

শোভা হাসিতে লাগিল।

কমল বলিল, "বৌদিদি, কেবল হাসিলে হইবে না। এবার আমি ছাড়িব না; তোমাকে আমাদের সঙ্গে বাড়ী যাইতে হইবে।"

শোভা আবার হাসিল; বলিল, "এখন তুমি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠ। সত্য, ঠাকুরঝি, তুমি বড় রোগা হইয়াছ।" সত্য সত্যই শোভার তখন শ্বশুরালয়ে যাইতে আপত্তি ছিল না; বরং একবার যাইতে -বহুদিনের জন্য হউক বা না হউক, কিছু দিনের জন্য যাইতে—তাহার একটু ইচ্ছা হইয়াছিল। কমল যদি রোগমুক্তা হইয়া ফিরিবার সময় তাহাকে জিদ করিয়া বলিত, তবে সে যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে।

প্রভাতের ও শোভার ব্যবহারে নবীনচন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না! তাঁহার আশা হইল, এইবার মনোমালিন্যের সকল কারণ দূর হইয়া যাইবে; শিবচন্দ্র আসিয়া দেখিবেন, পুত্র আবার স্নেহালিঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়াছে; বধূ গৃহের লক্ষ্মী হইবে; পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র গৃহ উজ্জ্বল করিবে। তিনি শোভাকে বলিলেন, "মা'! বুড়া ছেলেকে

একবার কাঁদাইয়া ফিরাইয়াছ। এবার কিন্তু ছেলে আর শুনিবে না। মা'র ছেলে মা'কে লইয়া যাইবে ;—সে আর মা'কে ছাড়িয়া যাইবে না।"

শোভা লজ্জা পাইল।

শচীকে কমল যখন ক্রোড় হইতে নামাইল, নবীনচন্দ্র তখনই তাহাকে অধিকার করিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার সময় শোভা বিদায় লইল। কমল বলিল, "বৌদিদি, আজ সমস্ত দিন তোমার নানা অসুবিধা হইয়াছে।"

শোভা বলিল, "সে কি, ঠাকুরঝি? অমন কথা মনে করিও না।"

"মনে করিয়া এক একবার আসিও।"

"আসিব বৈ কি! সর্ব্বদাই আসিব।"

কমল পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "অমল, মামীমা'কে প্রণাম কর।" অমল শোভাকে প্রণাম করিল। শোভা তাহাকে আদর করিল; বলিল, "আমার সঙ্গে চল।"

বালক সরিয়া আসিয়া জননীর অঞ্চল ধরিল।

শোভা ননন্দাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, ছেলে বুঝি বাপের দেখাদেখি তোমার আঁচল ছাড়িতে চাহে না?"

কমলের একবার মনে হইল, বলে,—ছেলে যে দেশে আসিয়াছে, সেই দেশের আচার শিখিতেছে। কিন্তু তাহার মুখ ফুটিল না।

"তবে—আসি," বলিয়া শোভা বিদায় লইল।

নবীনচন্দ্র স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া শচীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। সতীশ তাহার জন্য রাশীকৃত খেলিবার পুতুল দিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যাইবি না ?"

প্রভাত বলিল, "না।"

শোভা চলিয়া গেল। প্রভাত রহিল।

প্রভাত সেই দিন পনর দিনের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। কৃষ্ণনাথ মুৎসুদ্দি, সুতরাং ছুটীর জন্য চিন্তা ছিল না।

ক্রমে যখন রাত্রি হইল, নবীনচন্দ্র তখন প্রভাতকে বলিলেন, "তবে তুই যা।"

প্রভাত বলিল, "আমি থাকি।"

নবীনচন্দ্র ভাবিলেন, একেবারে অধিক ভাল নহে। তিনি বলিলেন, "আজ আর থাকিয়া কি করিবি ? কল্য প্রভাতে— ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে আসিস্।"

সে দিন নবীনচন্দ্র হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার দৃঢ় আশা হইল, এইবার সত্য সত্যই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। তিনি অন্ধকারে আলোকবিকাশের কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনি আপনাকে বুঝাইলেন, "আমরাই ভ্রান্ত। প্রভাত কি কখনও আমাদিগের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে ? তাহা সম্ভব নহে।" হায়—সরল হৃদয় !

পর দিন শোভা পুনরায় কমলকে দেখিতে যাইতে চাহিল। চপলা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি, ঠাকুরঝি, এবার যে দেখি,

শ্বশুরবাড়ীর উপর বড় টান! কাল একবার গিয়াছিলে, আজ আবার ননন্দার জন্য প্রাণ পুড়িতেছে?”

শোভা সে বিদ্রূপ বিদ্রূপ-রূপেই গ্রহণ করিল।

মধ্যমা বধূ বলিলেন, “ঠাকুরঝি, তোমার শাশুড়ী আসিতেন, সে অন্য কথা হইত। এখন এ কুটুম্বের বাড়ী। প্রত্যহ যাইবে কেন? তাহা কি ভাল দেখাইবে?”

শোভা ইতস্ততঃ করিল,—বিচলিত হইল। এক দিকে নবীনচন্দ্রের অপরিমেয় স্নেহ ও কমলের অসীম যত্ন মনে পড়িল। তখন যাইতে ইচ্ছা হইল। যাহারা অত অল্পে তুষ্ট হয়, তাহাদিগকে কি তুষ্ট না করিয়া থাকা যায়? অপর দিকে—মধ্যমা বধূর কথাও সত্য। কুটুম্বের বাড়ী প্রত্যহ যাওয়া কি ভাল? মধ্যমা বধূ ত তাহা ভাল বলেন নাই! শোভা ভাবিল; শেষে চপলার সহিত পরামর্শ করিল। চপলা বলিল, “মেজদিদির কথা ত সত্য; কুটুম্ববাড়ী প্রত্যহ না-ই যাইলে। গত কল্য ত গিয়াছিলে। আবার না হয় দুই চারি দিন পরে যাইও।”

শোভা আবার ভাবিল। হৃদয়ে অনিশ্চয়তা দূর হইল না। কি করে? শেষে সে যাওয়া স্থগিত করিল; দাসীকে আদেশ দিল, “এখন যাইব না। শচীর পোষাক খুলিয়া দাও।”

পোষাক পরিতেও যেমন, খুলিতেও শচীর তেমনই আপত্তি ছিল। সেই জন্য সে শৈশবে কষ্ট বা আপত্তি জানাইবার অস্ত্র ব্যবহার করিল,—কাঁদিতে লাগিল। শোভার মন একেই অনিশ্চয়তাহেতু ভাল ছিল না। সে পুত্রের ক্রন্দনে বিরক্ত হইয়া বলিল, “এমন

বিষম জিদি ছেলে দেখি নাই।” সে পুত্রকে তিরস্কার করিল,—ফলে পুত্র দ্বিগুণ উৎসাহে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সেই ক্রন্দনে শোভার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দাসীকে শচীর পোষাক খুলিয়া দিতে দেখিয়া শোভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পোষাক খুলা হইতেছে কেন? এখন যাইবি না?”

শোভা বলিল, “না।”

“কেন? যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে; গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। ঘুরিয়া আয়।”

“না। আজ আর যাইব না।”

শোভার জননী শচীকে কোলে লইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

এ দিকে ডাক্তার আবার কমলকে দেখিলেন, দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; পর দিন এক জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পর দিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও আসিলেন; বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন, শেষে মত ব্যক্ত করিলেন—দ্রুত যক্ষ্মা।

নবীনচন্দ্রের ও সতীশচন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুনিয়া প্রভাতেরও চক্ষুতে জল আসিল।

ডাক্তার উপদেশ দিলেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা ত হইবেই, অধিকন্তু রোগিণীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। নীলগিরি পর্ব্বতের বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী ওয়ালটেয়ার সহরের জলবায়ু যক্ষ্মায় বিশেষ উপকারী।

শীতকাল আসিতেছে, এখন ওয়ালটেয়ারে যাওয়াই ভাল;— বিশেষ যাইবারও সুবিধা, সুতরাং সেখানে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

তাহাই স্থির হইল।

যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া তিন দিনের মধ্যে গৃহে সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া উৎকণ্ঠিতা পিসীমা'কে ও বড় বধূকে লইয়া শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর কি বিলম্ব সহে? সকলেই উৎকণ্ঠায় অধীর।

ওয়ালটেয়ারে বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য সতীশচন্দ্র চলিয়া গেল। চারি দিন পরে তাহার টেলিগ্রাম আসিল,— বাসা ভাড়া করা হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড।

আরও দুঃখ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদেশে।

মদ্রদেশের বনরাজিনীলা নীলাম্বুবেলায় ওয়ালটেয়ার সহর—প্রথম দর্শনে চিত্রে লিখিতবৎ প্রতীয়মান হয়। সমুদ্র ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া গিয়াছে; প্রান্তরে কোথাও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা শিলাস্তূপ; মধ্যে মানবের আবাস-গৃহ প্রান্তর-দৃশ্যে সজীবতার সঞ্চার করিতেছে। পথিপার্শ্বে ও গৃহপ্রাঙ্গনসীমায় কেতকীর বৃতি ও পবন-সঞ্চারমুখর, আনতপত্রমুকুট নারিকেল তরু—সরল,—সুন্দর,—শোভাময়। সর্ব্ব ঋতু শীতাতপের আতিশয্যবর্জ্জিত,—শীত বা গ্রীষ্ম, কিছুই প্রবল হইতে পারে না; আবার দিবায় ও রাত্রিতে তাপ-বৈষম্য অতি সামান্য। পথে যান,—দুইখানি চক্রের উপর একটি অনতিদীর্ঘ বাক্স, দ্বার পশ্চাতে,—মধ্যে লম্বে দুই খানি অথবা প্রস্থে দুই বা তিনখানি বেঞ্চ, বাহন গো বা অশ্ব। পথের জনতায় কিছু নূতনত্ব আছে। পুরুষের মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডিত; পরিধেয় বস্ত্রে বর্ণের অভাব নাই,—বসন ও উত্তরীয় প্রশস্ত পাড়ওয়ালা, ভৃত্যাদির পৃষ্ঠে তোয়ালে। রমণীদিগের বসন লোহিত, পীতাভনীল প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; শাটী ঘুরিয়া বহু ভাঁজে আসিয়া পড়িয়াছে; অনেকের বসন এমন ভাবে দেহলতা বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে যে, পৃষ্ঠ ও বাহু অনাবৃত, কিন্তু সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ আবৃত। পথে উলঙ্গ বালকবালিকাগণ খেলা করিতেছে; কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কাহারও বা কটিদেশে রৌপ্যে বা পিত্তলে গঠিত

অলঙ্কার, প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণে কর্ণাভরণ, কাহারও বা কটিসূত্র হইতে একখানি চক্রাকার রৌপ্যপত্র সম্মুখে বিলম্বিত। পথের পার্শ্বে দোকানে বা তালপত্রনির্ম্মিত বৃহৎ ছত্রচ্ছায়ায় পশারিণীরা কেহ বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, কেহ বা ক্রেতার সহিত দর কসাকসি করিতেছে, কেহ বা কোনও আগন্তুকের সহিত হাস্যপরিহাসবহুল আলাপে মন দিয়াছে, কেহ বা অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলস্যসঙ্কুচিত-নেত্রে চুরুট টানিতেছে। শ্রমজীবীদিগের পরিধানে কৌপীন-মাত্র,—সুগঠিত দেহ প্রায় নগ্ন।

সম্মুখে সমুদ্র। অনন্ত জলবিস্তার—যত দূর চাহ, কেবল ঊর্ম্মিলীলা; ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি;—চক্রবাল পর্য্যন্ত অসীমজলরাশি প্রসারিত। ঊর্ম্মিমালা যেন আবৰ্ত্তিত হইয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে; আবর্ত্তনে, পতনে ও প্রত্যাবর্ত্তনশীল জলরাশির প্রতিঘাতে ফেনময় হইয়া উঠিতেছে; শেষে তীরে আসিয়া শুভ্র ফেনহাস্যে বেলাভূমিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে; তাহার পর তীরে শুক্তি, প্রস্তরখণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া সাগরগর্ভে ফিরিয়া যাইতেছে। যেখানে সাগরসলিলে সলিলসঙ্গজাত-শৈবাল-সমাচ্ছন্ন শিলারাশি জলের উপর মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান, সেখানে শিলার অঙ্গে প্রতিহত ঊর্ম্মি-মালা চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে ফেনময় জলকণা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। সিন্ধুমধ্যে সাগরের উদার বক্ষে ঊর্ম্মির শ্বেতফেনচূড়া জলোপরি ভাসমান শুভ্রকুসুমদামের মত প্রতীয়মান হইতেছে। সাগরের কি বিচিত্র রূপ! ক্ষণে ক্ষণে নূতন। পবনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ পরিবর্ত্তিত হয়; মেঘালোকক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ পরিবর্ত্তিত

হয়। কথনও অম্লানোজ্জল নীলাম্বরতলে সমুদ্রের নীলিমা,—নীল জল রবিকরে জ্বলিতেছে,—শেষে চক্রবালরেখায় নীল জল আর নীল আকাশ মিশিয়াছে. কথনও অর্দ্ধনীল—অর্দ্ধহরিত। কথনও কূল হইতে বহুদূর গৈরিক—তৎপরে নীল—হরিত। কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য! গৃহে বসিয়া সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সে শোভা দেখ, পদে পদে পলায়নপর-কুলীরকশাবক-সঙ্কুল,—কেতকীর বৃতিবেষ্টিত,—নারিকেলবীথিমধ্যবর্ত্তী বেলাপথে গমন করিতে করিতে সে শোভা দেখ;—বিশাখাপত্তন ও ওয়ালটেয়ারের মধ্যপথে অবস্থিত বিশ্রামস্থানে বসিয়া সে শোভা দেখ;—দেখিয়া আশ মিটিবে না।

সম্মুখে সমুদ্র—বীচিবিক্ষোভচঞ্চল—কামরূপী। পশ্চাতে পর্ব্বত—হরিতবৃক্ষলতাদিমণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে শিলাস্তূপ। পথিপার্শ্বে অযত্নবর্দ্ধনশীল লতাগুল্মে কোথাও বা নীল অপরাজিতা, কোথাও বা লোহিতাভ হরিদ্রাবর্ণের বনফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া আছে। প্রান্তরে হরিত তৃণে লোহিতাভ, হরিদ্রাভ ও নীলবর্ণ কুসুম। সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে বালুকার স্তূপ,—তাহার উপর কণ্টকতৃণ সেই বালুকারাশির হৃদয়হীন হৃদয় হইতে রস শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে।

এই নূতন স্থানে আসিয়া পথের ক্লেশ দূর হইবার পর প্রথম প্রথম কয় দিন কমলের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হইল। সকলেরই হৃদয়ে ক্ষীণ আশাদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গৃহ প্রাঙ্গনসীমায় সমুদ্র। কমল সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যাইত;

এমন কি, সতীশকে ও প্রভাতকে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়া এক দিন সমুদ্রে স্নান করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল। শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, "ঠাকুর করুন, তুই শীঘ্র সারিয়া ওঠ,—সমুদ্রে স্নান করিবার মত সবল হ'।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "তুমি সারিয়া উঠ। আমরা মাতাপুত্রে এক দিন স্নান করিব। আমি এখনও সাহস করিয়া সাগরে স্নান করি নাই।"

সে দেশের লোকের কথা কমল কিছুই বুঝিতে পারিত না। ভাঙ্গা হিন্দীর সাহায্যে—ভৃত্যের সহায়তায় শিবচন্দ্র কোনও রূপে সে কথা বুঝিতে পারিতেন। ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে আসিলে, কড়ি-বিক্রেতা কড়ি বিক্রয় করিতে আসিলে, ধীবর সামুদ্রিক মৎস্য লইয়া আসিলে, শিবচন্দ্রকে তাহাদের কথা কমলকে বুঝাইয়া দিতে হইত। শিবচন্দ্র যে সকল সময় অভ্রান্ত হইতেন, এমন বোধ হয় না। কিন্তু এই দ্বিভাষীর কার্য্যে শিবচন্দ্র ও কমল—উভয়েরই অসীম আনন্দ। এক এক দিন কমল জ্যেষ্ঠতাতের সহিত সমুদ্রতীরে অল্প দূর বেড়াইয়া আসিত। কিন্তু অতি সামান্য দূর যাইলেই সে শ্রান্ত হইয়া পড়িত। শিবচন্দ্র তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেন।

সকলেরই আশা হইল, যত্নে কমলের জীবন-দীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইবে না; এমন কি, সে সারিলেও সারিতে পারে। দারুণ আশঙ্কায় সতীশের হৃদয় বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এখন সে হৃদয় বাত্যাবসানে সাগরের মত অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। নিরাশার মেঘঘোরে ক্ষীণ রেখায় আশার অরুণকিরণ-

বিকাশ সূচিত হইল। হৃদয়ের অতি দারুণ ভার কিছু লঘু হইল। শিবচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের মুখে আশঙ্কার অতি নিবিড় ছায়া সরিতে লাগিল।

প্রভাত পূর্ব্বে এক পক্ষকালের ছুটী লইয়াছিল; শেষে আরও এক পক্ষের জন্য ছুটীর দরখাস্ত পেশ করিয়া সে ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছিল। নূতন দেশ দেখিয়া তাহার বহু দিন নগরদৃশ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত নয়ন তৃপ্ত হইল। সে সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য অতি প্রত্যূষে উঠিত; 'অপেরাগ্লাস' লইয়া বালুকা-স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে সূর্য্য-বিকাশের অপেক্ষা করিত। যে দিন পূর্ব্ব-দিক্‌চক্রবালে মেঘ থাকিত—জলের মধ্য হইতে গোলকপ্রকাশ দেখা যাইত না, সে দিন কি হতাশা! আর যে দিন তাহা দেখা যাইত, সে দিন কি আনন্দ! কিন্তু আনন্দের বিপদ, সে দৃশ্য বর্ণনাতীত! তাই শোভাকে পত্র লিখিবার সময় সে কিছুতেই ঠিক বুঝাইতে পারিত না। শোভা তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হউক আর না-ই হউক—আপনার আনন্দের অংশ তাহাকে দিবার জন্য প্রভাত সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত।

প্রভাত এই নূতন স্থানে কত নূতন জিনিস দেখিত, আর দীর্ঘ পত্রে শোভাকে সে সকলের বিষয় লিখিত। যুবক যখন প্রেম-বিহ্বলতায় পত্নীকে আপনার আনন্দের অংশ দিতে ব্যগ্র হয়, তখন কি সে কল্পনা করিতে পারে, তাহা হয় ত পত্নীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নাও হইতে পারে? প্রভাত কি ভাবিতে পারিত, এই সব অতি

দীর্ঘ পত্র—সহস্র খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিবরণ হয় ত শোভার ভাল লাগিবে না?

সমুদ্রসৈকতে কত শুক্তি পড়িয়া থাকে—ক্ষুদ্র, সুন্দর; কত সুরঞ্জিত কড়ি বিক্রীত হয়; গজদন্তের কত দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায়; বিচিত্র পাড়ওয়ালা কাপড় প্রস্তুত হয়;--প্রভাত পত্নীর জন্য এ সকল সংগ্রহ করিত। কিন্তু সে জন্য তাহার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না; বধূর জন্য সেই সকল দ্রব্য কিনিতে, শচীর জন্য খেলানা সংগ্রহ করিতে পিসীমা'র আলস্য ছিল না।

প্রথম প্রথম কমলের স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইল। সকলেরই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। এই সময় প্রভাত দুই-খানি পত্র পাইল। কৃষ্ণনাথ লিখিয়াছেন, আফিসে কাযের বড় ভিড়; অতিরিক্ত লোক লওয়া হইতেছে। 'সাহেব' এ সময় আর অধিক ছুটী দিবে না। বরং এখন আসিলে উন্নতি হইতে পারে-- এক জন উপরিস্থিত কর্ম্মচারী বার্দ্ধক্যহেতু কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাই-তেছেন। শোভা পত্রের শেষে লিখিয়াছে, "তুমি কবে আসিবে?"

কৃষ্ণনাথের পত্র পাইয়া প্রভাত একটু চিন্তিত হইল; কর্ম্মে উন্নতির সম্ভাবনার আলোচনা করিল। কিন্তু সহজেই কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। শোভার পত্রের সামান্য জিজ্ঞাসায় প্রভাত আকুলতা অপেক্ষাও দারুণ ব্যগ্রতা উপলব্ধি করিল। সে কল্পনা করিল, শোভা নিশ্চয়ই তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হই-য়াছে। সে আপনার হৃদয় দিয়া পত্নীর হৃদয় বিচার করিল। 'যাই কি, না যাই'—ক্রমে 'যাইব' এই সঙ্কল্পে পরিণত হইল। তখন

প্রভাত আপনাকে আপনি বুঝাইতে লাগিল,—কমলের শরীর সারিয়া উঠিতেছে। এখন আমি যাইলে ক্ষতি নাই। বরং দিন কতক পরে আসিয়া সকলকে লইয়া যাইব। ইহার মধ্যে শোভাকে বুঝাইব; যদি সম্মত করিতে পারি, তাহাকেও বাড়ী লইয়া যাইব, এবং কিছু দিন বাড়ী থাকিব। আর তখন যদি বুঝি, শোভার পল্লীগ্রাম ভাল লাগে, তবে না হয় কলিকাতার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশেই স্থায়ী হইব। পিতার ও পিতৃব্যের তাহাই ইচ্ছা। কর্ম্ম করাও একান্ত আবশ্যক--এমন নহে। বাড়ীতে থাকিলেও, বোধ হয়, ভাল হয়। তবে সকলের মূলে—শোভার মত।

ক্রমে সঙ্কল্প স্থির হইয়া আসিল,—অনিশ্চিত নিশ্চিত হইল। তখন আর এক কথা-কেমন করিয়া যাইবার কথা বলিব? শেষে, অনেক চিন্তার পর সে সতীশকে ডাকিয়া কৃষ্ণনাথের পত্র দেখাইল, বলিল, "সতীশ, তুমি সুযোগমত বাবাকে বলিয়া আমার যাইবার অনুমতি করাইয়া দাও।"

সতীশ বলিল, "তোমার চাকরী করা যখন সকলেরই অনভিপ্রেত, তখন না করিলেই ভাল হয় না?"

প্রভাত বলিল, "দেখ, সংসারও ক্রমে বাড়িবে, ব্যয়ও বাড়িবে। বসিয়া না খাইয়া যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, সে কি ভাল নহে? বাবা ও কাকা বাড়ীর কায দেখিতেছেন। আমার পক্ষে এখন বাড়ী থাকা অত্যাবশ্যক নহে। যে কয় দিন সম্ভব হয়, কিছু উপার্জ্জন করি।"

"কিন্তু বাড়ীর কাযও ত শিখিতে হইবে। সহসা যে এক দিন

অন্ধকার দেখিবে! বিশেষ নূতন জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে আর ফিরিতে পারিবে কি না—সন্দেহ।"

"সে ভয় নাই।"

"তোমার বাড়ীর কায তুমি দেখিলে তোমার চাকরীর উপার্জ্জন পোষাইয়া যায়।"

প্রভাত আর কিছু বলিল না।

প্রভাতের একান্ত ইচ্ছা বুঝিয়া সতীশ শিবচন্দ্রের নিকট তাহার যাইবার প্রস্তাব করিতে স্বীকৃত হইল।

সতীশ শিবচন্দ্রকে কৃষ্ণনাথের পত্রের কথা জানাইয়া বলিল, "প্রভাত বলিতেছে, এখন আর এখানে তাহার থাকা বিশেষ আবশ্যক নহে। সে এখন যাইয়া আবার আসিবে। আপনার অনুমতি চাহে।"

শিবচন্দ্র পুত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কমলের এই পীড়ার সময়ও তাঁহাদের কাছে থাকিবে না শুনিয়া তাঁহার বিরক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি যেন ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন; সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, না—তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?"

সতীশ বুঝিল, দারুণ বিরক্তির কথা; বলিল, "প্রভাত জিজ্ঞাসা করিয়াছে।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমার অনুমতির আবশ্যক? তিনি ত সে জন্য ব্যস্ত নহেন। আমি তাঁহাকে আসিতেও বলি নাই, যাইতেও বলিব না। তাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

সতীশ প্রভাতকে জানাইল, শিবচন্দ্র বলিয়াছেন, তিনি তাহাকে আসিতেও বলেন নাই, যাইতেও বলিবেন না। তাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ তাহাকে বুঝাইল, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য।

পিতার কথা শুনিয়া প্রভাতের মনে অভিমান জাগিল। সে আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে উন্নতি-সম্ভাবনার বিষয় মনে হইল। সে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শোভার মত কি? সে কলিকাতায় যাওয়াই স্থির করিল।

প্রভাত যাইবে শুনিয়া কমল বলিল, "না, দাদা, তুমি যাইতে পাইবে না।"

প্রভাত তাহাকে বুঝাইল, "আমি আসিয়া তোদের লইয়া যাইব। তুই শীঘ্র সারিয়া ওঠ। তুই সারিয়া আমাকে আসিতে লিখিলেই আমি আসিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃখ কেন ?

চপলার মনের ভাব নলিনবিহারী বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে পদে পদে ব্যথিত হইতে লাগিল। আপনার প্রেমের প্রতিদানে সে পত্নীর নিকট যে প্রেম প্রত্যাশা করিয়াছিল,—তাহা পাইল না। সে যে প্রেমসুখের আশা করিয়াছিল,—যে প্রেম জীবনে সুখ, যাতনায় সান্ত্বনা ও অস্থিরতায় শান্তি হইবে ভাবিয়াছিল,—সে প্রেম সে পাইল না। পরন্তু চপলার ব্যবহারে সে বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল; লক্ষ্য করিতে লাগিল,—আর পদে পদে বিষম বেদনা পাইতে লাগিল।

কিন্তু প্রেম সহজে প্রেমাস্পদের দোষ দেখিতে পায় না। তাই নলিনবিহারী আপনাকে দোষী করিয়া চপলাকে নির্দ্দোষ দেখিতে প্রয়াসী হইল। সে প্রথমে মনে করিল, সে অতিরিক্ত অসম্ভবের আশা করিয়াছিল,—তাই হতাশ হইয়াছে; সে কল্পনায় মাত্র সম্ভব আদর্শে চপলাকে বিচার করিয়াছে—অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তা স্থায়ী হইল না। জলোপরি জলবিম্বের মত সে সান্ত্বনা যখন বিলীন হইয়া গেল, তখন সে চিন্তান্তর গ্রহণ করিল।

তাহার পর সে মনে করিল, স্বামীর অবিচারিত প্রেমাতিশয্যে পত্নীর হৃদয়ে বিরক্তি উৎপন্ন হয়। হয় ত সে পত্নীর বালিকাহৃদয়ে প্রেমবিকাশ সূচিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার নিকট প্রেমতৃষ্ণা জানা-

ইয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে। তখনও তাহার বৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হয় নাই ; তখনও সে প্রেমের স্বাদ বুঝিতে শিখে নাই,—বুঝিতে পারিত না। অবিচলিত নির্ভর, অসাধারণ সহিষ্ণুতা যে প্রেমের ভিত্তি, তাহা সে তখনও বুঝে নাই কি মূল্যে কি কিনিতে হয়, কি লাভের জন্য কি ত্যাগ করিতে হয়—তাহা সে তখনও জানিত না। তাই সে বিরক্ত হইয়াছে। তখন সে লজ্জাধিক্যে সে কথা তাহার নিকটেও প্রকাশ করে নাই। হৃদয়ে প্রেম স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বেই বিরক্তি স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রেম বিকশিত হইবার সময় বিরক্তির ব্যাঘাতে ফুটিতে পাবে নাই। স্বামীর ব্যবহারে সময় সময় পত্নী বিরক্ত হইয়া উঠে। হাস্যপরিহাসপ্রিয় সুন্দরী প্রথম যৌবনে আপনার প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদের উপর শাসন নিতান্ত ক্লেশকর বলিয়াই বিবেচনা করে। স্বামী গুরুর আসনে বসিয়া—সখার পরিবর্ত্তে শাসক হইয়া দাঁড়াইলে, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। পারিবে কেমন করিয়া ?

নলিনবিহারী এমনই করিয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সেই চেষ্টায় হৃদয়ে সান্ত্বনালাভের আশা করিল ; আপনাকে দোষী করিয়া প্রেমাস্পদকে নির্দ্দোষ দেখিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিল। আশা পূর্ণ হইল কি ? চেষ্টা সফল হইল কি ?

এইরূপ চিন্তায় চিন্তিতচিত্ত নলিনবিহারী শান্তি পাইল না, বরং অধিক যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। কারণ, এই সকল চিন্তা মনে উদিত হইলে চপলার ব্যবহারের প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়িল ; সন্দেহ দৃঢ়তর হইল ; পদে পদে মনে হইতে লাগিল,—

চপলা তাহাকে ভালবাসে না, তাহার সকল কার্য্যে, ব্যবহারে স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ পায়; সে সে বিরক্তি গোপন করিবারও চেষ্টা করে না। নলিনবিহারীর জীবন যাতনাকাতর হইয়া উঠিল।

নলিনবিহারী কয় দিন মনে করিল, চপলাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবে—কেন সে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে? কিন্তু সে বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না, কথা মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল—পাছে চপলা সে কথায় ব্যথা পায়। হায় প্রেম! কিন্তু নদীর জল জমিতে জমিতে শেষে একদিন আপনার বেগে সব ভাসাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। একদিন নলিনবিহারী আর পারিল না; বলিল, "চপলা, তুমি বিরক্ত হইয়াছ?"

চপলার নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন, এতদিন পরে সহসা আমার বিরক্তির কথা কেন?" সে স্বরে কোমলতা নাই।

"অসুস্থ শরীরে আমি হয় ত আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। কিছু মনে করিও না।"

"কে সে জন্য তোমাকে কিছু বলিয়াছে? কে কাঁদিয়া তোমার সোহাগ যাচিয়াছে?" স্বর তীব্র।

নলিনবিহারীর কণ্ঠ যেন বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে ব্যথিত হইল; বলিল, "চপলা, আমি কি করিলে তুমি সুখী হও?"

চপলার ওষ্ঠাধর উপহাসব্যঞ্জক হাস্যে কুঞ্চিত হইল। সে বলিল, "কেন,—আজ সহসা আমার সুখাসুখের জন্য তুমি এত

ব্যস্ত হইয়া উঠিলে কেন? এমন ত কখনও দেখি নাই। কেন, আজ কি পড়িবার বই সব ফুরাইয়া গিয়াছে?"

চপলার চক্ষুতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে নলিনবিহারীর দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। নলিনবিহারীর চক্ষু তখন অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতেছিল; সে সে কটাক্ষ লক্ষ্য করিতে পারিল না। নহিলে সে কটাক্ষ তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত তাহার ব্যথিত কাতর হৃদয় বিদ্ধ করিত।

চপলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। নলিনবিহারীর বক্ষ হইতে বেদনার উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছিল। সে বহুকষ্টে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "চপলা, আমি কবে তোমার সুখে অবহেলা করিয়াছি। তোমার সুখের জন্য—"

চপলা ফিরিল না; উপেক্ষাভরে চলিয়া গেল।

নলিনবিহারীর নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—যেন সংজ্ঞালোপ হইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে যেন নলিনবিহারীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; সে প্রকৃতিস্থ হইল। তখন সব ঘটনা যেন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নলিনবিহারী কাঁদিল। কাঁদিয়া যখন হৃদয়ের বিষম যন্ত্রণাচাঞ্চল্য কিছু শান্ত হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল,—হায়! যে দরিদ্র উদরান্নসংস্থানের জন্য সমস্ত দিন শ্রম করে, কিন্তু জানে, সে সন্ধ্যায় শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরিবে বলিয়া দুইটি নয়ন তাহার পথ চাহিয়া আছে; জানে,—তাহার সুখে আর এক জন সুখী,—আর এক জন তাহার দুঃখের অংশ লয়—সেও তাহার অপেক্ষা

সুখী। সে দরিদ্র পত্নীর প্রেমসৌন্দর্য্যসুন্দর হৃদয়ে আপনার অবিচলিত আবাস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ,—তাই সে সুখী। আর ঐশ্বর্য্যে যত্নে লালিত সে—দুঃখী। তাহার সুখ কোথায় ;—সুখের আশা কোথায়? তাহা[illegible]য়ের উপহার প্রেম প্রতিহত হইয়া তাহাকেই আঘাত করিল,—সে আঘাতের বেদনায় হৃদয় ব্যথিত হইল।

ঘনান্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের মত সহসা নলিনবিহারীর মনে হইল, হয় ত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাই চপলার বিরক্তির কারণ। সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া পাঠে ব্যস্ত,—সর্ব্বদাই গৃহে ; তাই হয় ত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় চপলার প্রেমপিপাসা উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই পরিতৃপ্ত হইয়াছে। আবার সেই পিপাসার অভাবে,—অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় স্বামীর তুচ্ছ ত্রুটী সকল হয় ত চপলার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, চপলা বলিয়াছে, সে পুস্তক লইয়াই ব্যস্ত। নলিনবিহারী ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার অন্ত নাই।

পরদিন হইতে সকলে নলিনবিহারীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। তাহার কার্য্যে বা ব্যবহারে দারুণ পীড়ার নিবিড় ছায়া আর নাই—কেবল মুখে চিন্তার ছায়া নিবিড়তম।

পিতার আফিসে কর্ম্মখালির সংবাদ পাইয়া নলিনবিহারী কর্ম্মপ্রার্থী হইল। কৃষ্ণনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ; বলিলেন, "সে কি কথা? তোর শরীর অসুস্থ; তোর চাকরী কি?" নলিনবিহারী জিদ করিতে লাগিল ; কৃষ্ণনাথ সহজে সম্মত হয়েন না দেখিয়া বলিল, "আমি কায কর্ম্মের অনুপযুক্ত হই, ইহাই কি

আপনার অভিপ্রেত ? আপনি এ কর্ম্ম না দেন, আমি অন্যত্র কর্ম্মের যোগাড় করিব।”

কৃষ্ণনাথ দুর্ব্বলচিত্ত ; পুত্রের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, অন্যত্র কর্ম্ম করিলে গুরু শ্রম অনিবার্য্য, তাহার অপেক্ষা তাঁহার আফিসে থাকাই ভাল। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নলিনবিহারীকে কর্ম্মে ব্রতী করিয়া দিলেন।

অসাধারণ মানসিক বলে দারুণ দৈহিক দুর্ব্বলতা দলিত করিয়া নলিনবিহারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

সকলেই বিস্মিত হইলেন। মধ্যমা বধূ বলিলেন, “আমি তখনই জানি, অত বাড়াবাড়ি কিছুই নহে।”

বড় বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি ?”

“পরীক্ষায় ভাল হয়, কি না হয়, তাই পূর্ব্ব হইতে একটা ছুতা করিয়া রাখা। দেখিতে ভালমানুষটির মত ; যেন কেবল পড়াশুনা লইয়াই আছেন। ঠাকুরপো কি কম চালাক ! আমি ও অনেক দিন হইতেই জানি।”

বড় বধূ বলিলেন, “ছিঃ ! অমন কথা বলিও না।”

মধ্যমা বধূ বলিলেন, “দিদি, তোমাকে বুঝান মানুষের সাধ্য নহে। তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না।”

চপলা মধ্যমা বধূর কথা শুনিতেছিল। তাহার বিস্ফারিত নয়নে অতি উজ্জ্বল দৃষ্টি, চঞ্চল হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ ও বিষম চাঞ্চল্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সব ফুরাইল।

বিদেশে আসিয়া প্রথমে কমলের যে স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না। আবার দৈহিক দৌর্ব্বল্য বাড়িতে লাগিল। কমলের মন ভাল ছিল না। তাহার জন্য সকলে দেশত্যাগী হইয়াছেন ভাবিয়া সে দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইত; শিবচন্দ্রকে বলিত, "জ্যাঠামহাশয়, আমার শরীর সারিয়াছে, ফিরিয়া চলুন।" শিবচন্দ্র বলিতেন, "আর কয় দিন থাক; তাহার পর যাইব। কেন, আমরা ত সকলেই কাছে আছি, তবু যাইবার জন্য ব্যস্ত কেন, মা?" কমল সে কথায় আর উত্তর দিতে পারিত না। কিন্তু শিবচন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, সকলে তাহার জন্যই প্রবাসী বলিয়া সে দেশে ফিরিবার জন্য অত ব্যস্ত হইত।

এই বিদেশে তাহার মনে হইত,—বঙ্গদেশের সেই পল্লীগ্রামে শরৎ সমাগত; তথায়, জলচরসঞ্চারচঞ্চলিত স্নিগ্ধনীলপরিসর নদীর তটভূমি কাশপুষ্পের শুক্লাম্বর ধারণ করিয়াছে! আকাশে-বর্ষণ-লঘু রজতশঙ্খগৌর মেঘমালা পবনের সহিত খেলা করিতেছে। প্রান্তরে স্বর্ণশীর্ষ হরিৎধান্য পবনে বিকম্পিত হইতেছে, যেন স্বর্ণচূড় হরিতের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে; জলাশয় সকল মরকতমণিবৎ সুনির্ম্মল জলরাশিতে পূর্ণ; দিবাভাগ ছায়ালোকক্রীড়ামধুর; রজনী নক্ষত্রমালিনী, সুন্দরী; এই শরতে তাহার পল্লীভবনপ্রাঙ্গন

শিথিলবৃন্ত শেফালীকুসুমে আস্তৃত, সমস্ত গৃহ সেফালীর মৃদুমধুর সৌরভে আমোদিত। সেই কথা কমলের মনে পড়িত, আর তাহার হৃদয় সেই শতসুখস্মৃতিসমুজ্জল সুদূর পল্লীভবনে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইত। তাহার মনে সুখ ছিল না।

কিন্তু দুঃখের আরও গুরুতর কারণ ছিল।—আপনার রোগ যক্ষ্মা জানিয়া অবধি কমল সাবধান হইয়াছিল; পুত্রকে সর্ব্বদা কাছে আসিতে দিত না, পাছে তাহার রোগ পুত্রকেও আক্রমণ করে। কিন্তু তাহাতে জননী-হৃদয় পদে পদে ব্যথিত হইত। সে পুত্রকে যতই দূরে রাখিত, তাহার মাতৃহৃদয় তাহার জন্য ততই তৃষ্ণাতুর হইত। সে আকুল,—অসীম,—দারুণ তৃষ্ণায় কেবল যাতনা। পার্শ্বের কক্ষে বা বারান্দায় পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় কমল সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকিত। পুত্র কোনও কারণে ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দনে কমলা চমকিয়া উঠিত; সে ক্রন্দন যেন তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইত। পুত্রকে কিছু ক্ষণ দেখিতে না পাইলে তাহার চক্ষু ছলছল করিত; কিন্তু পুত্র নিকটে আসিলে পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সে যেন পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তাহাকে বলিত, "যাও, বাবা, খেলা করিতে যাও।" অমল জননীর ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া বড় বড় চক্ষু মেলিয়া মা'র মুখে চাহিত। কমল কাঁদিয়া ফেলিত। তাহার ইচ্ছা হইত, পুত্রকে তপ্তবক্ষে চপিয়া বক্ষ শীতল করে; তৃষিত চুম্বনে মাতৃহৃদয়ের প্রবল তৃষ্ণা তৃপ্ত করে। পুত্র চলিয়া যাইলেও বহুক্ষণ তাহার নয়নে জল ঝরিত। কেবল আর কাহাকেও দেখিলে সে ত্রস্তে অশ্রু মুছিত;

পাছে আর কেহ তাহার এই দারুণ দুঃখের কথা জানিতে পায়! সে স্নেহপ্রসূত বেদনা যে একান্ত তাহারই। আবার তাহা জানিলে সকলে ব্যস্ত ব্যথিত হইবেন। কিন্তু সে প্রায়ই একক থাকিতে পাইত না, তাই মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিত; আপনি বিষম বেদনা পাইত।

একদিন অমল নিকটে আসিলে কমল যখন তাহাকে খেলা করিতে যাইতে বলিল, তখন অমল মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি আমাকে কাছে আসিতে দাও না কেন?" কমল আর পারিল না; পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর উচ্ছ্বসিত বেদনায় কাঁদিতে লাগিল। কোমল কুসুম নিশার শিশিরসিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অমল কিছু বুঝিতে পারিল না। তথাপি ব্রততীর হৃদয়ের সহিত কোরকের হৃদয় এক সূত্রে বদ্ধ, ব্রততীর হৃদয়ে আঘাত লাগিলে কোরকের হৃদয়েও বেদনা বাজে। তাই জননীর ক্রন্দনে অমলও কাঁদিতে লাগিল। এই সময়-সতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল; দেখিল, মাতাপুত্র ক্রন্দনরত,—কাঁদিয়া উভয়েরই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" সে প্রশ্নে কমলের অশ্রু দ্বিগুণ রহিল। সতীশ পার্শ্বে বসিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে লাগিল; কিন্তু সে যত মুছায়, অশ্রু তত বহে; উচ্ছ্বসিত যাতনার মুক্ত উৎসমুখে সে অশ্রু বহিতেছিল। শেষে সতীশ পুত্রকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, এবং তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া কমলের ক্রন্দনের কারণ বুঝিল। সে পুত্রকে রাখিয়া আসিয়া কমলের কাছে বসিল; নানা কথায় তাহাকে অন্যমনস্কা

করিবার চেষ্টা করিল। কমলের ক্রন্দন থামিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল না।

সেই দিন হইতে সতীশ সর্ব্বদা যেন কমলকে আগুলিয়া থাকিত; পাছে তাহারি কোনও কষ্টের কারণ ঘটে। সে প্রায় সর্ব্বদাই কমলের কাছে থাকিত। কিন্তু কমল সহজেই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। যে রমণী সত্য সত্যই স্বামীকে সর্ব্বস্ব প্রদান করে, তাহার নিকট স্বামীর মনোভাব গোপন থাকে না; থাকিতে পারে না। সে নখদর্পণে স্বামীর হৃদয়ের সুখ, দুঃখ,—আশা, নিরাশা, হর্ষ বিষাদ,—ছায়া, আলোক,—ভাব, অভাব দর্শন করে। সতীশের এ ভাবও কমলের আর এক বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে বেদনা সে ফুটিল না; হৃদয়ে রাখিল।

আর এক দিন অমল জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমরা কবে বাড়া যাইব?" শিশু কি ভাবিয়া কি জিজ্ঞাসা করে, কে বলিবে! কমল কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা ফুটিল না। সেই সময় নবীনচন্দ্র আসিলেন। তখন কমলের চক্ষু ছলছল করিতেছে। নবীনচন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদিতেছিস্?" কমল কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "কৈ!" কিন্তু দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন হইতে গড়াইয়া পড়িল। নবীনচন্দ্র কন্যার কষ্টের কারণ জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার সেই দুই ফোঁটা অশ্রু যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া যাতনা জ্বালাইল। তিনি কন্যার নিকটে

বসিলেন, হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া তাহার সহিত অন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

এক এক সময় অতিক্ষুদ্র কথায়,—অতি তুচ্ছ ঘটনায় চিন্তার উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ভাবনার প্রবাহ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। পুত্রের কথা শুনিয়া কমল ভাবিতে লাগিল। সে শিবচন্দ্রকে বলিল, "জ্যাঠা মহাশয়, দেশে চলুন।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "মা, তুমি আর একটু সারিয়া উঠ।" কমল বলিল, "আমি যাইবার মত সারিয়াছি।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "ডাক্তার বলুক।" কমল জিদ করিল। তাহার আবদার জ্যেষ্ঠতাতের কাছে। ছোট মেয়েকে যেমন করিয়া ভুলায়, শিবচন্দ্র তেমনই করিয়া কমলকে ভুলাইতে লাগিলেন।

ইহার পর একদিন কমল সতীশকে বলিল, "দেশে চল।" সতীশ বলিল, "এত ব্যস্ত কেন?" কমল বলিল, "তুমি আর কত দিন এমন করিয়া পথে পথে ফিরিবে? আমার জন্য তুমি দেশ, ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছ; অর্থ, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য, সুখ, সব হারাইয়াছ। আমি তাহা আর সহিব না।" সতীশ সস্নেহে কমলের রুক্ষ কেশজালের মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "কমল, তুমি কেন মন খারাপ করিতেছে? তোমার কাছে আমার কোনও কষ্ট নাই। তুমি সারিয়া উঠিলে আমার কিসের অভাব? তুমি দুর্ভাবনা মনে স্থান দিও না।" কমলের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "আমাকে লইয়া তোমার কোনও সুখ হইল না। আমি—" সতীশ সাগ্রহে পত্নীর মুখচুম্বন

করিয়া তাহার বাক্য বন্ধ করিল। স্বামী, স্ত্রী, উভয়েরই নয়ন অশ্রুকলুষিত।

সতীশ মনে মনে বলিল,—অর্থ, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য, সুখ—হায়! তুমি এ সকল হইতে কত অধিক আকাঙ্ক্ষিত। তোমার জন্য আমি কি দিতে প্রস্তুত নহি?

কমল মনে করিল, এই প্রেমসুখসুরভিত জীবন ত্যাগ করা বড় দুঃখ! কিন্তু এই অবিচলিত প্রেমের অটল বিশ্বাস লইয়া মরিতে পারাও সৌভাগ্য প্রার্থনীয়।

কয় দিন যাইতে না যাইতে কমলের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। দৌর্ব্বল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। আসন্ন মৃত্যুর ঘনান্ধকার ঘনাইয়া আসিল। চিকিৎসক সে কথা বলিলেন। পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সতীশ দেখিতে লাগিল, —কমলের দৌর্ব্বল্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে,—দীপশিখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের সকল সুখের আশা শেষ হইয়া আসিতেছে। এ চিন্তা বড় যাতনার। জীবনে যাতনার শেষ হইবে না জানিয়া সে যাতনার আস্বাদন করা বড় কষ্টের। নীরবে সে যাতনা সহ্য করা আরও কষ্টসাধ্য।

সতীশের এই কষ্ট কমল লক্ষ্য করিল; আপনি কষ্ট পাইল।

কমলের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই অবস্থায় কয় দিন অতিবাহিত হইলে এক দিন কমলের বোধ হইল, যেন সে একটু সুস্থ বোধ করিতেছে। সে শিবচন্দ্রকে বলিল, "জ্যাঠা মহাশয়, আমি সুস্থ বোধ করিতেছি। বাড়ী চলুন।" শিবচন্দ্র সস্নেহে তাহার

মস্তকে করতল সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন, "মা, আর একটু ভাল হও।"

সে নবীনচন্দ্রকে বলিল, "বাবা, বাড়ী চলুন। দাদা বলিয়াছিল, আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবে। দাদাকে আসিতে লিখুন, আজই লিখুন। দাদা আসিলেই আমরা যাইব।" নবীনচন্দ্র কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস সংবরণ করিলেন।

সে সতীশকেও বলিল, বাড়ী যাইতে হইবে।

কমল সংবাদ দিয়া গজদন্তের ও শৃঙ্গের দ্রব্য-বিক্রেতাদিগকে আনাইল। আপনি বাছিয়া শোভার জন্য, শচীর জন্য, অমলের জন্য নানা দ্রব্য কিনিল। মাদ্রাজের শাটী নূতন প্রকার; সে শোভার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাটী কিনিয়া লইল।

চিকিৎসক বলিলেন, সুস্থ হইবার বিষয়ে এইরূপ বিশ্বাস মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। তিনি গৃহের সকলকে সাবধান থাকিতে বলিলেন,—দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; মৃত্যুর অতর্কিত আবির্ভাব কেহ অনুভব করিতে পারিবে না। সকলেই দুশ্চিন্তায় কাতর হইলেন। সকলেরই হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা। পাছে কমল জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় সকলেই তাহার সম্মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। বিরলে—তপ্ত অশ্রুধারায় হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ পাইত। হায় স্নেহের বেদনা!

দুই দিন গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরই কমল কেমন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। কমল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই সকলে তাহা লক্ষ্য করিলেন। সকলে সতর্ক হইয়াছিলেন। সে

রাত্রিতে সকলেই জাগিয়া রহিলেন। কমল পুনঃ পুনঃ সকলকে ঘুমাইতে বলিল। কিন্তু সকলেই উদ্বিগ্নহৃদয়ে সেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। সকলেই শঙ্কিত; কমলের সামান্য চাঞ্চল্যে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠেন;—সকলেরই দৃষ্টি কমলের মুখলগ্ন।

কমল নবীনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দাদাকে আসিতে লিখিয়াছ?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কল্য লিখিব।"

"আমিও তাহাকে লিখিব, যেন পত্র পাইয়াই আসে।"

কিছু ক্ষণ পরে,—তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে,—কমল বক্ষে একটু বেদনা অনুভব করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "অমল কোথায়?" সেই ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসায় মাতৃহৃদয়ের যে আকুল তৃষ্ণা আত্মপ্রকাশ করিল,—সতীশের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে উঠিয়া যাইয়া সুপ্ত পুত্রকে অঙ্কে লইয়া আসিল। পিসীমা অমলকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কমল বারণ করিল। সে নিশার তিমিরস্পর্শে সঙ্কুচিতদল পদ্মের মত সুপ্ত পুত্রের মুখের দিকে চাহিল,—তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে আপনার করতল পুত্রের কুঞ্চিতকুন্তলশোভিত মস্তকে সংস্থাপিত করিল।

বক্ষে বেদনা কিছু প্রবল বোধ হইল।—যেন নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। কমলের দৃষ্টি পুত্রের মুখ হইতে স্বামীর মুখে আসিয়া স্থির হইল। সেই সময় কমলের নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদিয়া আসিল। সব ফুরাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যথিত হৃদয়।

হৃদয়ে আশা নাই,—জীবনে সুখ নাই,—জগতে আনন্দ নাই। কমল যাঁহাদের হৃদয়ের আশা, জীবনের সুখ, জগতের আনন্দ ছিল, তাঁহারা তাহার শবদেহ লইয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। সকল বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে বা অন্য কারণে ওয়ালটেয়ারে ছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ আসিলেন। বিদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে যত সাহায্য করে—যত সহানুভূতি করে—স্বদেশে তত করে না। যে স্থানে অন্য সম্বন্ধ ও তাহার আনুসঙ্গিক স্বার্থবিদ্বেষাদি থাকে না, সে স্থানে মানুষে মানুষে সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ আত্মপ্রকাশ করে।

শব সমুদ্রতীরে সংস্থাপিত হইল। চিতা রচিত হইতে লাগিল। নবোদিত রবির কিরণ সেই মরণাহতার প্রশান্ত কোমল মুখে পতিত হইল। শিবচন্দ্র শবের পার্শ্বে বসিয়া অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, "মা, আমার বড় আশা ছিল, তোদের সুখী দেখিয়া সুখে মরিব। মা, তুই আমার সামান্য কষ্ট সহিতে পারিতিস্ না। আজ সব ভুলিয়াছিস্?"

নবীনচন্দ্র ও সতীশ উভয়ে নীরব। উভয়েই রুদ্ধমুখ আগ্নেয় গিরির মত অন্তরস্থিত বহ্নিজ্বালায় দগ্ধ—দারুণ শোক হৃদয় দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।

শবদেহ সমুদ্রকূলে স্থাপিত হইয়াছিল। ঊর্ম্মিমালা অদূরে বেলায় লুটাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। শিবচন্দ্র শবের পার্শ্বে

সহসা অন্য তরঙ্গের আঘাততাড়িত একটি তরঙ্গ আবর্ত্তিত হইয়া তীরে আসিয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত সলিলে কমলের শবদেহ ও শিবচন্দ্রের শরীর সিক্ত হইয়া গেল। শিবচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। কমল সমুদ্রে স্নান করিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা মাতাপুত্রে একদিন স্নান করিব" তাঁহার অশ্রু দ্বিগুণ বহিতে লাগিল।

চিতাশয়ন প্রস্তুত হইল। মরণাহতা কমলের দেহ তাহার উপর সংস্থাপিত হইল। চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। শিবচন্দ্রের অধীরতা দেখিয়া নবীনচন্দ্রের নির্দ্দেশমত তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেথায় তিনটি স্নেহশীলা রমণীর শোকদীর্ণ হৃদয় হইতে অতি গভীর আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল।

চিতানল নির্ব্বাপিত হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়ের সকল সুখের আশা সেই চিতানলে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। নবীনচন্দ্রের পক্ষে জগৎ শূন্য,—জীবন যাতনার ভার মাত্র। হায়! যে জীবনের সুখ হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—তাহাকে ছাড়িয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হয়; জীবন যখন যাতনামাত্র, তখনও জীবন ধারণ করিতে হয়। হৃদয় যখন ভস্মসাৎ হইয়া যায়, জীবন তখনও যায় না কেন?

নবীনচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। সতীশ সঙ্গে নাই। নবীনচন্দ্রের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। যে ভৃত্য ধূলগ্রাম হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, সে গৃহদ্বারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জামাই বাবু কোথায়?"

নবীনচন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতীশ ফিরে নাই?"

দ

ভৃত্য বলিল, "না।"

নবীনচন্দ্র আর রোদনধ্বনিধ্বনিত গৃহে প্রবেশ করিলেন না; ফিরিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলিলেন। তখন হৃদয় বেদনার আতিশয্যে একান্ত কাতর;—নয়ন শুষ্ক।

ভৃত্য সঙ্গে আসিতেছিল। নবীনচন্দ্র নিবারণ করিলেন।

যে স্থানে চিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরে সৈকতোপরি শিলাখণ্ডের পশ্চাতে সতীশ বসিয়াছিল। শিলার উপর যুক্ত বাহুযুগল স্থাপিত করিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া সতীশ দুর্দ্দম বেদনায় রোদন করিতেছিল। সম্মুখে সাগর বিলাপ করিয়া ফিরিতেছিল, পশ্চাতে পবনের আর্ত্তস্বর। নবীনচন্দ্র দেখিলেন। তিনি সতীশের পার্শ্বে বসিলেন। শোকের আতিশয্য হেতু এতক্ষণ নয়নে সান্ত্বনাসলিল দেখা দেয় নাই। এখন—সহানুভূতির সংস্পর্শে অশ্রু প্রবাহিত হইল। মেঘ আপনার হৃদয়ে বাষ্প ধারণ করিয়া রাখে; শীতলপবনস্পর্শে তাহা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়।

উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণ কাঁদিলেন,—কেহ জানিতে পারিলেন না। তখন কাহারও সময়ের পরিমাণ বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন উভয়েরই হৃদয়ে কেবল শোক;—অন্য চিন্তার স্থান নাই। উভয়েই বাহ্যজ্ঞানহত।

ভৃত্য যখন সঙ্গে আসিতেছিল, তখন নবীনচন্দ্র তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরাতন ভৃত্য ভৃত্যমাত্র নহে। সে ক্রমে প্রভু-পরিবারের অঙ্গীভূত হয়; সেই পরিবারের সুখ-

দুঃখ আপনার সুখদুঃখ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। তাই নবীনচন্দ্র সতীশের সন্ধানে যাইলে যখন তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, তখন ভৃত্য চিন্তিত হইল,—শঙ্কিত হইল। সকলকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া অমল বারান্দায় তাহার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিল। ভৃত্য তাহাকে বক্ষে লইয়া নবীনচন্দ্রের ও সতীশ-চন্দ্রের সন্ধানে চলিল।

ভৃত্য আসিয়া দেখিল, সতীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই ক্রন্দন করিতেছেন। কেহই তাহার আগমনের বিষয় জানিতে পারিলেন না অমল বহুক্ষণ পিতাকে ও মাতামহকে দেখে নাই;—দেখিয়া আনন্দিত হইল; ভৃত্যের বক্ষ হইতে নামিয়া তাঁহাদিগের নিকট ছুটিয়া চলিল. কিন্তু তাঁহাদিগকে বিহ্বলভাবে রোদন করিতে দেখিয়া শিশু অর্দ্ধপথে থমকিয়া দাঁড়াইল; একবার বিস্মিতনয়নে ভৃত্যের দিকে চাহিল। শিশু যেন মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল। তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল; মুখ গম্ভীর হইল। সে যাইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল,—"বাবা!"

পরিচিত আহ্বানে সতীশ মুখ তুলিল; পুত্রকে বক্ষে লইয়া অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল। পুত্রও কাঁদিতে লাগিল। শিশু ভালবাসার পাত্রকে কাঁদিতে দেখিলে কাঁদে,—কারণ সন্ধান করে না। পুত্রের অধীরতা সতীশচন্দ্রের অধীরতা-নিবারণের কারণ হইল। পুত্রের আকুল রোদনে পিতৃহৃদয় ব্যথিত হইল। সতীশ পুত্রের অশ্রুধারা মুছাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার আপনার অশ্রু বহিতে লাগিল।

সতীশ মুখ তুলিল। নবীনচন্দ্র কাঁদিতেছিলেন। পরস্পর পরস্পরের মুখে একই দারুণ শোকের চিহ্ন লক্ষ্য করিলেন। তখন অধীর ক্রন্দনে উভয়েরই শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস শান্ত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র বলিলেন, "চল, যাই।"

পুত্রকে লইয়া সতীশ উঠিল। সতীশ পুত্রকে বক্ষে লইয়া,—নবীনচন্দ্র শূন্যবক্ষে, আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে সকলেই তখনও একান্ত অধীর; শিবচন্দ্র অশান্ত। কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবে? নবীনচন্দ্র ও সতীশ তখন শান্ত। উভয়ে বুঝিয়াছেন, এ শোকের অংশ হয় না,—এ শোকের হ্রাস হইতে পারে না,—এ শোকবহ্নি মৃত্যু পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া দারুণ জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। সে দহন প্রশমিত হইবে না,—সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

* * * * * * * *

সব ফুরাইল। শঙ্কাদুঃসহ দিবস,—নিদ্রাহীন নিশা,—অজস্র যত্ন,—অক্লান্ত শুশ্রূষা,—আকুল উদ্বেগ,—অনন্ত ভালবাসা সবই বিফল হইল। এখন আবার সুখহীন জীবনের ভার বহিয়া আনন্দহীন গৃহে ফিরিতে হইবে; আবার তেমনই জীবনের সহস্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে,—হৃদয়ে বিষম শেল ধারণ করিয়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। আবার ফিরিতে হইবে। যে গৃহে তাহার শত স্মৃতি—শত চিহ্ন, সেই গৃহে ফিরিতে হইবে।

সপ্তাহ পরে যাত্রার আয়োজন হইল।

সতীশ টেলিগ্রাফের 'ফরম্' লইয়া লিখিতেছিল। শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় সংবাদ পাঠাইতেছ?"

সতীশ বলিল, "প্রভাতকে।"

শিবচন্দ্রের মুখে যাতনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সতীশ বলিল, "বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবে।"

"কোথায়?"

"কলিকাতায় বাসা রহিয়াছে। ছাড়িয়া আসা হয় নাই।"

"তাহাতে প্রয়োজন কি?"

"যাইয়া বাসায় উঠিবেন; পরে বাড়ী যাইতে হইবে।"

"বাসায় উঠিব না; বরাবর বাড়ী যাইব।"

"ষ্টেশনে প্রায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। কষ্ট হইবে।"

শিবচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "কষ্ট! ভগবান কষ্টের শিক্ষা যথেষ্ট দিয়াছেন;—সে কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছেন।"

তিনি সতীশচন্দ্রের লিখিত 'ফরম্' লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে বারান্দায় চলিয়া যাইলেন। সতীশেরও নয়ন হইতে দুই ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া কাগজে পড়িল।

সতীশ নবীনচন্দ্রের দিকে চাহিল। নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দাদা যাহা বলেন, তাহাই কর।" কমলের মৃত্যুদিন হইতে

শিবচন্দ্র যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এ সময় তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারিবেন না। সতীশও তাহা বুঝিল। প্রভাতকে আর কোনও সংবাদ দেওয়া হইল না।

ইহার পর দিবস সেই সমুদ্রসৈকতে সুখরাশি ভস্মীভূত করিয়া সকলে শূন্যহৃদয়ে শূন্য গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অতর্কিত বিপদ।

খিদিরপুরে বন্ধুগৃহে প্রভাতের নিমন্ত্রণ ছিল। সে দিন নানা স্থানে পূজার নিমন্ত্রণ। স্বয়ং কৃষ্ণনাথ এক স্থানে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র আর কয় স্থানে যাইবেন। জ্যেষ্ঠ প্রভাতকে বলিলেন, "তুমি বগী গাড়ীতে নূতন ঘোড়া লইয়া যাইও। বাবা বড় যুড়ি লইয়া যাইবেন। আর সব ঘোড়া এক একবার খাটিয়াছে; অত দূর যাইতে পারিবে না।" সে অশ্বটি বহুমূল্যে অল্প দিন ক্রীত, তেজে ভরা, দ্রুতগতি, সুন্দর।

যথাকালে প্রভাত সহিসকে গাড়ী আনিতে বলিল। প্রভাত স্বয়ং অশ্বচালনে বিশেষ পটু ছিল না। সহিস জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাইবেন?"

প্রভাত বলিল, "হাঁ।"

"হুজুর ঘোড়া নূতন। কয় দিন খাটান হয় নাই। দুষ্টামী করিতে পারে।"

প্রভাত আদেশ করিল, "গাড়ী লইয়া আয়।"

সহিস গাড়ী আনিতে গেল; গাড়ী সাজাইয়া আনিয়া বলিল, "বাতি নাই। সরকারবাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন।" প্রভাত বলিল, "হয় ত বেলা থাকিতেই ফিরিব। না হয়, পথে লইবে।"

প্রভাত গাড়ীতে উঠিল। তেজস্বী অশ্ব বেগে বাহির হইল। প্রভাত আশা করিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে পারিবে।

গৃহে তাহার কায ছিল। কিন্তু তাহ হইয়া উঠিল না। তাহার বাহির হইতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল।

প্রভাত গাড়ীতে উঠিলে সহিস পুনরায় বলিল, "হুজুর, বাতি নাই।"

প্রভাত বলিল, "আচ্ছা। মাঠ ছাড়াইয়া সহরে যাইয়া কিনিয়া লইবে। সহরে পড়িয়াই পাইবে ত?"

"হাঁ, হুজুর।"

সহিস অশ্বের মুখরজ্জু ত্যাগ করিল। চাবুকের আবশ্যক হইল না। অশ্ব দ্রুততরবেগে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

ময়দানে লঘু সুখদ পবনের মধুর স্পর্শ। অশ্ব তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। প্রভাত অশ্বের গতি সংযত করিল না। গাড়ী যে স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থান হইতে অদূরে আর একটি রাস্তা আসিয়া বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। প্রভাত দেখিল, সেই পথ হইতে দুইটি উজ্জ্বল আলোক ঘুরিয়া আসিল;—মুহূর্ত্তমধ্যে সেই আলোকদ্বয় তাহার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইল। তাহার গাড়ী যেন দারুণ ভূকম্পনে কম্পিত হইল; তাহার 'পর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষুর নিমেষে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। অপর যানের আরোহী লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিল। সে গাড়ীর অশ্বদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী 'বোম' প্রভাতের অশ্বের বক্ষে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আরোহীর সঙ্গে সঙ্গে সহিস দুই জনও লাফাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা গাড়ী ঠেলিয়া পিছাইয়া দিল। মুক্ত ক্ষতমুখে প্রভাতের অশ্বের রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইল। তপ্ত ভূমিতে সেই রক্তধারার পতনের শব্দ শ্রুতিগোচর

হইতে লাগিল,—তৃষিত ভূমিতে তরল ধারার শোষণশব্দ শুনা গেল।

প্রভাত যেন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়াছিল; এক্ষণে গাড়ী হইতে নামিল; নিষ্ফল চেষ্টার উন্মত্ত আবেগে অশ্বের ক্ষতমুখে করতল সংস্থাপিত করিয়া শোণিতপ্রবাহ নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইল। বৃথা চেষ্টা! ফলে কেবল অশ্বের ধূসর অঙ্গ ও তাহার অমলশ্বেত বসন রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। প্রভাত হস্ত সরাইয়া লইল। ক্ষতমুখে অশ্বের জীবনস্রোতঃ বাহিত হইয়া যাইতে লাগিল।

অপর যানের আরোহী য়ুরোপীয়। সে বলিল, "বাবু—যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু দোষ আমার নহে। আপনার যানে আলোক ছিল না।"

প্রভাত কোনও উত্তর দিল না।

য়ুরোপীয় সহিসদিগের সাহায্যে অশ্বকে যান হইতে মুক্ত করিয়া দিল,—গাড়ী সরাইয়া লইল। অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর নিঃশেষ জীবনীশক্তি হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

সহিস প্রভাতকে বলিল, "হুজুর বাড়ীতে সংবাদ দিতে যাইব?"

প্রভাত কি ভাবিতেছিল, উত্তর দিল না।

সহিস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

প্রভাত বলিল, "যাও।"

য়ুরোপীয় বলিল, "বাড়ী কত দূর?"

সহিত উত্তর দিল, "বহু দূর।"

"তুমি গাড়ী হাঁকাইতে জান ?"

"না।"

য়ুরোপীয় প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি আপনার কাছে থাকিব ?"

প্রভাত বলিল,—"অনাবশ্যক।"

য়ুরোপীয় পকেট হইতে 'কেস' বাহির করিল; প্রভাতকে আপনার 'কার্ড' দিল; আপনার গাড়ী হইতে একটি লণ্ঠন খুলিয়া প্রভাতের গাড়ীতে বসাইয়া দিল; বলিল, "বাবু, এই লণ্ঠন থাকিল। আমি চলিলাম কল্য প্রভাতে যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম ও ঠিকানা বলিবেন কি ?"

প্রভাত আপনার নাম ও ঠিকানা বলিল। য়ুরোপীয় লণ্ঠনের আলোকে 'পকেট বুকে' লিখিয়া লইল; প্রভাতের সহিসকে বলিল, "আমার সঙ্গে চল; মাঠ পার হইয়া তোমাকে ঠিকাগাড়ী করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইব। তুমি যাইয়া গৃহে সংবাদ দাও।"

সহিস য়ুরোপীয়ের গাড়ীতে উঠিল। য়ুরোপীয় গাড়ী ফিরাইয়া সহরের দিকে চলিল। ক্রমে সে গাড়ীর আলোক অদৃশ্য হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রভাত পথিপার্শ্বে বসিল।

তখন চন্দ্রোদয় হইতেছে। চারি দিকে বৃক্ষরাজি—কলিকাতার শোভার ও স্বাস্থ্যের কেন্দ্র ময়দানকে বেষ্টন করিয়া আছে। দূরে হর্ম্ম্যমালা দৃষ্টিগোচর হয় না;—কেবল বৃক্ষের হরিৎপ্রাচীর। আকাশ কিছু দূর ধূমমলিন;—তদুপরি নীলাম্বর নক্ষত্রখচিত।

পথে দুই একখানি যান গমনাগমন করিতেছে। একখানি যানের অশ্ব পথোপরি শয়ান মৃত অশ্ব দেখিয়া ভীতি প্রকাশ করিল,—চঞ্চল হইল; তাহার পর চালকের কশাঘাতে বেগে চলিয়া গেল।

ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। অশ্বের রক্তে সিক্ত ভূমি কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রালোক অশ্বের তখনও তপ্ত দেহের উপর পতিত হইল। কত ক্ষুদ্র ছিদ্রমুখে অশ্বের জীবনস্রোতঃ বাহির হইয়া গিয়াছে! প্রভাত বসিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবনার অন্ত নাই।

এ দিকে সহিস গৃহে যাইয়া সংবাদ দিল। তখন ছেলেরা ফিরিয়াছে, কৃষ্ণনাথ কেবল ফিরিয়াছেন। গৃহিণী তখন মধ্যম পুত্রের ঘরে ছিলেন। পুত্র তাঁহার ভগিনীর পুত্রের বিবাহে পাকা দেখার নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। গৃহিণী সেই বিষয়ে সংবাদ লইতেছিলেন। এমন সময় সহিস নিম্নের প্রাঙ্গন হইতে ডাকিয়া দুঃসংবাদ দিল।

শুনিয়া পুত্র প্রথমে সহিসকেই দোষী ভাবিলেন। সে সবিশেষ নিবেদন করিল,—বাতির কথা সে পুনঃপুনঃ জামাইবাবুকে বলিয়াছিল; যাইবার সময় বলিয়াছিল, ঘোড়া নূতন, কয় দিন খাটে নাই, চঞ্চল হইয়াছে,—ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে বিনোদবিহারীর মুখ অন্ধকার হইতে লাগিল। অল্প দিন পূর্ব্বে সে-ই সখ করিয়া বাছিয়া অশ্বটি কিনিয়াছিল। গৃহিণী পুত্রের মনোভাব লক্ষ্য করিলেন,—শঙ্কিতা হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন, তাহার পর পুত্রের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

কৃষ্ণনাথ নিমন্ত্রণ রাখিয়া ফিরিয়াছেন; বেশপরিবর্ত্তন করিয়া, —হস্তমুখপ্রক্ষালনান্তে আসিয়া বসিয়াছেন। ভৃত্য তামাকু দিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনাথ আলবোলার নল মুখে দিয়া কেবল টানিয়াছেন, তখনও ধূম বাহির হয় নাই। গৃহিণী ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণনাথ কোনও কথা জিজ্ঞাসার সময় পাইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

কৃষ্ণনাথের হস্ত হইতে নল পড়িয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে ভীতিকম্পিতস্বরে বলিলেন, "কি ?"

"জামাই খিদিরপুর হইতে ফিরিতে পথে এক 'সাহেবে'র গাড়ীর সঙ্গে তাহার গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়াছে।"

"প্রভাত আসিয়াছে ?"

"না। সহিস ভাড়াগাড়ী করিয়া আসিয়াছে। ঘোড়া পড়িয়া গয়াছে। বাছার কি হইয়াছে—কে জানে ?"

"বল কি ?"

"তুমি আপনি যাও।" গৃহিণীর দুই চক্ষুতে জলধারা ঝরিতে লাগিল।

দুর্ব্বলচিত্ত কৃষ্ণনাথ এই কথায় বিচলিত হইলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা করিবার,—সবিশেষ জানিবার কথা মনেই হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছিলেন; গৃহিণীর কথায় যেন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

দক্ষিণপদের চটি বাম পদে ও বাম পদের চটি দক্ষিণ পদে দিয়া, —উত্তরীয় পর্য্যন্ত না লইয়া কৃষ্ণনাথ বাহির হইলেন। যে যানে

সহিস আসিয়াছিল, সে যান দ্বারেই ছিল। কৃষ্ণনাথ তাহাতে উঠিয়া বলিলেন, "হাঁকাও।" চালক একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "যাহা চাহ, পাইবে।"

চালক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইব?"

কৃষ্ণনাথ তাঁহার সহিসকে গাড়ীতে উঠিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "যেখানে ঘোড়া পড়িয়াছে, সেইখানে চল।"

যান চলিল।

যান গন্তব্য স্থানে আসিয়া স্থির হইল। প্রভাত তাহা জানিতে পারিল না; সে চিন্তামগ্ন। কৃষ্ণনাথ ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং যানের দ্বার খুলিয়া অবতরণ করিলেন। তিনি প্রভাতের অতি নিকটে আসিলেও প্রভাত জানিতে পারিল না। তাঁহার আশঙ্কা হইল, প্রভাত আহত। তিনি ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "প্রভাত!"

পরিচিত স্বরে প্রভাত চমকিয়া উঠিল,—উঠিয়া দাঁড়াইল। সে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিল না।

কৃষ্ণনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আঘাত লাগে নাই ত?"

প্রভাত বলিল, "না।"

কৃষ্ণনাথের অশান্ত হৃদয় শান্ত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও নাই; আমরা কত দুর্ভাবনা করিতেছিলাম! শীঘ্র গাড়ীতে উঠ। তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন।"

কৃষ্ণনাথ সহিসকে বলিলেন, "তুমি এখানে থাক। আমি

থানায় সংবাদ দিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি। বাড়ী যাইয়া আর একটি ঘোড়া পাঠাইয়া দিব ;—গাড়ী লইয়া যাইবে।"

তিনি প্রভাতকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

সমস্ত পথ প্রভাত মুখ তুলিতে পারিল না,—কোনও কথা কহিল না। সে কেবল ভাবিতে লাগিল ;—সে চিন্তা অন্তহীন।

প্রভাত অপরাধীর মত গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহিণী ব্যগ্রভাবে আসিয়া সাগ্রহে তাহার কুশল প্রশ্ন করিলেন

গৃহে মধ্যম শ্যালকের মুখভাব দেখিয়া প্রভাত বুঝিল, বারুদের স্তূপ সঞ্চিত হইয়া আছে,—অগ্নিকণার স্পর্শমাত্রে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে। সে আরও বুঝিল, শাশুড়ীর সতর্কতায় কেবল সে অগ্নি আত্মপ্রকাশ করিতেছে না। তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন,—তাই কৃষ্ণনাথ স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন।

প্রভাত ভাবিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুঃসংবাদ।

একটি দুর্ঘটনা ঘটিলে হৃদয়ে অন্য দুর্ঘটনার আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। বর্ষার মেঘে একবার বর্ষণ আরব্ধ হইলে—তখন পুনরায় বর্ষণের সম্ভাবনা জন্মে। গাড়ীর দুর্ঘটনায় প্রভাতের হৃদয় চিন্তাকুল হইল। সে কয় দিন ওয়ালটেয়ারের সংবাদ পায় নাই,—দুইখানি পত্র লিখিয়াও উত্তর পায় নাই। সহসা যে পীড়া বাড়িয়া সব শেষ হইয়া যাইবে—এ সম্ভাবনার কথা তাহার মনে উদিত হয় নাই। আজ তাহার মনে হইল,—কয় দিন সংবাদ নাই কেন? রাত্রিকালে সে অনিদ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। ভগিনীর সেই রোগশীর্ণ মুখের ছবি সে যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, সে যখন চলিয়া আইসে, তখনও কমল বলিয়াছিল, "না, দাদা, তুমি যাইতে পাইবে না।" সেই স্নেহের অধিকারে বিশ্বাস হেতু আবদারের স্বর যেন তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রভাত উঠিয়া বসিল,—ভাবিতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে পুত্রের ক্রন্দনে শোভার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে দেখিল, প্রভাত বসিয়া ভাবিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "জাগিয়া বসিয়া আছ যে?"

প্রভাত বলিল, "কয় দিন ওয়ালটেয়ারের কোনও সংবাদ পাই নাই। তাই ভাবিতেছি।"

নাগপাশ।

"পত্র লিখ নাই ?"

"লিখিয়াছি, উত্তর পাই নাই।"

"সে কি ? কোনও সংবাদ নাই ?"

"কল্য প্রভাতে টেলিগ্রাফ করিব। আমি একবার যাইব। মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।"

"ঠাকুরঝি আমাকেও যাইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে আমি যাইব।"

প্রভাত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনায় ভাবনা কেবল বাড়িতে লাগিল; মন ক্রমে অধিক অস্থির হইতে লাগিল।

ক্রমে নিশাবসান হইল। প্রভাত চাহিয়া দেখিল, ঈষন্মুক্ত বাতায়নপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে। শোভাকে জাগাইয়া দিয়া সে বাহিরে গেল। রাত্রিজাগরণে ও দুশ্চিন্তায় তাহার মস্তকে বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল।

প্রভাত ওয়ালটেয়ারে সতীশচন্দ্রের নামে টেলিগ্রাফ করিল; তাহার পর যথাকালে আফিসে চলিয়া গেল। কাজের ভিড়ে ছুটীর সময়ও কয় জন কর্ম্মচারীকে আফিস করিতে হইতেছিল। আফিসে যাইয়া প্রভাত দেখিল, কিছুই ভাল লাগে না; কাযে মন বসে না। একটা হিসাব করিতে যাইয়া সে দুইবার ভুল করিল; তাহার পর হিসাব রাখিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে শরীর অসুস্থ বলিয়া বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে জানাইয়া বাড়ী ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া প্রভাত প্রথমেই সংবাদ লইল, টেলিগ্রাম আসিয়াছে কি না। টেলিগ্রাম আইসে নাই। তাহার মন আরও চঞ্চল

হইল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে সংবাদপত্র লইয়া বসিল; ভাল লাগিল না। শচীকে আনিতে ভৃত্যকে পাঠাইল,—সে ঘুমাইয়াছে। শেষে প্রভাত উঠিয়া বারান্দায় আসিল। এক পার্শ্বে একটা বিলম্বিত পরগাছায় ফুল ফুটিয়াছে; প্রভাত সেই দিকে গেল; ফুল দেখিতে লাগিল।

সম্মুখের ছাত্রাবাসে তখনও ধূলগ্রাম অঞ্চলের ছেলেরা থাকে। এক জন সেই দিন গ্রাম হইতে আসিয়াছে; শিবচন্দ্র প্রভৃতিকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে প্রভাতকে দেখিয়া ভাবিল,—"যাই, শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসি।"

সে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দায় কতকগুলি বেত্রনির্ম্মিত চেয়ার ছিল। প্রভাত তাহাকে একখানিতে বসিতে বলিল, আপনি আর একখানিতে বসিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি?"

সে বলিল, "আমি আজ ধূলগ্রাম হইতে আসিতেছি।"

"বাড়ীর সব ভাল?"

যুবক ভাবিল, প্রভাত তাহার নিজপরিবারের সকলের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে। প্রভাত যে দুর্ঘটনার সংবাদ পায় নাই, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে? সে বলিল, নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন।"

প্রভাত বলিল, "সব ভাল আছে?"

"হাঁ। কেন জ্যেঠামহাশয় বাড়ী পৌঁছিয়া এ কয় দিন কি আপনাকে পত্র লিখেন নাই?" যুবক শিবচন্দ্রকে 'জ্যেঠামহাশয়' বলিত।

শুনিয়া প্রভাত চমকিয়া উঠিল। শিবচন্দ্র গৃহে ফিরিয়াছেন! সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সতীশ?"

"তিনি এখনও আপনাদের গৃহে। জ্যেঠামহাশয়ই শোকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধীর হইয়াছেন। বোধ হয়, সেই জন্যই পত্র লিখিতে পারেন নাই। কাকা ও সতীশবাবু——"

প্রভাত আর সে কথা শুনিতেছিল না। সে দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া বালকের মত রোদন করিতেছিল। তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

সংবাদ পাইয়া প্রভাতের জ্যেষ্ঠ শ্যালক তাহার নিকটে আসিলেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভাত একান্ত অধীর হইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। কেহ তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তাহার দুঃখ কেবল শোক নহে, তাহাতে শোক ও আত্মগ্লানি মিশ্রিত। হায়! তাহার সেই একমাত্র ভগিনী, অজস্র যত্নের, অসীম স্নেহের কমল আর নাই! সে গৃহে যাইলে আর "দাদা" বলিয়া কেহ ছুটিয়া আসিবে না! কমল আর সাগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে না! কমল আর নাই! এখন সেই পরিচিত গৃহে আর সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইবে না! সে আর নাই!—কমল মৃতা!

মানবহৃদয়ে কতকগুলি তন্ত্রী আছে,—তাহারা অতর্কিত ঘটনার আঘাত ব্যতীত ধ্বনিত হয় না। তাহারা সাগ্রহে দত্ত আঘাতে নিঃশব্দ রহে, কিন্তু অতর্কিত ঘটনার স্পর্শমাত্রে করুণস্বরে সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে। আজ প্রভাতের তাহাই হইল। আজ সুপ্তি-

গহ্বর শূন্য করিয়া শত স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিল। সে স্মৃতিতে কেবল যাতনা।

আজ তাহার গৃহ শোকমগ্ন। কিন্তু সে তথায় নাই। প্রভাত আপনাকে ধিক্কার দিল। হায়! মৃত্যুকালেও সে যদি কমলের কাছে থাকিত! তবে হয় ত এ দুঃখেও কিছু শান্তি পাইত। কিন্তু দোষ কাহার? কমল তাহাকে আসিবার সময়ও বলিয়াছিল, "না, দাদা, তুমি যাইতে পাইবে না।" সে কেন আসিয়াছিল? কেন সে কমলের কথা রাখে নাই?

এই দারুণ শোকে প্রভাত শোভার নিকট সহানুভূতি পাইল। কমলের স্নেহ শোভার হৃদয় জয় করিয়াছিল। তাহার মধুর স্বভাবে শোভা মুগ্ধা হইয়াছিল।

কাঁদিয়া একটু শান্ত হইবার পর প্রভাতের প্রথম ইচ্ছা হইল,—শোকার্ত্ত স্বজনগণের নিকটে যাইবে,—সমশোককাতরদিগের সহিত এক সঙ্গে কাঁদিবে। শোক তাহার হৃদয়ের মলিনতা ধৌত করিয়াছিল,—এখন স্বভাবদত্ত আকর্ষণকে প্রবল করিয়া তুলিল।

প্রভাত শোভাকে সে কথা বলিল। শোভা তাহার মতে মত দিল।

পর দিন শোভা স্বয়ং স্বামীর ব্যাগে আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিল; প্রভাত রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী যাইবে।

অপরাহ্নে শোভা স্বামীর ব্যাগে কয়টা দ্রব্য দিতেছিল। প্রভাত নিকটে বসিয়াছিল। এমন সময় নিম্নে গোলমাল শুনা গেল। অল্পক্ষণ পরেই সোপানে পদধ্বনি শুনিয়া বোধ হইল, যেন

কয় জনে কোনও দ্রব্য তুলিয়া আনিতেছে। তাহার পর গৃহিণীর বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতে না হইতে শোভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনা গেল, "এ ঘরে ভিড় করিও না। পাখা কয়।" শুনিয়া শোভা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

প্রভাত বসিয়া রহিল। শোভা অল্পক্ষণে ফিরিল না। প্রভাত শুনিল, বিনোদবিহারী বলিল, "তিনি বাড়ী না থাকেন, যে ডাক্তারকে পাও, ডাকিয়া আন।" নলিনবিহারীর শয়নকক্ষ হইতে শব্দ আসিতেছিল। প্রভাত সেই দিকে গেল।

কক্ষ পূর্ণ। বধূরা কক্ষদ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রভাত দেখিল, সংজ্ঞাহীন নলিনবিহারীর দেহ শয্যায় শায়িত। কৃষ্ণনাথ হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছেন। গৃহিণী নলিনীবিহারীর মস্তক জলসিক্ত করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যজন করিতেছেন। বিনোদবিহারী জলে অ-ডি-কলোন মিশাইতেছে। ভৃত্যবর্গ অনাবশ্যক জনতা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কক্ষের দুইটি বাতায়ন রুদ্ধ ছিল। প্রভাত সে দুইটি মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ভৃত্যদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিল।

আফিসে কায করিতে করিতে নলিনবিহারী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কোনরূপে তাহার সংজ্ঞাসঞ্চার করাইয়া কৃষ্ণনাথ তাহাকে গৃহে আনিতেছিলেন। পথে, যানে—তাহার পুনরায় সংজ্ঞালোপ হইয়াছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন নলিনবিহারীর সংজ্ঞাসঞ্চার হইয়াছে; সে যেন দীর্ঘ-নিদ্রাবসানে নয়ন মেলিতেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিলেন, দেহের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "অসুখ কয় দিন হইয়াছে?"

কৃষ্ণনাথ উত্তর করিলেন, "আজ আফিসে কায করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।"

"কেবল আজ?"

"হাঁ।"

চিকিৎসক নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এ বিষম দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও যে রোগী আফিসে কায করিতে পারে, চিকিৎসক সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। যাহা হউক, যথারীতি কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিদায় লইলেন; বলিয়া যাইলেন,—রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক।

সে দিন আর প্রভাতের যাওয়া ঘটিল না।

পর দিন চিন্তা আসিল। তখন শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত। তাহার একমাত্র ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ সে পায় নাই;—সংবাদ পাইবারও যথোচিত চেষ্টা করে নাই। যখন গৃহে সকলে শোকে অভিভূত,—তখন সে দূরে। সে কেমন করিয়া গৃহে মুখ দেখাইবে? তাহার পর সংবাদ পাইয়াও ঘটনাচক্রে তাহার গমনে বিলম্ব ঘটিল। পিতা যে যাইবার সময় তাহাকে সংবাদও দেন নাই, সে কি কেবল তাহার নিকট হইতে দুঃসংবাদ গোপন রাখিবার জন্য? সে ছাড়া তাঁহাদের আর কি অবলম্বন আছে; কে আছে? সেই একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশোকে কাতর, স্নেহশীল পিতৃব্য!

তাঁহার কি যন্ত্রণা! সেই স্নেহশীলা পিসীমা,—জননী! সে কেমন করিয়া তাঁহাদের কাছে মুখ দেখাইবে?

শোভা জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ যাইবে কি?"

প্রভাত বলিল, "না।"

শোভা বিস্মিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল. "কেন?".

"তাই ভাবিতেছি।"

শোভা আরও বিস্মিতা হইল। প্রভাত ভাবিতে লাগিল।

পর দিন প্রভাত পিতার পত্র পাইল;—"কলিকাতায় আমাদের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান মাসের ভাড়া দেওয়া আছে; সে বাড়ী আর আবশ্যক নাই। তাহা যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়।"

পত্রের মৌন তিরস্কার প্রভাতের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাহার বোধ হইল, পিতার সহস্র তিরস্কারেও এরূপ তীব্রতা থাকিতে পারিত না। পিতা যেন তাহাকে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া,—পিতৃহৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, পর করিয়া দিয়াছেন। পত্রের প্রত্যেক শব্দ যেন পিতার সমস্তহৃদয়নিষ্পেষণ-লব্ধ অতি তীব্র তিরস্কাররসে লিখিত। সেই পরিচিত হস্তের প্রত্যেক অক্ষর যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

সেই পত্র পাঠ করিয়া প্রভাত কাঁদিল। সে বুঝিল, তাহার সকল বেদনা তাহার আপনার কর্ম্মের ফল।

সে দিন প্রভাতের ভাব দেখিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

প্রভাত বলিল, "না।"

নিশীথে জাগিয়া শোভা দেখিল, প্রভাত কাঁদিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি বাড়ীর পত্র পাইয়াছ ?"

প্রভাত বলিল, "পাইয়াছি।"

শোভা ভাবিল, তাহাতেই প্রভাতের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন প্রভাতের নিকট তাহা ক্লেশদায়ক বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চক্ষু ফুটিল।

যে প্রবল মানসিক বলে নলিনবিহারী শারীরিক দৌর্ব্বল্য জয় করিয়াছিল, তাহার আপনার হৃদয় জয় করিতে তদপেক্ষা প্রবলতর মানসিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল। কল্পনাসলিলসেচনে সুপুষ্ট,—আশালোকে বিবিধ বর্ণের রমণীয় কুসুমে শোভিত, চিরপ্রিয় আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইয়াছিল। তাহার শত মূল তখন তাহার হৃদয়কে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াছিল; তাই হৃদয় শতধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। স্বহস্তপ্রদীপ্ত আশালোক নির্ব্বাপিত করিয়া, প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিয়া, জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য সব ত্যাগ করিয়া সে নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছিল। শ্রান্ত চরণের বল পরীক্ষা না করিয়া সে ভ্রান্ত কর্ত্তব্যের পথে পথিক হইয়াছিল। চপলার সুখের আলেয়ার আলোক লাভ করিবার জন্য সে সব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, চপলাকে সুখী করিতে পারিবে,—তাহাই সুখ। কিন্তু ভগ্ন শরীরে সহিল না। মানসিক অবসাদে দেহের অবসাদ বর্দ্ধিত হইল—ভগ্নস্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরীর যে ক্রমে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—ক্রমে কার্য্য-পরিচালনও অসম্ভব হইয়া আসিতেছিল, নলিনবিহারী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আসন্ন বিপদের ছায়া দেখিয়াছিল;—কিন্তু বিরত হয় নাই। দৌর্ব্বল্য দিন দিন বাড়িতেছিল;—সঙ্গে

সঙ্গে মস্তকের যন্ত্রণাও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। তবু সে বিরত হইল না। ক্রমে রক্তহীন, শীর্ণ, আনন পাণ্ডুর হইয়া আসিল। শেষে এক দিন আফিসে কায করিতে করিতে মস্তকের যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া উঠিল,—চক্ষুর সম্মুখে দিবসের আলোক নিবিয়া গেল,—নলিনবিহারী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে ঔষধপথ্যের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও দৌর্ব্বল্য আর প্রশমিত হইল না। প্রথম কয় দিন নলিনবিহারী শয্যা ত্যাগ করিতে পারিল না। ফলে অবসর বাড়িল; সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বাড়িল,—এ অসুখ কেন? কেন চপলা এরূপ ব্যবহার করে?

নলিনবিহারী যতই লক্ষ্য করিতে লাগিল, ততই ভাবিতে লাগিল; ততই ব্যথিত হইতে লাগিল। চপলার ব্যবহারে সে পদে পদে আহত হইতে লাগিল। চপলার হৃদয়ে যে তাহার প্রতি প্রেম নাই, তাহার ব্যবহারে সেই সন্দেহ নলিনবিহারীর মনে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। হায়!—সে সন্দেহে কেবল যাতনা,—কেবল কষ্ট!

মানুষ যাহাকে রত্ন-জ্ঞানে বহু দিন যত্নে রক্ষা করিয়াছে, সহসা তাহাকে আবার কাচখণ্ডমাত্র বলিয়া সন্দেহ হইলে, সে তাহাকে শতবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করে,—আপনাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হয়। নলিনবিহারীরও তাহাই হইল। আপনার প্রেমের প্রতিফলিত বর্ণে সে পূর্ব্বে চপলার ব্যবহার প্রেমরঞ্জিত বোধ করিয়াছে—সেই বিশ্বাসে সুখ পাইয়াছে। ক্রমে সে বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। এখন যখন সে বিশ্বাসে

সন্দেহ হইল, তখন সে শতবার শতরূপে চপলার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিল। উদ্দেশ্য,—আপনাকে ভ্রান্ত সপ্রমাণ করিবে—সন্দেহ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই পদদলিত করিবে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে সন্দেহ দূর হওয়া দূরে থাকুক, কেবল বাড়িতেই লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল।

মানসিক যন্ত্রণার ফলে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে এক মাস কাটিয়া গেল। নলিন বিহারীর শরীর আরও অসুস্থ হইল। আরও এক মাস গেল,—আর কোনরূপ মানসিক শ্রম সহে না।

ডাক্তার মানসিক শ্রম বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। হৃদয় দুর্ব্বল,—মস্তিষ্ক আরও দুর্ব্বল,—শরীর নিস্তেজ। কিছুক্ষণ কোনও বিষয়ের আলোচনা করিলে শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত হয়; কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিলে শ্রান্তি বোধ হয়; সংবাদপত্র-খানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। নলিন-বিহারীর আপনার মনে হইল, সে তিলে তিলে মরিতেছে; তাহার যশোহীন, সুখহীন, কর্ম্মহীন জীবনের অবসানকাল আসন্ন। তাহার ব্যর্থ জীবনে কোনও কায হইল না; জীবন বৃথায় গেল। এইরূপ চিন্তা তাহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর। মানসিকশক্তিহীন হইয়া জীবনধারণ সে সর্ব্বযন্ত্রণার আকর বলিয়া বিবেচনা করিত। আজ সে স্বয়ং সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হায়! জীবন-দীপ কেন ফুৎকারে নিবিয়া যায় না? তাহা হইলে ত সব যন্ত্রণার অবসান হয়! হৃদয় দুর্ব্বল; কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি অব্যাহত, তাই সে আপনি

আপনার জীবন শেষ করিবার কল্পনা মনে উদিত হইলেই পরিহার করিত। ভাবিত, যদি মানবহৃদয়ে বিবেকবুদ্ধি না থাকিত; যদি হৃদয়ে পরলোকের ছায়াপাত না হইত; যদি ইহলোকেই সব শেষ হইত! কিন্তু তাহা হইবার নহে। তাই নলিনবিহারীর নিস্তেজ জীবনে যন্ত্রণার দাহন কেবল বাড়িতে লাগিল। যে সামান্য চেষ্টায় সে জ্বালার অবসান হইত—তাহা করিতে পারিল না—পারিবে না।

শিরঃপীড়ায় সহসা কোনও আশঙ্কার কারণ নাই—গৃহে সকলে এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। গৃহে সকল কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। কেবল কৃষ্ণনাথের হৃদয়ে অসুখের ছায়া কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। অসুস্থ পুত্রের জন্য গৃহিণীর চিত্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়াছিল। এখন সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। গৃহে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিলেন, রোগ সারিবার নহে;—সে আশা নাই। এখন যথাসাধ্য যত্নে শরীর রাখিতে হইবে, জীর্ণদেহে জীবনীশক্তি-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই মাত্র। মধ্যে মধ্যে সামান্য উত্তেজনায়, বা অমনই মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ প্রথমে সমুদ্রযাত্রার কথা বলিয়াছিলেন। তখন তাহা হইয়া উঠে নাই। এখন কৃষ্ণনাথ আর দ্বিধা করিলেন না। কিন্তু চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সে ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থার জন্য নহে;—যদি সমুদ্রে বিবমিষা উপস্থিত হয়, তবে শরীরে সহিবে না। সুতরাং সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। রোগীকে স্থানান্তরিত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু

শীতাগমে কলিকাতার ধূলিধূমময় পবনও ত্যজ্য। শেষে স্থির হইল, নিকটে—কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। নানা স্থানের বিষয় আলোচিত হইল। ডাক্তারগণ একমত হইতে পারিলেন না ;—একই স্থানে সকল সুবিধা হয় না।

শিশিরকুমার যে স্থানে ছিল, শেষে সেই স্থানের কথা উঠিল। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে সেই স্থানে যাওয়া স্থির হইল। বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য শিশিরকুমারকে পত্র লিখা হইল।

পত্রপ্রাপ্তিমাত্র শিশিরকুমার উত্তর লিখিল,—"আমি বাড়ীর চেষ্টা করিতেছি। আমার নিজের অধিকৃত গৃহ সুবৃহৎ। আমার আপনার জন্য একটিমাত্র ঘর যথেষ্ট। যে কয় দিন বাসা না মিলে, আমার গৃহে থাকিলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

শিশিরকুমার পত্র লিখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। বিশেষ চেষ্টা করিয়া এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিল।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে ট্রেণ কলিকাতায় পৌঁছিল। শিশির-কুমার ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনাথের গৃহে গেল ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা প্রস্তুত ?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ।"

"আমি অপরাহ্ণে আসিব"—বলিয়া শিশিরকুমার বিদায় লইল ; জানিয়া গেল, সে দিনও নলিনবিহারী একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

শিশিরকুমারকে পাইয়া চপলার জননী যেন দুশ্চিন্তায় কিছু

শান্তি পাইলেন ; হৃদয়ের ভার নামাইবার পাত্র পাইলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা তুই, আসিয়াছিস, যাহা ভাল হয়, কর। আমি আর দুর্ভাবনা সহিতে পারি না।" বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

শিশিরকুমার আশ্বাস দিয়া বলিল, "মা, আপনি ভাবিবেন না। আমি আজই নলিনকে লইয়া যাইব। দেখিবেন, অল্প দিনেই সারিয়া উঠিবে।" কিন্তু তাহার আপনার হৃদয়ে তখনও দারুণ আশঙ্কা,—বিষম দুশ্চিন্তা।

চপলা শুনিল, শিশিরকুমার আসিয়াছে। সে গৃহে আসিয়াছিল, তথাপি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই কেন? চপলার চঞ্চল হৃদয়ে চাঞ্চল্য প্রবল হইল। এতদিন বায়ুকোণে মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। আজ ঝড় উঠিল। ঝড় উঠিলে সাগরসলিল শান্ত রাখা অসম্ভব হয় ; তখন বারিরাশি উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যে তীরকে আক্রমণ করে ; আপনি আপনার গতিরোধ করিতে পারে না। মধ্যাহ্নের পরই চপলা পিত্রালয়ে গেল।

চপলার পিতৃগৃহে শিশিরকুমারের দুইটি কক্ষ ছিল। সেগুলি ব্যবহার করিবার অন্য কেহ ছিল না ; কাযেই সে না থাকিলে সে কক্ষ দুইটির দ্বার বদ্ধ থাকিত। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে কক্ষগুলি ঝাড়াইয়া দ্রব্যগুলি গুছাইয়া রাখিতেন। শিশিরকুমার যখনই আসিত—দেখিত, কক্ষদ্বয় যেন তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার প্রতি চপলার জননীর স্নেহ স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত।

একটি কক্ষে শিশিরকুমার 'হোয়াটনট' হইতে একখানি পুস্তক লইয়া পাতা উল্টাইল। পুস্তকখানি সে সযত্নে পাঠ করিয়াছিল; পত্রে পত্রে সে অর্থ প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছে। পুস্তকখানি বন্ধ করিবার সময় সে দেখিতে পাইল, পুস্তকের এক স্থান কীটদষ্ট। সে পত্র উল্টাইয়া ক্ষুদ্র—শ্বেত কীটটি দেখিতে পাইল; পুস্তকখানি বাতায়নে লইয়া গেল—উল্টাইয়া ঝাড়িয়া কীটটি ফেলিয়া দিল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া পুস্তকখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। 'হোয়াটনটে'র সর্ব্বোচ্চ থাকে ফ্রেমে কয়খানি ফটো। বর্ণের গাঢ়তা ও ঔজ্জ্বল্য কমিয়া আসিতেছে। একপার্শ্বে চপলার পিতার চিত্র, ফ্রেমের রৌপ্যের বর্ণ মলিন হইয়াছে। অপরপার্শ্বে চপলার জননীর চিত্র। মধ্যে চপলার চিত্র। তখনও চপলার বিবাহ হয় নাই। আলুলায়িতকুন্তলা চপলা একটি ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডোপরি উপবিষ্টা; —হস্তে এক গুচ্ছ পুষ্প। যে দিন চপলার পিতা ও শিশিরকুমার চপলাকে ফটো তুলাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, সে দিনের কথা শিশিরকুমারের মনে পড়িল। নানাপ্রকারে বসাইয়া শেষে সে এই ভঙ্গিটিই সুন্দর মনে করিয়া ছবি তুলাইয়াছিল।

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া শিশিরকুমার ছবিগুলি ঝাড়িল। চপলার চিত্রখানি রাখিয়া সে মুখ তুলিল;—দেখিল, সম্মুখে দর্পণে চপলার প্রতিবিম্ব—মুখে উদ্বেগভাব, নয়ন দীপ্ত। বিস্মিত হইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—চপলা কক্ষে!

চপলা দেখিয়াছিল, শিশিরকুমার তাহার ছবি ঝাড়িতেছে। আশা কি সামান্য ভিত্তির উপর প্রাসাদ রচনা করে!

শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন আসিলে ?"

চপলা বলিল, "এইমাত্র।"

"এখন আসিলে কেন ?"

"তুমি আসিয়াছ শুনিয়া আসিলাম।"

"আমি ত তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আবার এখনই যাইতেছি। নলিনের শরীর আজ ভাল নাই। তুমি আসিলে কেন ?"

চপলা বলিল, "আমি আর পারি না।"

চপলার এই কথা শিশিরকুমারের হৃদয়ে অতি কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিল। তাহার হৃদয় সহানুভূতিতে সিক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি করিবে, চপলা ? যখন উপায় নাই, তখন সহ্য করিতেই হইবে।"

চপলা দৃষ্টি নত করিয়া হর্ম্ম্যতলে চাহিল,--বলিল, "জীবনে আমার কোন্ আশা পূর্ণ হইয়াছে ?"

শিশিরকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল, "জগতে কয় জনের আশা পূর্ণ হয় ? কর্ত্তব্যসাধনেই মনুষ্যত্ব। তুমি যাও।"

চপলা বলিল, "সেথায় আমি কি সুখ পাইয়াছি ?"

চপলার কথা শুনিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইল ; বলিল, "জীবনে সুখলাভের আশা স্বপ্নমাত্র। তুমি ফিরিয়া যাও। এখন এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।"

চপলা মুহূর্ত্তমাত্র কি ভাবিল ; মুখ তুলিয়া দীপ্তদৃষ্টিতে শিশির-কুমারের দিকে চাহিল ; বলিল,—"হায়—কর্ত্তব্য ! বাতাস মেঘের

গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে যেথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহাকে বারিবর্ষণ করাইতে পারে না। আমি যাইব না। তোমার হৃদয় কি পাষাণ?"

চপলার উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া শিশিরকুমার মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করিল।

চপলা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। শিশিরকুমার সরিয়া গেল,—যেন সে বিষধর দশন-দষ্ট। সে তীব্র তিরস্কারের স্বরে ডাকিল, "চপলা!"—বলিল, "তুমি কি এই শিক্ষা পাইয়াছ? এত উপ-দেশের এই ফল? তুমি কি মানুষ?"

শিশিরকুমার যেন সুরাপানে মত্তের মত কম্পিতপদে বাতায়নে গেল। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল,—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

চপলা চলিয়া গেল।

শিশিরকুমার ভাবিতে লাগিল। তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। হায়! ভ্রান্ত আমরা যাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করি, সেও আমাদেরই মত দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যমাত্র; তাহারও পদে পদে ত্রুটী! দূরে যাহা দিব্য—নিকটে তাহা ধরার ধূলিমাত্র। আমরা কি ভ্রান্ত! ভ্রান্তিবশে কি বিশ্বাস বক্ষে লইয়া প্রতারিত হই! সে বিশ্বাস যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সব শেষ।

কোনও কোনও ব্যবহার হৃদয়ে চিহ্ন রাখিয়া যায়। কোনও কোনও কথা যেন বহুক্ষণ কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকে। আজ শিশিরকুমারের ব্যবহার চপলার হৃদয়ে তেমনই চিহ্ন রাখিয়া গেল; আজ শিশির-কুমারের কথা চপলার কর্ণে তেমনই ধ্বনিত হইতে লাগিল। এক সময় শত কার্য্যে বা সহস্র কথায় যাহা হয় না, আর এক সময় সামান্য আচরণে,—বা দুই চারিটি কথায় তাহা হয়। আজ শিশিরকুমারের আচরণে, তাহার কথায় চপলার নিকট তাহার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হায়!—সে কি করিয়াছে! সুখে, দুঃখে,—বিপদে, সম্পদে—যাহার স্নেহ আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে পারিত, যাহার স্নেহ অব্যাহত জানিয়া নির্ভরের সুখ লাভ করিতে পারিত, সে আজ তাহার ঘৃণামাত্র অর্জ্জন করিয়াছে। সে দুষ্ট আশার মোহে মুগ্ধ হইয়া যে ভ্রান্তপথে পদার্পণ করিয়াছিল —সে পথে আত্মগ্লানি ও অনুতাপ অনিবার্য্য। প্রেমভেষজ ব্যতীত সে জ্বালা জুড়াইবার নহে।

কিন্তু—প্রেমলাভ! তখনই স্বামীর সেই রোগশীর্ণ,—পাণ্ডুর আননের কথা মনে পড়িল। সে ঘৃণায় সে প্রেম, পরিহার করি-য়াছে; স্বেচ্ছাদত্ত প্রেম ত্যাগ করিয়াছে; স্বামীর সরল হৃদয়ে বেদনা দিয়াছে। সে স্বামীকে উপেক্ষা করিয়াছে। রোগযাতনা-জীর্ণ স্বামীর যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। আজ যেন চপলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে আপনার অবস্থা বুঝিল।

কেহ একদিনে আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তাই সদ্বংশসম্ভূতা রমণী যখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করেন। আর কাহাকেও তাহা বুঝাইতে হয় না। আর কেহ সে ভ্রান্তির কথা জানিতে না পারিলেও রমণী আপনি আপনার হৃদয়কে পীড়িত—দলিত করেন।

বিজন কক্ষে বসিয়া চপলা ভাবিতে লাগিল। হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর চপলা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চপলার জননী কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার সন্ধানে দাসী পাঠাইলেন। দাসী এ ঘর ও ঘর দেখিয়া যাইয়া সংবাদ দিল,—চপলা কাঁদিতেছে। শুনিয়া জননী দুহিতার নিকটে আসিলেন। তিনি মনে করিলেন, নলিনবিহারীর পীড়ার আশঙ্কাই দুহিতার ক্রন্দনের কারণ। তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন; কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। বড় আদরের—সেই একমাত্র সন্তানকে যেন দারুণ বেদনায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি আপনি কাঁদিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রী উভয়েরই নয়নে অবিরল অশ্রু বহিতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া চপলা যেন কিছু শান্ত হইল। হৃদয়ে চিন্তার স্থান ছিল না,—এখন হইল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সেই রাত্রিতেই নলিনবিহারীর যাইবার কথা। চপলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি এখনই ফিরিয়া যাইব।"

মা আহারের জন্য জিদ করিলেন। চপলা শুনিল না। সে যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত. শেষে তাহার জননীও তাহার সহিত যাইলেন।

চপলার যান যখন কৃষ্ণনাথের গৃহদ্বারে উপনীত হইল, সেই সময় য়ুরোপীয় চিকিৎসকের যান বাহির হইয়া গেল। চপলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নামিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বড় বধূর কাছে গেল; জিজ্ঞাসা করিল, "বড় দিদি, সংবাদ কি?"

বড়বধূ সংবাদ দিলেন, অপরাহ্নে নলিনবিহারী একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরেই চপলা জানিতে পারিল, সে দিন নলিনবিহারীর যাওয়া হইবে না। ডাক্তার নিষেধ করিয়াছেন;—শরীর ভাল নাই।

চপলা আসিবার বহু পূর্ব্বেই শিশিরকুমার আসিয়াছিল। চপলা যখন তাহার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিল তখন শিশির-কুমারের হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা—দারুণ দুশ্চিন্তা। অল্পক্ষণ চিন্তার ফলে ধীর শিশিরকুমারের চঞ্চল হৃদয় সংযত হইয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের বেদনা অপনীত হয় নাই। তাহার পর সে কৃষ্ণনাথের গৃহে আসিয়াছিল। জগতে কয় জনের আশা পূর্ণ হয়? কর্ত্তব্য-পালনেই মনুষ্যত্ব। সন্ধ্যা অতীত হইলে শিশিরকুমার ফিরিয়া গেল; চপলার জননী তাহার সহিত গৃহে ফিরিলেন।

নলিনবিহারীর স্থানান্তরগমনের প্রস্তাব হইলে সে বলিয়াছিল, পরিবারের কাহারও তাহার সহিত যাইয়া কায নাই; সে সকলকে নিরস্ত করিয়াছিল, কেবল জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পারে নাই। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কনিষ্ঠের সচ্চরিত্রতা,—জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা—এইরূপ নানাগুণের জন্য তিনি বিশেষ গর্ব্বিত ছিলেন;

সে কথা লোককে বলিতেন। নলিনবিহারীও জ্যেষ্ঠকে বড় ভালবাসিত। জ্যেষ্ঠ যখন আসিয়া বলিলেন, "নলিন তুমি নাকি আমাকেও সঙ্গে যাইতে দিবে না?" তখন নলিনবিহারী আর আপত্তি করিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ আর কিছু বলিলেন না; ভাবিলেন, এখন আর পীড়াপীড়ি করিয়া কায নাই, সঙ্গে যাইয়া ক্রমে ভ্রাতার মত করাইয়া আর সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহাই স্থির হইয়াছিল।

সেই রাত্রিতে যাতনাব্যথিতা চপলা স্বামীকে বলিল, "তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

এই কথা শুনিয়া নলিনবিহারীর আহত-প্রেম সঞ্জাত দারুণ অভিমান যেন সঞ্চিত শক্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিল। সে বলিল, "না। আমি জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। এখন এই অন্তিমকালে আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও।"

নলিনবিহারী কখনও পত্নীকে এমন তিরস্কার করে নাই। আজ সহসা যেন কি উত্তেজনায় সে এই কথা বলিল। বলিতে বলিতে তাহার প্রেম তাহার হৃদয়কে শান্ত করিয়া দিল। তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। সে আর্দ্রনয়নে চপলার দিকে চাহিল; বলিল, "চপলা, আমি রূঢ় কথা বলিয়াছি। কিছু মনে করিও না। আমাকে—"

নলিনবিহারী আর বলিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

প্রথমে চপলার মনে হইল, স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতা হইয়া

ক্ষমা ভিক্ষা করে, - আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করে। কিন্তু তখনই মনে হইল, - চিকিৎসক বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,--সাবধান সহসা যেন রোগীর চাঞ্চল্যের কোনও কারণ না ঘটে। সহসা উত্তেজনায় বা চাঞ্চল্যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

চপলা প্রথম বাসনা সংযত করিল বটে, কিন্তু হৃদয় শান্ত করিতে পারিল না। পার্ব্বত্য নদী যখন বিগলিত তুষারজলে বেগবতী হইয়া পর্ব্বতগৃহ হইতে বাহির হয়, তখন প্রবল বাধায় তাহার স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু গতিরোধ হয় না। চপলা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিল।

অলিন্দে অনাচ্ছাদিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া চপলা কাঁদিল। তাহার হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা। সে কতক্ষণ কাঁদিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সহসা কক্ষমধ্যে কাচপাত্র ভাঙ্গিবার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল; উন্মাদিনীর মত কক্ষে প্রবেশ করিল।

চপলা বারান্দায় যাইবার কিছুক্ষণ পরে নলিনবিহারী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিল, - তখনও মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা। নলিনবিহারী ভাবিতে লাগিল;—অতীতের শত চিত্র তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে একে একে উদিত হইতে লাগিল। কত কথা মনে হইতে লাগিল। আবার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আবার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

তাহার পর নলিনবিহারী বিষম তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিল;

তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। নলিনবিহারী চাহিয়া দেখিল, কক্ষে চপলা নাই। সে হয় অবজ্ঞাভরে, নয় তাহার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। চপলা কক্ষে নাই! পূর্ব্বে আর কখনও এমন হয় নাই। রুগ্ন, দুর্ব্বল, পদে পদে অপরের সাহায্য-প্রার্থী তাহাকে ফেলিয়া—একাকী শূন্য কক্ষে রাখিয়া চপলা পূর্ব্বে কখনও যায় নাই। তবে আজ সব শেষ;—আজ আশার শেষ—আকাঙ্ক্ষার শেষ। লাঞ্ছিত প্রেমের চিতানল আজ জ্বলিয়াছে,—সব দগ্ধ হইবে—ভস্ম হইবে।

তৃষ্ণা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। শেষে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া নলিনবিহারী শয্যা হইতে উঠিল। অদূরে একটা মার্ব্বল-টেব্‌লে জল থাকিত। নলিনবিহারী সেই টেবলের দিকে যাইবে প্রথমবার উঠিলে মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয্যায় বসিল। কিন্তু তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠিল,—আর সহ্য হয় না। তখন সে আবার উঠিল। চরণ কম্পিত হইতে লাগিল। টেব্‌ল যেন কত দূর! কোন্ রূপে—যেন আপনার দেহভার কোনরূপে টানিয়া সে টেব্‌লের নিকটে উপস্থিত হইল। সে কি যন্ত্রণা-অবসানের আশা!

কিন্তু, হায়!—গ্লাস শূন্য!—একবিন্দু জল নাই! নলিনবিহারী চারি দিক অন্ধকার দেখিল। কম্পিত কর হইতে গ্লাস পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সে কেমন করিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া পড়িল, তাহা সে আপনি জানিতে পারিল না। কক্ষে প্রবেশ করিয়া চপলা দেখিল,—নলিনবিহারী শয্যায়; চরণের কতকাংশ

শয্যার বাহিরে ; মুখে বিষম যন্ত্রণার চিহ্ন। সেই চূর্ণ কাচপাত্র,—স্বামীর সেই অবস্থা !—চপলা মুহূর্ত্তে বুঝিল, কি চেষ্টায় এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই দুর্ঘটনাই তাহার নিষ্ঠুরতার চরম পরিণতি। সে কেমন করিয়া স্বামীকে একাকী রাখিয়া গিয়াছিল ? সে কি করিয়াছে ? ইহার অপেক্ষা সে আপনি কেন মরে নাই ? চপলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

চপলার আর্ত্তনাদে অচিরে গৃহের সকলে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নলিনবিহারীর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিলেন ; তাহার পর ব্যস্ত হইয়া গাত্রাবরণ ফেলিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোনও ফল ফলিল না।

সব শেষ হইল।

সে রাত্রিতে শিশিরকুমারের নয়নে নিদ্রা আইসে নাই। সে অনিদ্র হইয়া চিন্তা করিতেছিল। তাহার হৃদয়ে বিষম দুশ্চিন্তা। চপলার কথা শুনিয়া তাহার মনে শান্তি ছিল না। চপলা কি দারুণ ভ্রান্তিবশে হৃদয়ে অতিদারুণ দুশ্চিন্তা পোষণ করিয়াছে ? অতি প্রবল না হইলে সে ত রমণীর স্বাভাবিক সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই ! রমণীর লজ্জা যাহার গতি রোধ করিতে পারে নাই, সে কত বল সঞ্চয় করিয়াছে !

দুঃসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনাথের গৃহের সরকার যখন রুদ্ধদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে ডাকিল, তখন শিশিরকুমার চমকিয়া উঠিল,—অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিচলিত হইল। দ্বারবান জাগিয়া দ্বার মুক্ত করিতে করিতে সে দ্বিতল হইতে নিম্নে আসিল। সে যে স্থানে দুঃসংবাদ শুনিল, সেই স্থানেই বসিয়া উভয় করে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। উদার-চিত্ত,—সরলহৃদয় পুরুষ যখন আপনার ক্ষুদ্র দুঃখে নহে—স্নেহ-ভাজনের দুঃখে ব্যথিত হয়, তখন সে এমনই অধীরভাবে ক্রন্দন করে। তাহার ব্যথিত, বিদীর্ণ হৃদয় বিষম বেদনা পাইল।—হায় চপলা!—অভাগিনী চপলা!

নবম পরিচ্ছেদ।

শূন্য গৃহ।

হৃদয়ের সব সুখ সেই চিতানলে ভস্মীভূত করিয়া সতীশচন্দ্র দেশে ফিরিল। দেশে ফিরিয়া প্রথম কয় দিন সে শিবচন্দ্রের গৃহেই রহিল। সে গৃহও শূন্য; —সে গৃহেও সুখালোক ও আনন্দকিরণ নির্ব্বাপিত। এখনও পল্লীর প্রৌঢ়গণ দত্তগৃহে আসিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহে আর সে ভাব নাই। আর ক্রীড়া নাই, হাস্যপরিহাস নাই,—আনন্দ নাই। তপন মেঘাবৃত হইলে সমস্ত প্রকৃতিতে বিষাদের ছায়া পড়ে। যে গৃহে গৃহস্বামীর মনে সুখ নাই, সে গৃহে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? যে গৃহে মরণের ছায়া পড়ে, সে গৃহে চাপল্য থাকে না, বিষাদগাম্ভীর্য্য আপনি আইসে।

পূর্ব্বে গৃহকর্ম্ম শিবচন্দ্র দেখিতেন; তাঁহার সুব্যবস্থায় সংসারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার আর সে সকল কার্য্যে মন নাই। তিনি কমলকে কত ভালবাসিতেন, তাহা তিনি আপনিও ইহার পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই; এখন অতি দারুণ,—মর্ম্মভেদী শোকে বুঝিলেন,—সে কত প্রিয় ছিল,—জীবনে সে কি ছিল,—সে বিনা জীবন কি হইয়াছে। জ্বালার উপর জ্বালা, যে নিকটে থাকিলে, যাহাকে স্নেহবন্ধনে বাঁধিতে পারিলে এ দহন প্রশমিত হইতে পারিত, সে আজ কোথায়? সে কথা ভাবিলে হৃদয়ে যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিত। অথচ সে ভাবনা আপনি আসিত,—সর্ব্বদা আসিত। শিবচন্দ্র যেন সর্ব্বদাই

চিন্তিত। এত দিন তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ও শক্তি অব্যাহত ছিল; এখন শোকে ও চিন্তায় স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।—শরীরে ক্ষয়চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। শিবচন্দ্র একান্ত কাতর,—একান্ত বিষণ্ন।

পিসীমা'র শোক যদি বা ব্যক্ত হইয়া কিছু প্রশমিত হইত,—যদি বা সহানুভূতিতে কিছু সান্ত্বনা লাভ করিত, বড়বধূর শোক হৃদয়েই বদ্ধ রহিয়া অপ্রশমিত জ্বালায় অহরহঃ হৃদয়কেই দগ্ধ করিত। কমল যে শৈশবে তাঁহারই অঙ্কে পালিত; তিনি যে প্রভাতকেও তেমন করিয়া নাড়াচাড়া করেন নাই।

নবীনচন্দ্রের শোক বর্ণনীয় নহে। আগ্নেয় গিরি যেমন অন্তরস্থিত বহ্নিজ্বালায় জ্বলিতে থাকে, তিনি তেমনই জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অটল ধৈর্য্য বিচলিত হইল না; কিন্তু প্রফুল্ল মুখে বিষাদগাম্ভীর্য্য স্থায়ী হইয়া রহিল; ম্লান হাসিতে উচ্ছ্বসিত ভাব নাই, হৃদয়ে প্রফুল্লতার অভাব। নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে আর এক দারুণ শোকের জ্বালা ছিল। সে জ্বালা নির্ব্বাপিত হয় নাই। যাহাদের লইয়া সে জ্বালা প্রশমিত হইয়াছিল—তাহারা আজ কোথায়? এক জন আপনি দূরে গিয়াছে। আর এক জন?—হায়! তাহার শোকে পূর্ব্বশোক যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তাই হৃদয় যন্ত্রণাময়। প্রশমিততেজ বহ্নি যখন আবার জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহাতে কি যন্ত্রণা—কি বিষম যন্ত্রণা!

দত্ত গৃহে শোকের যন্ত্রণা। সকলেরই হৃদয় বিষাদভারাবনত,—সকলেই শোকাতুর। সে গৃহে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে?

দত্তগৃহ হইতে কয় দিন পরে সতীশচন্দ্র আপনার গৃহে গেল। সেখানেও কেবল জ্বালা।

গৃহে সেই সবই আছে,—কেবল এক জনের অভাবে গৃহ শূন্য,—হৃদয় আনন্দহীন,—জীবন যাতনা মাত্র।

গৃহে সর্ব্বত্র কমলের স্মৃতি।

পিঞ্জরে তাহার পালিত পক্ষী রহিয়াছে। ক্ষুদ্র বিহগ;—দুর্ব্বল অঙ্গুলির সামান্য পেষণে তাহার প্রাণ যায়। সে পিঞ্জর মধ্যে ঘুরিতেছে—ফিরতেছে—কূজন করিতেছে। কেবল কমল নাই!

গৃহপ্রাঙ্গনে তাহার স্বহস্তলালিত শেফালী তরু। এখনও তাহার দুই চারিটি কুসুম ফুটিয়া ঝরিতেছে,—বৃন্তচ্যুত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গনে পড়িতেছে। কিন্তু কমল নাই!

পুস্তকাধারে তাহার পুস্তকগুলি তেমনই রহিয়াছে। পুস্তকে তাহার নাম লিখিত। এক এক খানির অঙ্গে স্নেহশীলার পুত্রের স্পর্শচিহ্নও রহিয়াছে। কিন্তু কমল নাই!

পালঙ্কে তাহার শয্যা তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু কমল নাই!

কার্য্যাবসানে শ্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সতীশচন্দ্রের মনে হইত, বুঝি কমল সেখানে রহিয়াছে; তাহার পদশব্দ শুনিয়া সে সেই প্রেমসমুজ্জ্বল নয়নে তাহার দিকে চাহিবে সে দৃষ্টিতে তাহার অর্দ্ধেক শ্রম দূর হইবে। তখনই মনে হইত—হায়। কমল কোথায়!

আপনার কক্ষে বসিয়া সতীশচন্দ্রের মনে হইত, যেন কমলের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছে। বুঝি কমল আসিতেছে! কিন্তু

তখনই নিষ্ঠুর সত্য মনে পড়িত,—হৃদয় ব্যথিত হইত।

দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে সতীশ চমকিয়া উঠিত; বুঝি কমলের কণ্ঠস্বর! কিন্তু তখনই মনে পড়িত, সেই অভিলষিত-শ্রবণ কণ্ঠস্বর সে আর শুনিতে পাইবে না। সতীশচন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিত।

শয্যায় শয়ন করিতে যাইয়া সতীশচন্দ্রের মনে হইত, যেন সে শয্যা প্রিয়তমার স্পর্শতাপতপ্ত। কিন্তু কমল কোথায়! তখন—সেই দীর্ঘযামা যামিনীতে সঙ্গিহীন শয্যায় সতীশচন্দ্র কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিত।

চারি দিকে কমলের স্মৃতি। গৃহে প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত তাহার কোনও না কোনও স্মৃতি বিজড়িত। সর্ব্বত্র তাহার স্পর্শ। গৃহে সর্ব্বত্র তাহার স্মৃতি—গৃহ আজ শ্মশান। হৃদয়ে তাহার স্মৃতি—হৃদয় আজ শ্মশান। হায়! সুখের আশা;—অসার কল্পনা! জীবন কেবল যাতনাদহন,—কেবল বেদনা।

যখন গৃহে প্রত্যেক কার্য্যে—পদে পদে পরিচিত—প্রিয়—এক জনের অভাব অনুভূত হয়, যখন প্রত্যেক কার্য্যে তাহার কথা মনে পড়ে—কিন্তু তাহার নিপুণ হস্তের সযত্নস্পর্শ থাকে না, তখন হৃদয়ে যে যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তাহা যে অনুভব না করিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। সে যন্ত্রণা বর্ণনার নহে;—বর্ণনার অতীত।

সতীশচন্দ্রের দুঃখে গ্রামের সকলেই দুঃখিত। কারণ—স্বভাব-গুণে সতীশ সকলের ভালবাসা লাভ করিয়াছিল।

সতীশচন্দ্র বুঝিয়াছিল, এ শোক কালজয়ী; এ শোকের জ্বালা

যাইবার নহে ; কিন্তু শোকের প্রবাহে সব ভাসাইলে কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী ঘটিবে। সুখে হউক—দুঃখে হউক—বিপদে হউক—সম্পদে হউক, মানুষকে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে। তাই সতীশচন্দ্র আপনার আরব্ধ কার্য্য আবার আরম্ভ করিল,—কর্ত্তব্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিল। কিন্তু হায়!—কার্য্যের অবসরে কেবল কাহাকে মনে পড়ে? তাহার সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যাহাকে না জানাইলে সে তৃপ্ত হইতে পারিত না ; যে তাহার সকল কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইত ; যাহার মৌন দৃষ্টি ও ব্যবহার তাহাকে উৎসাহিত করিত—নবীন শক্তি দান করিত, সে আজ কোথায়? তাহার কোনও সদনুষ্ঠানের কল্পনার কথা জানিতে পারিলে যাহার নয়ন আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত ;—যাহার নয়নের সেই আনন্দ-কিরণে তাহার কল্পনা দৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হইত ;—যাহার সহানুভূতির উৎসাহ ব্যতীত তাহার পক্ষে কোনও সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হইত না—তাহার সেই সুহৃদ, সেই ভক্ত, সেই সহায়, সেই সহচরী, সেই জীবনের সুখ ও হৃদয়ের শান্তি—প্রেমময়ী পত্নী আজ কোথায়?

যখন হৃদয়ে যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন সতীশচন্দ্র পুত্রকে কাছে আনিত, যেন কিছু শান্তি পাইত।

আর এক জনের মৌন সান্ত্বনায় সতীশচন্দ্র কিছু শান্তিলাভ করিত। একমাত্র সন্তান সতীশচন্দ্রের অতি দারুণ শোকই তাহার জননীর কষ্টের একমাত্র কারণ নহে। তিনি পুত্রবধূকে দুহিতার স্নেহ দিয়াছিলেন।—তাহার নিকট জননীর শ্রদ্ধা ও

ভালবাসা পাইয়াছিলেন। শাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে সাধারণতঃ যে ব্যবধান থাকে, তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে সে ব্যবধান ছিল না—জননী-দুহিতার অবারিত স্নেহ ভালবাসার সম্বন্ধ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। মাতৃহীনা কমল তাঁহাকে মাতার মত দেখিত—তাঁহার নিকট মাতার স্নেহ পাইয়াছিল; কন্যাহীনা শ্বশ্রূ তাহাকে কন্যার মত দেখিতেন—তাহার নিকট কন্যার ব্যবহার পাইয়াছিলেন। তাই উভয়ের মধ্যে স্নেহসম্বন্ধ অতি মধুর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই কমলের মৃত্যুতে সতীশচন্দ্রের জননী সন্তানের মৃত্যুশোক অনুভব করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সতীশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিত। তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি,—তাঁহার মৌন সান্ত্বনা,—তাঁহার প্রকৃত শোক তাহাকে যেন কিছু শান্তি দান করিত।

সতীশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে ধূলগ্রামে যাইতে হইত। এখন নানা কার্য্যে শিবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাহার পরামর্শ লইতেন। মানুষের স্বভাব,—হৃদয়ের উৎসাহ ও উদ্যম যৌবনের পর যত ক্ষয় হয়, সে ততই আর এক জনের সাহায্যলাভে ব্যস্ত হয়। যৌবনে অপরকে কার্য্যের অংশ দিতে ইচ্ছা হয় না,—যৌবনের পর তাহার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে। তাই যৌবনের পর স্বাভাবিক স্নেহ যেন ঘনীভূত—প্রবল হয়; তখন স্নেহাস্পদদিগকে সকল কার্য্যে অংশ দিতে ইচ্ছা করে; তাহাদিগকে নিকটে পাইতে ও নিকটে লইতে তখন হৃদয়ে ব্যগ্রতা জন্মে। প্রভাতের জন্য শিবচন্দ্রের যন্ত্রণার অন্ত ছিল না। যে হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন, তাহার

জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা পর্য্যন্ত বোধ করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় কেবল যন্ত্রণা। যত দিন যাইতেছিল, তত যন্ত্রণা বাড়িতেছিল;—প্রভাতের সম্বন্ধে শিবচন্দ্র তত হতাশ হইতেছিলেন। তিনি যাহাকে সব আশার অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে-ই নিতান্ত হতাশ করিল! শিবচন্দ্র সতীশকে সংসারে আপনার কাযের অংশ দিতে লাগিলেন। সেই জন্য সতীশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে ধূলগ্রামে আসিতে হইত।

সতীশচন্দ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য ত্যাগ করিল,—ভাল লাগে না। মনের এ অবস্থায় আর সেই বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকা সম্ভব নহে। তাহাতে অবসর বাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বাড়িল,—অধ্যয়নও বাড়িল,—অবসরের অভাবে যে সকল সদনুষ্ঠানকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, সে সকল কল্পনা এখন কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। নিদাঘতাপে পর্ব্বতের তুষাররাশি যেমন বিগলিত হইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ধরণীতে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করে, শোকে সতীশ-চন্দ্রের মানসিক শক্তি তেমনই প্রবাহিত হইয়া সমস্ত গ্রামে স্নিগ্ধ সরসতার—নূতন জীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল।

সতীশচন্দ্রের এই সকল কার্য্যে শিবচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে কত সুখী হইতেন, তাহা আর বলা যায় না।

নবীনচন্দ্রের হৃদয় একান্ত শূন্য। তিনি সমান স্নেহে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়াছিলেন। এক জন আজ সব স্নেহের অতীত। আর এক জন আপনি আপনাকে সে স্নেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাকে মুক্তি দিতে পারিয়াছেন কি? আপনার হৃদয় মুক্ত করিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহার হৃদয়

কি কেবল তাহারই দিকে আকৃষ্ট হয় না? হায়—শূন্য গৃহে যদি সে থাকিত,—যদি তাহার শিশুপুত্রও থাকিত—তবেও একটা কায থাকিত,—কিছু থাকিত।

নবীনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সতীশচন্দ্রের গৃহে আসিতেন; সমস্ত দিন অমলকে লইয়া থাকিতেন, তাহার পর শ্রান্ত—কাতর হৃদয়ের ভাব বহিয়া শূন্য মনে আপনার শূন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই,—শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয় না,—শূন্য গৃহ যেন শ্মশান!

ধূলগ্রামে সেই শূন্য গৃহে দুইটি মহিলার জীবনে আশার ও আনন্দের অরুণকিরণ অকালজলদোদয়ে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। উভয়েরই জীবন যেন কেবল যন্ত্রণার ভার; সংসারের কোনও কার্য্যে আর আকর্ষণ নাই,—সে সব কেবল কর্ত্তব্যের ভার—কেবল যন্ত্রণা।

দশম পরিচ্ছেদ।

আর দুই সংসার।

নলিনবিহারীর মৃত্যুর পর বিধবা চপলা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর সঙ্গে পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল। আপনার ভ্রম বুঝিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিল। জীবনব্যাপী আত্মগ্লানি মাত্র রহিল;—শান্তির আশা রহিল না। আপনার ভ্রান্ত কার্য্যের সংশোধনের কথা যখন সে বুঝিল,—বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল, তখনই সব শেষ হইয়া গেল। হায়,—কেন সে পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারে নাই? হৃদয়ের যন্ত্রণা হৃদয়েই রহিল;—হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। সে যে আপনার দারুণ ভ্রম বুঝিয়াছে, বুঝিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে; সে যে সে জন্য দুঃখিতা,—আপনাকে সংশোধনে প্রবৃত্তা, এ কথা সে একবার বলিবারও অবসর পাইল না। চপলা বুঝিল, ইহা ত তাহার দারুণ ভ্রমের প্রায়শ্চিত্তের এক অংশ। সে নীরবে সব সহ্য করিল। তাই বলিয়াছি, সহজে কেহ আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সদ্বংশসম্ভূতা, পবিত্রজীবনের আদর্শে পালিতা ও শিক্ষিতা রমণী যখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করেন। আর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আর কেহ সে ভ্রান্তির কথা জানিতে না পারিলেও, রমণী আপনি হৃদয়কে পীড়িত – দলিত করেন। চপলা তাহাই করিল। তাহার পুণ্যসঙ্কল্প যেন তাহার হৃদয়ে নূতন শক্তির সঞ্চার করিল; চপলতা গাম্ভীর্য্যে পরিণত

হইল; হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা চিন্তাশীলতায় অদৃশ্য হইয়া গেল। জীবনে নূতন পথ মুক্ত হইল,—হৃদয়ে নূতন উদ্দেশ্য বিকশিত হইয়া উঠিল। হায়—যদি সে অল্প দিন পূর্ব্বেও আপনার এই অতি দারুণ ভ্রম বুঝিতে পারিত, যদি স্বামীর নিকট ক্রটী স্বীকার করিবার সময় পাইত!—তবে হয় ত এই চিরদাবানলদগ্ধ হৃদয়ে এক বিন্দু শান্তিবারি সিঞ্চিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই,—তাহা হইবার নহে।

গৃহে শোকের প্রথম বেগ কিছু প্রশমিত হইলে শিশিরকুমার কর্ম্মস্থানে যাইতে উদ্যত হইল। চপলার জননী কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সব আশাই ত শেষ হইল। তুমি পুত্রস্থানীয়। কর্ত্তা বলিতেন, তুমিই আমার অবলম্বন। তুমিও পুত্রের অধিক করিতেছ। কায ছাড়িয়া দাও; বিবাহ কর; আমার নিকটে থাক।"

তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলে শিশিরকুমার যত সুখী হইত, তত আর কিছুতেই নহে। তাই শিশিরকুমার আবার ভাবিল, কি করা কর্ত্তব্য। বিবাহ করিলে তিনি সুখী হইবেন! বিবাহ করিলে হয় ত আর এক জনের হৃদয়ে এক দারুণ সম্ভাবনার কল্পনার উদয়পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু হায়!—দীর্ণ হৃদয় আর যুক্ত হইবার নহে;—ম্লান কুসুম আর প্রফুল্ল হয় না। শিশিরকুমার বুঝিল, সে কার্য্য তাহার ক্ষমতার অতীত। সে ত আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে,-সে ত আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাহার আর এক জনকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে বলিবার অধিকার কোথায়? সে তাহা চাহিতে পারে না।

ইহার পর কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিবার কথা। কেন সে ভিন্ন স্থানে—ভিন্ন কার্য্যে আপনার জীর্ণ হৃদয়ের হতাশা-বেদনা সহনীয় করিতে গিয়াছিল,—কেন হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল,—কেন সব উচ্চাশা বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। হৃদয় যেন নূতন করিয়া ব্যথিত হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, সে নিকটে থাকিলে সদুপদেশ-সহায়তায় হয় ত চপলার উপকার করিতেও পাবে। কিন্তু দুর্ব্বল মানবহৃদয়ের ক্ষীণ শক্তিতে কত দূর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত? তাহার আবেগ!—শিশিরকুমার চপলার কথা ভাবিল; সব দিক দেখিল—চপলার জননীর আদেশ পালন করিতে পারিল না। যাঁহাদের ইষ্টসাধন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সে কর্ত্তব্য বুঝিয়া আপনাকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূরে লইল—নির্ব্বাসিত করিল। সে জন্য সে সবই সহ্য করিতে প্রস্তুত রহিল,—সবই সহ্য করিল। কিন্তু ব্যর্থ জীবনের সে লক্ষ্য অপরিবর্ত্তিতই রহিল।

কৃষ্ণনাথের পত্নী কিছু দিন হইতে হৃদ্‌রোগ ভোগ করিতে-ছিলেন। নলিনবিহারীর মৃত্যুর 'পর তাহা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নাই। অগ্রহায়ণের মধ্যভাগে এক দিন তাঁহার সামান্য জ্বর হইল। তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। পর দিন জ্বর একটু বাড়িল। ছেলেরা জিদ করিয়া ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তার মত প্রকাশ করিলেন, জ্বর সামান্য—কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভাল নহে। পর দিন সহসা নিশ্বাসরোধ হইল;—রোগ যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া পুত্রশোকাতুরা জননী সর্ব্বযন্ত্রণামুক্তা

হইলেন। কৃষ্ণনাথের সুখের সংসারে দুঃখের প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছিল।

পরিণত বয়সে পত্নী—গৃহের গৃহিণী, রোগে শুশ্রূষাকারিণী, সর্ব্বকার্য্যে সাহায্যকারিণী হইয়া দাঁড়ান। যিনি যৌবন হইতে স্বামীর সকল সুবিধা অসুবিধা সযত্নে লক্ষ্য করেন, স্বামীর সুখাসুখ আপনার করিয়া লয়েন; সুস্থাবস্থায় ও রোগে উপযুক্ত শুশ্রূষাদান করেন; সযত্নে জরার আগমন বিলম্বিত করিতে চেষ্টা করেন,—যাহাতে দেহে ক্ষয়ের স্পর্শচিহ্ন অনুভূত না হয়, সে জন্য সচেষ্ট হয়েন—তাঁহার মৃত্যুতে কেবল শোকই প্রবল হয় না। দীর্ঘজীবনপথ যাঁহার করে করবদ্ধ করিয়া অতিক্রম করা যায়, যিনি আবশ্যককালে অবলম্বন ও অন্য সময় মধুরভাষী সহচর, সহসা তাঁহার অভাবে হৃদয় যে বেদনা অনুভব করে, তাহা অপনীত হইবার নহে। দীর্ঘ দিন যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকে, সহসা—সন্ধ্যার কনককিরণ নিবিতে না নিবিতে তাহাকে হারাইলে হৃদয়ের শূন্যভাব যেন একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে। যৌবনে পত্নীবিয়োগে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়; পরিণত বয়সে পত্নী-বিয়োগে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে কৃষ্ণনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল,—বার্দ্ধক্যের ক্ষয়-চিহ্ন বড় দ্রুত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনও পীড়া নাই; কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল নহে। এই ভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল। কৃষ্ণনাথ পূর্ব্ববৎ যথারীতি আফিসের কায করিতে লাগিলেন। বৈশাখের প্রথমে অতি দারুণ তাপ পড়িল। গরমে কয় রাত্রি কৃষ্ণনাথ

ঘুমাইতে পারিলেন না—শরীর অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। তখন আফিসেও কাযের বড় ভিড়। এই অবস্থায় এক দিন কৃষ্ণনাথকে আফিসের পক্ষ হইতে একটা মোকর্দ্দমার উপদেশ দিবার জন্য মধ্যাহ্নে উকীলবাড়ী যাইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে গাড়ীতেই তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। সর্দ্দিগর্ম্মী কাটিল বটে; কিন্তু পক্ষাঘাত দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ জীবিত রহিলেন বটে,—কিন্তু হায়! জীবন্মৃত।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের কার্য্যভার বড় বধূর হস্তে আসিয়াছিল। এখন বাহিরের কার্য্যভার কৃষ্ণনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে আসিল। বাহিরের কার্য্য যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বাহিরের কার্য্যে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন হয় না,—নিত্য নূতন ঘটনা ঘটে না;—কাযেই বাহিরের কার্য্যে কোনও গোল ঘটিল না। বিশেষ জ্যেষ্ঠ সর্ব্ববিষয়ে বিনোদবিহারীর সুবিধা দেখিতেন। কিন্তু যেমন সমস্ত দেহের শক্তি হৃদয়ে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই সংসারের প্রকৃত কার্য্য অন্তঃপুরেই সম্পাদিত হয়। সেখানে অতি তুচ্ছ কার্য্য হইতে অতি গুরু ফল ফলিয়া থাকে। মধ্যমা বধূ শাশুড়ীর যে কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারিতেন না, বড় বধূকে সেই কর্ত্তৃত্বদানে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। বড় বধূ সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সুবিধা দেখিলেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। কাযেই সংসার ক্রমে প্রধানহীন সাধারণতন্ত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বড় বধূর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশঙ্কা—পাছে মধ্যমা বধূ কোনরূপে শোভার সহিত অসদ্ভাব করেন। শাশুড়ীর সে আশঙ্কা

তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি শঙ্কিতা থাকিতেন,—সাবধান থাকিতেন।

মা নাই;—সে সংসার নাই। শোভা চিরদিন আদরে অভ্যস্তা। এখন আপনার কায আপনি দেখিতে হয়। বড়বধূর অনেকগুলি সন্তান। তিনি শোভাকে অত্যন্ত আদরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু নানা কার্য্যে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। শোভা অন্যত্র—স্বতন্ত্র সংসার পাতিবার কথা ভাবিল, প্রভাতকেও বলিল। কিন্তু উভয়েরই এক বিপদ,—কেমন করিয়া কৃষ্ণনাথকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া যাইবে? সে কার্য্য অত্যন্ত অশোভন দেখাইবে। কাযেই তাহা হইল না। ইহার পর পৌষ মাসের মধ্যভাগে নিয়মিত কালের পূর্ব্বে শোভা একটি দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিল।

প্রভাত মধ্যে মধ্যে সতীশের পত্র পাইত। স্নেহশীল নবীনচন্দ্র কি তাহাকে ভুলিতে পারেন? তাই সতীশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে প্রভাতের সংবাদ লইতে হইত,—নহিলে নবীনচন্দ্র থাকিতে পারিতেন না। সতীশ প্রায়ই প্রভাতকে গৃহে আসিতে লিখিত। সে গৃহে না যাওয়াতে গৃহে সকলেই দুঃখিত জানিয়া প্রভাত সত্য সত্যই দুঃখিত হইত। কিন্তু উপায় কি? কতবার সে কত সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে—তাহা প্রভাতের মনে পড়িত। সে ভাবিত, এখন কেমন করিয়া কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি;—কেমন করিয়া আবার গৃহে মুখ দেখাইব? তাহার ব্যবহারে গৃহে সকলে কত কষ্ট পাইয়াছেন, এবং পাইতেছেন, তাহা মনে করিয়া প্রভাত কষ্ট পাইত;

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখের পর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুগৃহে।

মাঘের শেষ। শীত যায় যায়। প্রভাতের কয় জন বন্ধু কিছুদিন হইতে কলিকাতার বাহিরে চড়িভাতি করিতে যাইবার কল্পনা করিতেছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এমন সময় বন্ধু শারদানাথের পুত্রলাভে ও ডেপুটী বন্ধু অমৃতেন্দ্র-নাথের বিভাগীয় পরীক্ষায় সাফল্যলাভসংবাদে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। খড়দহে রাজেন্দ্রনাথের একখানি বাগানবাড়ী অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় ছিল ;—গৃহ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, উদ্যানরচনা হয় নাই। সেই গৃহে চড়িভাতি করা স্থির হইল।

অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিতে হইল। তখন অন্ধকার কেবল দূর হইতেছে ; ষ্টেশনে আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সতের জন দুইখানি কামরা দখল করিয়া বসিল। বহুদিন কলিকাতায় বাসের পর পল্লীর স্নিগ্ধশ্যাম শোভা কি মধুর! ধূলিধূমমুক্ত শীত পবনের স্পর্শ কি প্রীতিপদ!

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হইল। পূর্ব্ব মেঘে রক্তিমা,—কিরণগোলক সিন্দূরলোহিত,—প্রদীপ্ত তেজোহীন। ক্রমে বর্ণ ঔজ্জ্বল্যে পরিণত হইতে লাগিল। প্রান্তরদৃশ্য নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

পথিপার্শ্বে নালায় জল শুকাইয়া গিয়াছে ; তলদেশে ভূমি শতধা বিদীর্ণ হইয়া মাঘের শেষে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেই বিদীর্ণ ভূমির ফাটলে ভাদলা তৃণের নবোদ্গত পত্র হরিদ্রা হইতে গাঢ় হরিতে পরিণত হইতেছে। বৃক্ষশাখায় দুই চারিটি বিহগ বসিয়া আছে; প্রান্তরে আর কতকগুলি শস্যকণার বা পতঙ্গের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। সমীরান্দোলিত বৃক্ষপত্র হইতে নিশার সঞ্চিত শিশির বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে। তৃণদলে পর্য্যাপ্ত শিশির। দূরে প্রান্তরদৃশ্যে কেবল হরিৎ শোভা—স্নিগ্ধ, নয়নরঞ্জন, মনোমোহন। সেই প্রান্তর দৃশ্যে সামান্য স্বচ্ছ কুয়াসা যেন পল্লীলক্ষ্মীর আননে সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের মত প্রতীয়মান হইতেছে।

অল্প সময় মধ্যেই ট্রেণ খড়দহে আসিল। ক্রমে সকলে বাগানবাড়ীতে উপনীত হইল। গৃহের সম্মুখে কলতানময়ী, উদার গঙ্গা—পূতসলিলা,—ভারতের সম্পদ্‌বিধায়িনী,—চির-কল্যাণময়ী। গৃহের পার্শ্বেই তান্ত্রিক সাধক প্রাণনাথ বিশ্বাসের সাধনাশ্রম পঞ্চবটীর প্রবীণ বৃক্ষরাজি। চারি দিকে অশ্বথ; বট, খর্জ্জুর, বাবলা, নারিকেল, কুল, নোনা, নিম্ব ও শিমুল তরু। বৃক্ষের তলদেশে কালকাসন্দা ও আসশ্যাওড়ার ঝোপ। দুই একটি বৃক্ষ লতায় আবৃত,—লতায় ঢোলকলমীর ফুলের মত এক প্রকার সুন্দর ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া আছে। দক্ষিণে গঙ্গা বাঁকিয়া গিয়াছে;—কূলে বহু দিনের প্রাচীন ঘাট ও বহু শিবমন্দির। বামে গঙ্গা অশ্বক্ষুরের মত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। পর পারে কলের চিম্‌নি হইতে ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। পরিচ্ছন্ন গৃহগুলি মেঘহীন নীলাম্বরতলে, হরিৎ তরুলতার মধ্যে

চিত্রের মত দেখাইতেছে। সারি সারি ঝাউ যেন আকাশদৃশ্য বিভক্ত করিয়া দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বে নীলাম্বরের কোলে বৃক্ষ-লতায় যেন অবিচ্ছিন্ন সবুজ রেখা।

বন্ধুদিগের সহায়তায় অল্প সময়ে মধ্যেই কিছু আহার্য্য প্রস্তুত হইল। প্রাতরাশের পর শারদানাথ ছুরিকার সাহায্যে উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিল; বিজয়চন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ পাকের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল; এক দল তাস খেলিতে প্রবৃত্ত হইল; সঙ্গীতপ্রিয়গণ সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে লাগিল; সকলেই অবসরমত পরচর্চ্চায় যোগ দিতে লাগিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য—সবই আলোচিত হইতে লাগিল। বিশেষ, বঙ্গ ভাষায় নব প্রকাশিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, উপন্যাস ও কবিতা—এ তিনের যথেষ্ট সমালোচনা চলিতে লাগিল।

এক জনের মনে পড়িল, শ্যামসুন্দরের ও মদনমোহনের মন্দির ও বিগ্রহ দেখিতে হইবে। চাঞ্চল্য ও আবেগ যৌবনের ধর্ম্ম। কথা হইতে না হইতে সঙ্কল্প স্থির হইল। তখন সকলে যাত্রা করিল। পথে রাজেন্দ্রনাথ পূর্ব্বপরিচিত "দেওয়ানজী" মহাশয়কে ডাকাইয়া লইল। "দেওয়ানজী" বৃদ্ধ,—মুণ্ডিতগুম্ফ-শ্মশ্রু,—দীর্ঘকায়,—কৃষ্ণবর্ণ। তিনি যাঁহাদের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য অতীতের প্রবাহে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে তখন লোকের ঐশ্বর্য্য থাকিলে তাহার কিছু স্থায়ী চিহ্নও থাকিত; সেগুলি বিক্রীত হইবার নহে—তাই থাকিয়া যাইত। বঙ্গের সর্ব্বত্র দেখিবে, বিস্তৃত দীর্ঘিকা, প্রশস্ত রাজপথ সুগঠিত

দেবমন্দির, স্নানের ঘাট—অধুনা দারিদ্র বা বিলুপ্ত বংশের ঐশ্বর্য্য-স্মৃতি লইয়া দণ্ডায়মান। "দেওয়ানজী" যে পরিবারের সেবা করিয়াছিলেন, দেবমন্দিরে ও স্নানের ঘাটে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যস্মৃতি এখনও বর্ত্তমান; হয় ত আরও কিছুদিন থাকিবে। তবে তাহারাও এই পুরাতন, প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীর মত জীর্ণ,—কালের কর-চিহ্নে চিহ্নিত। সে বংশপতি নাই, সে সম্পদ নাই, কেবল "দেওয়ানজী"র পদের নামটুকুমাত্র গ্রামবাসীদিগের নিকট এই বৃদ্ধের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বদ্ধ হইয়া আছে।

"দেওয়ানজী" খড়দহের অতীত গৌরবের কথা বলিতে লাগিলেন। সে কালের সেই সব কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের ক্ষীণদৃষ্টি নয়নদ্বয় যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যুবকগণ সেই সব শুনিতে শুনিতে মন্দিরে উপনীত হইল। এক জন ভক্তিভরে চরণামৃত গ্রহণ করিলে আর এক জন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "ভণ্ডামী কেন?" সে উত্তর করিল, "ভণ্ডামী নহে। বিশ্বাস না করিতে পারি; কিন্তু জাতীয় আচার ত্যাগ করিব কেন? কোন্ জাতি জাতীয় আচার ত্যাগ করে?" কথায় কথায় অন্য কথা আসিয়া পড়ায় সে আলোচনা ত্যক্ত হইল,—মতভেদের বিষম তর্ক আর উত্থাপিত হইল না। তাহার পর নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে যুবকদল বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

তখন বেলা হইয়াছে। জোয়ারের উচ্ছ্বসিত বারি বাঁধা ঘাটের সোপানের পর সোপান ডুবাইয়া দিতেছে। গঙ্গাবক্ষে

কত তরণী ভাসিয়া যাইতেছে। বাষ্পীয় জলযানের গমনে জল-রাশি আন্দোলিত হইতেছে,—বড় বড় ঢেউ আসিয়া কূলে প্রতিহত হইতেছে। কত ছোট ছোট নৌকা যাইতেছে; মাঝিরা গল্প করিতেছে, ধূমপান করিতেছে, ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় বাহিতেছে। সকলে স্নান করিতে গঙ্গায় নামিল। যাহারা সন্তরণপটু, তাহারা সন্তরণরত হইল; হস্তের আন্দোলনে জল ছিটাইতে লাগিল। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া সঙ্গীদিগের মুখে জল দিতে লাগিল। ক্রমে জল ছিটানটা সংক্রামক রোগের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কলিকাতায় সচরাচর অবগাহন-স্নান ঘটে না; আজ সকলে তাহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে—তিনটার পর—আহার্য্য প্রস্তুত হইল। আহারের আয়োজন যেমন বিপুল, ক্ষুধাও তেমনই প্রবল। কাযেই প্রচুর আহার্য্যের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হইয়া গেল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে ক্ষেত্রমোহনের দোষে পথ ভুলিয়া, গো-শকটচালক ও যাত্রীদিগের নিকট পথের সন্ধান জানিয়া সকলে পথে কলহাস্য ছড়াইতে ছড়াইতে ষ্টেশনে আসিল। ষ্টেশনে সকলেই সোডা, লেমনেড বা জিঞ্জারেড, পান করিবে, কিন্তু বিক্রেতাকে এককালে দুইটি আনিতে বলিবে না! সে বিরক্ত হইতে লাগিল; যুবকদল তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

তাহার পর ট্রেণে আবার কলরব করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয়।

এই আনন্দের মধ্যে প্রভাত কেমন বিষণ্ণ বোধ করিতেছিল। এ আনন্দ যেন তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল না। আজ বহু দিন পরে কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামে আসিয়া তাহার কেবল আপনার গ্রামের কথা মনে পড়িতেছিল, আজ গঙ্গা দেখিয়া তাহার গ্রামের সেই কলনাদিনী তটিনীর স্মৃতি মনে উদিত হইতেছিল,—আজ তাহার গৃহের কথা মনে হইতেছিল। আর —সঙ্গে সঙ্গে সেই পল্লীভবনবাসী শোকদুঃখকাতর স্বজনগণের কথা মনে পড়িতেছিল। আপনার ব্যবহারের কথা, স্বজনগণের ও তাহার মধ্যে ব্যবধানের কথা সব মনে পড়িতেছিল। তাই এই আনন্দের মধ্যে প্রভাত বিষাদের ছায়াপাত অনুভব করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাতনা।

প্রভুর প্রকৃতি ভৃত্যে প্রতিফলিত হয়। যে গৃহে প্রভু দাতা, সে গৃহে দাসদাসী ভিখারীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে—যত্ন করে; কারণ. তাহাতে তাহাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। আর কৃপণের গৃহে ভিখারী সিংহদ্বার অতিক্রমের উদ্যোগ করিলেই দাসদাসী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। যে গৃহে প্রভু আশ্রিতবৎসল, সে গৃহে দাসদাসীরা আশ্রিতদিগকে সম্মান করে; যে গৃহে প্রভু আশ্রয়-দানবিমুখ, সে গৃহে দাসদাসীদিগের নিকট তাহাদিগের সম্মান থাকে না, পরন্তু বিপরীত দেখা যায়। বরং কাচবিশেষে যেমন রবিকর প্রতিফলিত হইলে তাহার দাহিকাশক্তি প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, ভৃত্যে তেমনই প্রভুর দোষ প্রতিফলিত হইয়া প্রবল ভাব ধারণ করে। বিবাহিতা কন্যার পিত্রালয়বাস নিয়ম নহে,—নিয়মের ব্যতিক্রম। শোভার পিত্রালয়বাসের কারণ বড় বধূ জানিতেন। মধ্যমা বধূও জানিতেন; কিন্তু জানিয়াও জানিতে চাহিতেন না। পিত্রালয়ে বাসহেতু শোভা তাঁহার নিকট যথেষ্ট শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ী জীবিতা থাকিতে সে ভাব প্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই,—তাহা গোপনে হৃদয়ে পুষ্ট হইয়াছিল। এখন সে ভয় আর নাই। সুতরাং এখন সময় সময় সে ভাব দৃষ্টিতে বা কথায় প্রকাশিত হইত। তাহা লক্ষ্য করিয়া বড় বধূ শঙ্কিতা হইতেন। মধ্যমাবধূর দাসীরা

তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই তাহারাও শোভার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইত না। শোভা তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহাদিগের কার্য্যে ক্রটী দেখিলে সে তাহাদিগকে তিরস্কার করিত। দাসীরা সে বিষয়ে মধ্যমা বধূর নিকট অনুযোগ করিলে তিনি যে তাহাদের পক্ষ লইয়া তাহার অধিকারের অভাবের কথা বলিতেন, তাহা সে জানিত না। ক্রমে মধ্যমা বধূর ব্যবহারে তাঁহার দাসীরা অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইল। কৃষ্ণনাথের পত্নীর মৃত্যু হইতেই দাসীদিগের প্রভু-বিভাগ হইয়াছিল।

প্রভাত যে দিন খড়দহে গেল. তাহার কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে শোভা দুর্ব্বল পুত্রকে লইয়া সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। তাহার শরীর দুর্ব্বল; মনও ভাল নহে, পুত্র নিতান্ত দুর্ব্বল—তাহার শরীর প্রায়ই অসুস্থ হয়। সেই দিন মধ্যাহ্নে শোভা একটা দ্রব্য আনিবার জন্য মধ্যমা বধূর এক জন দাসীকে আদেশ করিল। দাসী সে দ্রব্য না আনিয়া অন্য কার্য্যে চলিল। শোভা পুনরায় তাহাকে সেই দ্রব্য আনিতে বলিল। সে শুনিল না। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তাহাকে দেখিয়া শোভা তিরস্কার করিয়া বলিল, "ঝি, তোমাকে একটা কায করিতে কয়বার বলিতে হইবে?" দাসী উত্তর করিল, "যাহার বেতন ভোগ করি, তাহার কার্য্য অগ্রে করিতে হয়।" বড় বধূ পার্শ্বের কক্ষে ছিলেন। এই কথা শুনিতে পাইয়া তিনি দ্রুত আসিয়া দাসীকে তিরস্কার করিলেন, "তোমার বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাই মুখে মুখে উত্তর করিতে আরম্ভ করিয়াছ। কায,

করিতে না পার, চলিয়া যাও। কাযের ভাগ করিবার জন্য কেহ তোমাকে ডাকে নাই।"

কিন্তু তখন বিষবাণ শোভার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ, শোভা লক্ষ্য করিয়াছিল, দাসী যখন তাহার কথায় উত্তর দিতেছিল, মধ্যমা বধূ তখন দ্বারের পার্শ্বে ছিলেন; তিনি দাসীকে কোনও কথা কহেন নাই,—সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন,—যাইবার সময় তাঁহার ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শোভার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। হায়!-যে পিতৃগৃহে তাহার ইচ্ছাই আজ্ঞা ছিল, যে গৃহে তাহার সুখের জন্য সকলে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত—সেই পিতৃগৃহে সামান্যা দাসী তাহার অপমান করিতে সাহস করে! স্নেহময়ী মা, আজ তুমি কোথায়? তোমার সঙ্গে যে সে সবই গিয়াছে! তবু সে কেবল পিতার জন্য এ সংসারে আছে!—কেন সে আর সকলের মত শ্বশুরালয়ে যায় নাই?—সে যদি ভুল বুঝিয়া থাকে, প্রভাত কেন তাহাকে পুরুষের কঠোর আজ্ঞায় লইয়া যায় নাই? দুর্ব্বলের স্বভাব, আপনি অপরের নিকট লাঞ্ছিত হইলে স্বজনের দোষ ভাবিয়া তাহারই উপর রাগ করে। যাহার উপর রাগ করা যায়,—তাহারই উপর রাগ হয়।

বড় বধূ শোভার নিকটে বসিয়া অন্য কথার উত্থাপন করিয়া তাহাকে অন্যমনস্কা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাতে ফল হইল না। শোভা ভাবিল,—এ অপমানের পূর্ব্বে সে মরে নাই কেন?

সন্ধ্যা হইতেই প্রভাত ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া শোভার আহত অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে প্রভাতকে সেই অপমানের কথা বলিল, এবং তাহাকেই সে জন্য দায়ী করিল। শোভার সেই রোদনস্ফীত নয়ন দেখিয়া, তাহার তীব্র উক্তি শুনিয়া, তাহার ও আপনার অপমানের কথা ভাবিয়া প্রভাতের মনে ধিক্কার জন্মিল। সে কি ভ্রমই করিয়াছে। তাহার দারুণ পাপের এই নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত।

প্রভাত যেন আর সহ্য করিতে পারিল না; ভাবিতে ভাবিতে গৃহের বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্যহীন ভাবে যাইতে যাইতে সে গৃহের অনতিদূরস্থ সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল,—প্রবেশ করিয়া সরোবরের তৃণাচ্ছাদিত তটভূমিতে বসিল। তখনও উদ্যানে পবনস্পর্শলোলুপ যুবকগণ ভ্রমণ করিতেছে;—এক এক স্থানে দুই চারি জন বসিয়া গল্প করিতেছে। পাত্রে জল ঢালিতে ঢালিতে শেষে জল উছলাইয়া পড়ে—হৃদয়ে যখন দুঃখকষ্ট আর ধরে না, তখনও তেমনই হয়। প্রভাত যে স্থানে বসিল, তাহার অদূরে কয় জন যুবকের কথায় তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। যুবকগণ ভারতচন্দ্রের কবিত্ব লইয়া তর্ক করিতেছিল। এক জন বলিল, "ললিতমধুর ভাষায় ভাবপ্রকাশক প্রবাদবাক্যরচনায় ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কোথায়? মুখরা,—বিনয়হীনা স্বার্থপরা পত্নীর কথা অনেক কবি লিখিয়াছেন; কিন্তু এত অল্প কথায় এমন ভাবপ্রকাশ আর কে করিতে পারিয়াছে?—

'নারী যার স্বতন্তরা.　সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস।'

দেখ দেখি কি সুন্দর!" তর্ক চলিতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে প্রভাতের আর মন ছিল না। কথা কয়টি তাহার মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল। সে তখনও শোভাকে এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ভাবিতেছিল। সে ত তাহারই জন্য আপনার আর সব ছাড়িয়াছে। হায়!—সে কি না করিয়াছে?

সেই তৃণমণ্ডিত ভূমিতে শয়ন করিয়া প্রভাত ভাবিতে লাগিল; বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার জীবনের ভ্রম সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে পদে পদে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে! সে দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এখন সে কি করিবে?—তাহার কর্ত্তব্য কি?

প্রভাত কতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় চিন্তা করিল, তাহা সে আপনি জানিতে পারিল না। অদূরে কোথায় ঘড়ীতে প্রহর বাজিল। সেই শব্দে প্রভাত চমকিয়া উঠিল; চাহিয়া দেখিল,—উদ্যান প্রায় জনশূন্য, অনেকেই চলিয়া গিয়াছে; তৃণদলে শিশির সঞ্চিত হইতেছে,—তাহার কেশ ও বেশও আর্দ্র হইতেছে;—আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে,—সরোবরের স্থির অচঞ্চল জলে চন্দ্রকর পড়িয়াছে। প্রভাতের শীত করিতে লাগিল। প্রভাত উঠিয়া বসিল: ঘড়ী দেখিল,—রাত্রি নয়টা।

প্রভাত গৃহের কথা ভাবিতেছিল। নয়টা বাজিল। তাহার মনে পড়িল,—কিছুক্ষণ পরেই ধূলগ্রামে যাইবার ট্রেণ ছাড়িবে।

এক সময় এই ট্রেণে যাইবার জন্য তাহার কত আগ্রহ ছিল,—এই সময়ের জন্য এক এক দিন কত ব্যস্ত হইত! এখনও ত সে যাইতে পারে। বন্দী পলায়নচেষ্টায় আপনার কারাগৃহের প্রাচীর, হর্ম্ম্যতল—সব শতবার পরীক্ষা করিয়া শেষে যদি দেখে, বাতায়নের লৌহদণ্ড তাহার সামান্য আকর্ষণে খুলিয়া আসিল, তবে সে যেমন আনন্দে বিহ্বল হয়, প্রভাত তেমনই বিহ্বল হইল। প্রভাত পকেটে হাত দিল,—ব্যাগ লইয়া দেখিল,—টাকা আছে। সে উঠিয়া রাস্তায় আসিল,—গাড়ী লইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ট্রেণ ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না। টিকিট লইয়া প্রভাত দ্রুত আসিয়া ট্রেণে উঠিল। একটি নিদ্রিতা বালিকাকে বক্ষে লইয়া এক জন ভিক্ষুক প্ল্যাটফরমে ভিক্ষা করিতেছিল,—"এই মেয়েটির মা নাই। আমি এই ষ্টেশনে মালগুদামে কায করিতাম। এখন আর কায করিতে পারি না। বড় 'সাহেব' দয়া করিয়া আমাকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছেন।—ইত্যাদি।" প্রভাত ব্যাগ খুলিল; যাহা কিছু ছিল, তাহাকে দিল। অত অর্থ পাইয়া ভিক্ষুক বিস্মিত হইয়া চাহিল, অপর যাত্রীরাও বিস্ময় প্রকাশ করিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দত্তগৃহে।

ধূলগ্রামের দত্তগৃহে বিষাদের যে অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আর অপসৃত হইল না। মৃত্যু যে দীপ নিবায়, তাহা আর জ্বলে না। অবশিষ্ট দীপ যে নিবাইয়াছিল, সে ভ্রান্তিবশে তাহা আর জ্বালিল না। সেই নির্ব্বাপিত দীপের ধূমরাশি দত্তগৃহে শোকের অন্ধকার নিবিড়তর করিয়া দিল। কাহারও মনে সুখ নাই। শিবচন্দ্র দুঃখিত; নবীনচন্দ্র দুঃখিত; বড় বধূ ব্যথিতা; পিসীমা ব্যথিতা।

পিসীমা'র জীবনের এক দিকে যে দারুণ বেদনা ছিল, তাহা পিতৃগৃহে স্নেহানন্দে তিনি সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন। নিষ্ফল জীবনের দারুণ শূন্য যেন আপনার সন্তানের অধিক ভ্রাতুষ্পুত্রের ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি স্নেহে পূর্ণ হইয়াছিল। এখন জীবনের নিষ্ফলতা পদে পদে তাঁহাকে আহত—ব্যথিত করিতে লাগিল; হৃদয়ের শূন্যভাব অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। পিসীমা যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

এক দিন পিসীমা শিবচন্দ্রকে বলিলেন, "শিব, আমি আর সহিতে পারি না। আমাকে কাশী পাঠাইয়া দে।"

তিনি কত সহিয়াছেন, শিবচন্দ্র তাহা জানিতেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি কি বলিয়া দিদিকে বুঝাইবেন? তাঁহারও বক্ষে বিষম বেদনা।

শিবচন্দ্র কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দিদি, এই সময় কি আমাদের ছাড়িয়া যাইবে?" মুখে আর কথা ফুটিল না; কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কথা শুনিয়া পিসীমা চক্ষুর জল ছাড়িয়া দিলেন। কয় দিন আর সে কথা উঠিল না।

কিন্তু শূন্যহৃদয়ে সেই শূন্যগৃহে বাস সত্য সত্যই পিসীমা'র আর সহ্য হইতেছিল না। নবীনচন্দ্রও আর কি বলিবেন? শেষে তিনি যতীশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের জননীর সহিত পরামর্শ করিলেন। সতীশচন্দ্র পরদিন দত্তগৃহে আসিল; অমলকে সঙ্গে লইয়া আসিল। স্নেহশীলা পিসীমা'কে সতীশচন্দ্র বিশেষ জানিত। সতীশচন্দ্র ফিরিয়া যাইতে চাহিলে পিসীমা বলিলেন, "অমল আজ থাকুক।" সতীশ বলিল, "থাকুক।" তাহার পর সে পিসীমা'কে বলিল, "আপনি নাকি আমাদের সব মায়া কাটাইয়া যাইতেছেন?" পিসীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। হায়! মায়া কাটাইতে পারিলে আজ কি আর এত কষ্ট হইত? মায়াতেই ত যাতনা! সতীশচন্দ্র বলিল, "সবই ত প্রায় শেষ হইয়াছে। এখন আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা শেষ করিয়া কি হইবে?" বলিতে বলিতে সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু জলে ছলছল করিতে লাগিল। পিসীমা'র দুই নয়নে ধারা বহিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে পিসীমা'র নিদ্রা হইল না। দুইখানি পরিচিত মুখ যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্থির রহিল। তিনি যাহাই করেন,—

সেই দুইখানি মুখ যেন তাঁহার সম্মুখে। তাহারাই তাঁহার দগ্ধ-জীবনে অজস্র সুখের প্রস্রবণ; —তাহারাই এই বার্দ্ধক্যে তাঁহার অজস্র দুঃখের কারণ। তাহাদিগকে লইয়াই তিনি সব ভুলিয়াছিলেন;—আজ তাহারাই তাঁহার সব দুঃখের কেন্দ্র। যে দিন জীবনপ্রভাতের সকল আশার শ্মশান শ্বশুরের শূন্য ভিটা হইতে শূন্যহৃদয়ে পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন, সে দিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই,—আবার নূতন আশা অবলম্বন করিতে হইবে, আবার নূতন সংসার আপনার করিয়া আপনি তাহাতে জড়িতা হইবেন। কিন্তু সে দিন যাহা কল্পনারও অতীত ছিল, ক্রমে তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি স্নেহ যেন তাঁহাকে নূতন জীবন দিয়াছিল। শিশুর প্রতি স্নেহে অঘটন সংঘটিত হয়। তাই—সেই কমল-নয়নের কোমল দৃষ্টিতে,—সেই প্রসারিত ক্ষুদ্র করের আহ্বানে,—সেই কুসুমোপম ওষ্ঠাধরের অস্ফুট কাকলীতে মানবের কঠোর কর্ত্তব্য, বিষম বৈরাগ্য, অটল অভিলাষ—সবই ভাসিয়া যায়,—পাষাণে প্রবাহিণী প্রবাহিত হয়,—নীরস সরস, ও শুষ্ক আর্দ্র হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়,—নূতন জীবন বিকশিত হয়।

তাহার পর আবার যখন তাহাদের প্রতি স্নেহে দহনতপ্ত হৃদয় শীতল হইয়াছিল,—শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল;—তিনি সব ভুলিয়াছিলেন—তখন কে জানিত, বার্দ্ধক্যে এই অসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে,—দহনজ্বালা দ্বিগুণ হইবে,—শূন্যহৃদয় শূন্যতর হইবে?

সতীশচন্দ্রের মাতৃহীন সুপ্ত পুত্রকে বক্ষে লইয়া পিসীমা কাঁদিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাঁহার কাঁদিয়া কাটিল।

এমনই দুঃখে দত্তগৃহে দিন কাটিতে লাগিল।

কমলের মৃত্যুশোক বড় বধূর হৃদয়ে বুঝি সন্তানমৃত্যুশোক অপেক্ষাও অধিক বাজিয়াছিল তাঁহার উপর পুত্রের এই ব্যবহার। তিনি স্বামীর বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইতেন, স্নেহশীল দেবরের মুখে দারুণ বেদনার চিহ্ন দেখিতেন, ননন্দার নয়নজল দেখিতেন, আর পদে পদে বুঝিতেন, তাঁহার পুত্রই এ সব বেদনার কারণ। মাতৃহৃদয়ের স্নেহরাশি কেবল যাতনায় পরিণত হইল। তাঁহার সেই পুত্রগতপ্রাণ দেবর ও ননন্দা যে তাঁহার পুত্রকে পাইলে এত দুঃখেও কিছু শান্তিলাভ করিতে পারিতেন—তাহা তিনি জানিতেন; তাই পুত্রের ব্যবহারে হৃদয়ে দ্বিগুণ যাতনা অনুভব করিতেন মধু বিকৃত হইলে যেমন বিষ হইয়া দাঁড়ায়—স্নেহ আহত হইলে তেমনই যাতনা হইয়া উঠে। বড় বধূর তাহাই হইয়াছিল তাই তাঁহার হৃদয়ে কেবল যাতনা অসীম,—দারুণ,—ভীষণ। তাহার সেই শিশুমুখ চাহিয়া তিনি যখন মাতৃহৃদয়ে কত আশা করিয়াছিলেন, তখন কি মুহূর্তের জন্য এই সম্ভাবনার কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন?

দত্তগৃহে কাহারও মনে সুখ ছিল না। সকলেই দুঃখিত। শিবচন্দ্রের দুঃখ ফুটিত না,—তাই বুঝি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যে আশার অবলম্বন,—যাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশা করিয়াছিলেন, সেই পুত্রই হৃদয়ে দারুণতম আঘাত

করিয়াছে। তিনি কাহার নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন? একমাত্র পাত্র ভ্রাতা। সেও সমদুঃখ-কাতর। তাহারও হৃদয় শোকে—দুঃখে ক্ষতবিক্ষত। শিবচন্দ্র তাহা বুঝিতেন। উপায় কি? ভ্রাতার দীর্ণ—বিদীর্ণ হৃদয়ে আর কোন্ আশা অবশিষ্ট আছে,—কোন্ সুখের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? তাহার পিতৃহৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে যাহাকে পুত্রাধিক জ্ঞান কবিয়া পালন করিয়াছিল,—স্নেহ দিয়াছিল, সেই ত সকলের হৃদয়ে দারুণ বেদনা দিয়াছে।

এই শোকে—এই দুঃখে—এই যাতনায় দত্ত-গৃহে সকলেরই হৃদয়ে এক আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল—যদি প্রভাত—সেই একমাত্র স্নেহের ধন—ফিরিয়া আসিত! যদি সে পুত্র পরিবার লইয়া আসিত;—শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দান করিত! কিন্তু সে সব ভুলিয়াছে। যাহাকে তাঁহারা মুহূর্ত্ত ভুলিতে অসমর্থ, সে তাঁহা-দিগকে একেবারে ভুলিয়াছে। সে যে এমন হইতে পারিবে, কে ভাবিয়াছিল?

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

মাঘের মধ্যভাগে পিসীমা শিবরাত্রিতে গঙ্গাস্নানে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বড় বধূও তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র পরামর্শ করিয়া সম্মতি দিলেন। পূর্ব্বে যে স্থানে গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইত, রেলে গতায়াত প্রচলিত হইবার পর সে স্থানে যাওয়া এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। এখন কলিকাতাতেই গতায়াতের সুবিধা,—থাকিবারও সুবিধা। সেই

জন্য কলিকাতাতে যাওয়াই চলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হইবে?" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কলিকাতায়।" শুনিয়া পিসীমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; শেষে বলিলেন, "এখনও বিলম্ব আছে। বিবেচনা করিয়া দেখি।"

কলিকাতায় যাইবার কথায় পিসীমা'র হৃদয় ব্যথিত হইল। হায়!—পাষাণনগরী, তোমাকে আমরা কি দিয়া কি পাই? তোমার কঠোর করের নিষ্ঠুর স্পর্শে আমাদের স্বর্ণমুষ্টি ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হয়; আমাদের সযত্নসঞ্চিত—বহুকষ্টে রক্ষিত সুধা গরলে পরিণত হয়; আমাদের সব সুখ নিমেষে বিলীন হইয়া যায়। আমরা হৃদয়ের রক্তে যাহাকে পুষ্ট করি, তুমি তাহাকে বিকৃত করিয়া আনন্দলাভ কর। তোমার স্পর্শ আমাদের পক্ষে কেবল দুঃখের—কেবল কষ্টের কারণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহাগত।

ধীরে,—ধীরে,—চরণ আর যেন চলে না,—প্রভাত গৃহের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার কেবল মনে পড়িতে লাগিল, পূর্ব্বে প্রবাস হইতে এই পথে গৃহে ফিরিবার সময় সে কি আনন্দ অনুভব করিত! হায়—সে দিন! মাঘ মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। দুই চারিটি বৃক্ষে নবপল্লব উদ্গত হইতেছে;—কোথাও বা পলাশের সুপ্তলাবণ্য গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা মন্দারের মুকুল কেবল দেখা দিতেছে; কোথাও বা তরুণ চূতমুকুলের গন্ধে পথ আমোদিত,—সে স্থান অলিকুলগুঞ্জনমুখরিত। বসন্তের কেবল আরম্ভ;—কোকিলকূজনও কেবল আরব্ধ—চারি দিকে সেই ক্রমোচ্চগ্রাম-স্পর্শী স্বরের ছড়াছড়ি নাই, কিন্তু দূরাগত বিরল বিরাব আরও মধুর। আর কোকিল ভিন্ন আরও কত বিহগের গান!—দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে; বৌ-কথা-কও কোনও অনির্দ্দিষ্টা প্রণয়িণীর বাক্যশ্রবণলোলুপ হইয়া সাগ্রহমিনতি জানাইতেছে; গৃহস্থের-খোকা-হ'ক অযাচিত ভাবে গৃহস্থের গৃহে শুভ ঘটনার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; আরও কত বিহগ উচ্ছ্বসিতস্বরভঙ্গীতে কূজন আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত প্রাচীন সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু সে কৌলীন্যগৌরবহীন হইয়াও তাহারা পল্লীবাসীর স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। তাহারা পল্লীজীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কত দিন

হইতে তাহারা পল্লীবাসীর কর্ণে সুধাধারার বর্ষণ করিতেছে! অদূরে তটিনী তপনকরে কলধৌতপ্রবাহবৎ বহিয়া চলিয়াছে। ক্বচিৎ বা দেখা যাইতেছে,- গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভকক্ষে ঘাট হইতে ফিরিতেছে।

সঙ্গিহীন প্রভাত ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিল। ক্রমে মাঠ ছাড়াইয়া, বিলের পার্শ্ব দিয়া, গ্রামে প্রবেশ করিল। সে নতদৃষ্টি হইয়া চলিতে লাগিল,—পাছে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু পথে দুই তিন জন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাত সংক্ষেপে উত্তর দিয়া গেল: সে লক্ষ্য করিল,—তাঁহাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় বিকশিত।

প্রভাত গৃহদ্বারে উপনীত হইল। গৃহপালিত পুষ্টকায় কুক্কুর নূতন লোক ভাবিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিল, প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আনন্দে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল; পরিচিত গৃহে,—গৃহপালিত পশুও তাহাকে ভুলে নাই।

চণ্ডীমণ্ডপে শিবচন্দ্র একাকী পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষুতে চশমা। প্রভাত শেষবারও যখন তাঁহাকে দেখিয়াছে, তখনও তাঁহার চশমা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয় নাই। প্রভাত চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শিবচন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—পুত্র। প্রভাত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরে ছিলেন। শ্যামের মা যাইয়া সংবাদ দিল, তাহার দাদাবাবু আসিয়াছে—শিবচন্দ্র কোন কথা কহেন নাই। প্রভাত আসিয়াছে! সহসা,—সংবাদ না দিয়া,—এমন ভাবে সে

আসিয়াছে! নবীনচন্দ্র যে অবস্থায় ছিলেন, ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রভাত পিতৃব্যকে প্রণাম করিল। নবীনচন্দ্র পূর্ব্বেরই মত তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। সে আদরে প্রভাত কাঁদিয়া ফেলিল। নবীনচন্দ্র তাহাকে পার্শ্বের কক্ষে লইয়া যাইলেন;—কক্ষদ্বার রুদ্ধ ছিল,—তিনি মুক্ত করিলেন। নবীনচন্দ্রের বিশেষ আশঙ্কা হইল। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কেমন? দাদারা?" তাহারা ভাল আছে জানিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; প্রভাতকে শান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার অশ্রু তিনি যত মুছান, সে অশ্রু তত দ্বিগুণ বহে।

প্রভাতকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরে উৎকণ্ঠিতা পিসীমাকে ও বড় বধূকে সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন। শিবচন্দ্র তাঁহাকে ডাকিলেন, "নবীন, সংবাদ কি?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ভাল।"

"তবে সহসা কি মনে করিয়া? জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

"দাদা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতে আর মনে করা-করি কি?"

নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

অন্তঃপুরে পিসীমা তেমনই অবারিত আদরে প্রভাতকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বড় বধূর মুখে বিরক্তির ছায়া অপসৃত হইল না; তাঁহার ব্যবহারে পূর্ব্ব ভাবের কি একটু অভাব। নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, শিবচন্দ্রের ব্যবহারে বিরক্তির ভাব বর্ত্তমান, বড় বধূর ব্যবহারেও তাহার ছায়া—যেন সেই জন্যই তিনি অত্যধিক স্নেহা-

দরে সে অভাব পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবীনচন্দ্রের আর ভ্রাতার সহিত স্নান হয় না প্রভাতকে সঙ্গে লইয়া যান; আর ভ্রাতার সহিত আহার হয় না, প্রভাতকে পার্শ্বে বসাইয়া একত্র আহার করেন; আর একা সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন হয় না, প্রভাত সঙ্গে যায়। প্রভাতকে নহিলে হয় না।

প্রভাতের প্রত্যাবর্ত্তনে যে শিবচন্দ্র ও বড় বধূ উভয়েই সুখী হইয়াছিলেন—নবীনচন্দ্রের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তথাপি —তাঁহাদের মনের অন্ধকার কাটে নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত। সহসা সে কেন কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই;—করেন নাই। তবে প্রভাতের জ্যেষ্ঠ শ্যালক তাহার আগমনের পর দিনই তাহার সংবাদের জন্য তাঁহার নিকট টেলিগ্রাফ করাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, একটা কিছু হইয়াছে; পাছে জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যথিত হৃদয়ে আবার ব্যথা পায়, এই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, সে শান্ত হইলে ক্রমে জানিতে পারিবেন।

প্রভাতের মনে সুখ ছিল না,—কেবল যাতনা। সে পিতার ব্যবহারে বিরক্তির ক্ষীণ ছায়া লক্ষ্য করিত,—মাতার ব্যবহারে পূর্ব্ব ভাবের কিছু অভাব অনুভব করিত। যেখানে আশা অতি অধিক, অধিকার অনাহত বলিয়া বিশ্বাস,—সেখানে সামান্য ত্রুটীতে বড় কষ্ট,—বড় যাতনা। প্রভাতের তাহাই হইত। প্রভাত দেখিত, পিতার আর সে স্বাস্থ্য নাই, পিতৃব্যের দেহে অকালজরার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে। সে সকলের জন্য সে যে কত দায়ী, তাহা

সে বুঝিত ; বুঝিয়া যাতনা পাইত। সে আত্মগ্লানির বেদনা ভোগ করিত।

গৃহে যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাও বড় যাতনার। এ জীবনে ভগিনীর সে স্নেহলাভ আর ঘটিবে না। সেই পরিচিত গৃহে সে শোক যেন নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই গৃহে তাহার শৈশব হইতে কত স্মৃতি! শৈশবে, বাল্যে সে পদে পদে তাহারই উপর নির্ভর করিত, তাহাকেই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা শুনাইত, --কত ভালবাসিত! সে আজ কোথায়!

প্রভাতের যাতনার আরও কারণ ছিল। আবেগের উত্তেজনায় সে যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছে, হৃদয় তাহাদের জন্য ব্যথিত হইতে-ছিল। প্রণয়পাত্রী প্রেমের অযোগ্যা হইলেও প্রেম যায় না। সে দিন প্রভাত প্রথমে শোভাকে দোষী ভাবিয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে সে বুঝিল, দোষ শোভার নহে, বরং তাহারই। সেই অপমানে শোভা যে কষ্ট অনুভব করিয়াছে, তাহা মনে করিয়া সে আপনি কষ্ট পাইল। সে কষ্টের জন্য সে দায়ী। এই ভাবে চলিয়া আসিয়া সে শোভাকে কষ্ট দিয়াছে ; হয় ত আরও অপমান সহিতে রাখিয়া আসিয়াছে। সে আপনি কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছে। যাহাদিগের সে ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই, যাহাদের ভার তাহার—সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছে! কিন্তু এখন সে কি করিবে ; তাহার পক্ষে কোন্ পথ মুক্ত ? এই সব চিন্তায় সে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিত ;—কেবল যাতনা পাইত। সে কি করিবে ?

এ সকল ভিন্ন পুত্রদ্বয়ের কথা মনে পড়িত। বিশেষ সেই কনিষ্ঠ

পুত্র -- সে নিতান্ত দুর্ব্বল। তাহার জন্য সর্ব্বদা আশঙ্কা ;—সে কেমন আছে ? সর্ব্বদা তাহার জন্য আশঙ্কা ; কিন্তু সে সর্ব্বদা তাহার সংবাদও পাইত না। সংবাদ পাইবার জন্য সে ব্যস্ত ; কিন্তু সংবাদ পাইবার কি করিবে ?

নানা দুশ্চিন্তায় প্রভাতের হৃদয় পদে পদে ব্যথিত হইত। তাই তাহার ব্যথিত হৃদয়ে সুখ ছিল না। সে কেবল মনে করিত, তাহার কৃত-কর্ম্মের ফল ফলিতেছে ; সে আপনি ভ্রান্তিবশে যে কায করিয়াছে, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে ;—গরল পান করিলে তাহার ফল মৃত্যু অনিবার্য্য। এ দুঃখ তাহার স্ব-কৃত। প্রভাত কেবল ভাবিত। কেবল পিসীমার স্নেহযত্নে, পিতৃব্যের স্নেহাদরে তাহার ব্যথিত—বিক্ষত—কাতর হৃদয় কিছু শান্তি পাইত।

এইরূপে পক্ষাধিককাল কাটিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

একদিন আহার্য্য প্রস্তুত হইলে প্রভাতকে ডাকিতে যাইয়া নবীনচন্দ্র দেখিলেন, সে কাঁদিতেছে। শঙ্কিত ও ব্যস্ত হইয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাতের জ্যেষ্ঠ শ্যালক পত্র লিখিয়াছেন, তাহার দুর্ব্বল কনিষ্ঠপুত্র পীড়িত। জলরাশি সঞ্চিত হইতে হইতে শেষে একদিন সব বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়—সে দিন তাহার গতি রোধ করা দুঃসাধ্য। তাই আজ প্রভাতের অশ্রুধারা আর নিবৃত্ত হয় না। নবীনচন্দ্র বহুক্ষণে তাহাকে শান্ত করিলেন। তিনি সব শুনিলেন; বলিলেন, "চল্, আমরা কলিকাতায় যাই। তাহাদের লইয়া আসিব।"

প্রভাত মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "বাবা সম্মতি দিবেন কি?"

নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রের অশ্রুসিক্ত নয়ন মুছাইয়া বলিলেন, "বাবা, তিনি অভিমান করিতে পারেন—করুন। আমি পারিব না। যে দিন ভগবান আমাকে ভিখারীর অধম করিয়া সংসারে সবহারা করিয়াছিলেন, সে দিন তোদের দুই জনের দিকে চাহিয়া আমি অশান্ত হৃদয় শান্ত করিয়াছিলাম। আজ তুই ছাড়া আমার আর কেহ নাই।" বলিতে বলিতে নবীনচন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

প্রভাত পূর্ব্বে কখনও পিতৃব্যকে এমন ভাবে কাঁদিতে দেখে নাই। তাহার অশ্রুধারা দ্বিগুণ বহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে

হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিল। -এ স্নেহে কাহার হৃদয় শান্ত না হয়?

শেষে প্রভাত বলিল, "আমি যাইব, না। আপনি যাইয়া যথাকর্ত্তব্য করুন।"

সে যে কত ব্যস্ত হইয়া থাকিবে, নবীনচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিলেন; তাই তিনি তাহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্কোচ বোধ করিল। শেষে নবীনচন্দ্রের যাওয়াই স্থির হইল।

নবীনচন্দ্র আসিয়া শিবচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদা, আমি কলিকাতায় যাইব।"

শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"মা'কে ও দাদাদের আনিতে।"

"আসিতে তাঁহাদের মত হইয়াছে কি? তাঁহারা না বলিলে আবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

নবীনচন্দ্র আনিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; সে ব্যথা শিবচন্দ্রের হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল। সে কথা আজ তাঁহার মনে পড়িল;—তাই এ কথা। নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে সে ব্যথা স্নেহস্রোতে ধৌত হইয়া গিয়াছিল।

নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "আপনি রাগ করিতে পারেন। আমার উঁহারা ব্যতীত আর কেহ নাই।"

শিবচন্দ্র দেখিলেন, নবীনচন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। "উঁহারা ব্যতীত আর কেহ নাই।" উভয়েরই স্নেহের আর এক

অবলম্বন ছিল। সে আর নাই। সেই বনরাজিনীলা সমুদ্রবেলায় চিতার স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। শিবচন্দ্রেরও চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তুমি একা যাইবে?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "প্রভাতকেও যাইতে বলিয়াছিলাম; সে যাইবে না। বিনয়ের অসুখ। আমি আজই যাইব।"

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

"জ্বর। সে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সর্ব্বদাই অসুস্থ। তাই তাহার সামান্য অসুখেই ভয় হয়।"

নবীনচন্দ্র সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

স্নেহের আশঙ্কায় শিবচন্দ্রের হৃদয়ে আশঙ্কার অন্ধকার কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতেই প্রভাতের ডাক পড়িল। শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত, কখন সংবাদ আসিবার সম্ভাবনা?"

প্রভাত বলিল, "মধ্যাহ্নের পর নহিলে টেলিগ্রাম আসিবার সম্ভাবনা নাই।"

"তুই পোষ্টমাষ্টারকে লিখিয়া দে, আমার বা তোর নামে কোনও টেলিগ্রাম আসিলে তখনই পাঠাইয়া দেন।"

বহুদিন পরে প্রভাত পিতার নিকট পূর্ব্বের মত স্নেহসম্ভাষণ,—সস্নেহ ব্যবহার পাইল।

* * * * *

এ দিকে নবীনচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, বিনয়ের জ্বর ছাড়িয়াছে। শোভা আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "মা, আমি লইতে আসিয়াছি। মা আমার, একবার ছেলেকে

ফিরাইয়া দিয়াছ। এবার আমি কোনও কথা শুনিব না। তোমাকে যাইতেই হইবে।”

স্নেহের অনুযোগে শোভার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কেমন করিয়া এই স্নেহে এতদিন অন্ধ হইয়া ছিল?

কৃষ্ণনাথের গৃহে সব বিশৃঙ্খল। প্রভাত চলিয়া যাইলে বড় বধূ স্বামীকে তাহার কারণ বলিয়াছিলেন। তিনি সে কথা বিনোদবিহারীকে বলিলে, মধ্যমা বধূ দুর্ব্বল স্বামীর দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে দুই ভ্রাতার পক্ষে আর সপরিবারে একত্র বাস সম্ভব রহিল না। জ্যেষ্ঠের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই ভ্রাতার বন্দোবস্ত পৃথক হইয়া গিয়াছিল—বিনোদবিহারীই তাহার উদ্যোগী।

জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রকে সে সব দুঃখের কথা বলিলেন। শুনিয়া নবীনচন্দ্র বড় ব্যথা পাইলেন।

এই সকল কথা জীবন্মৃত কৃষ্ণনাথের কর্ণে উঠিয়াছিল। মৃত্যুকাল একান্ত নিকট হইয়া আসিয়াছিল। নবীনচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণনাথের দিন ফুরাইয়াছে,—জীবনীশক্তি শেষ হইয়া আসিয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিলেন,—আর বিলম্ব নাই। দুই দিন কাটিয়া গেল,—মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র দুই দিন বৈবাহিকের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে কাটাইলেন। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, “বৈবাহিক, আমি না বুঝিয়া অনেক কুব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাদের মহত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি নাই।” বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণনাথ বড় দুঃখে আপনার ভ্রম বুঝিলেন। তিনি দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সুখের সংসারে দুঃখ।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আপনি কষ্ট করিবেন না।"

দুই দিন কাটিয়া গেল। নবীনচন্দ্র অক্লান্ত যত্নে বৈবাহিকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিন কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইল।

কৃষ্ণনাথ যে উইল করিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসন্ন তাহা জানিতেন। কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর দিবস তিনি সে উইল আনাইলেন। উইল কৃষ্ণনাথের পত্নীর মৃত্যুর পর লিখিত হয়। উইলে—গৃহে দুই পুত্রের, কন্যার ও চপলার সমান অংশ; সম্পত্তির একচতুর্থাংশ প্রভাতের ও শোভার, অবশিষ্ট অংশে দুই পুত্রের সমান ভাগ। চপলার অর্থ অনাবশ্যক,—তথাপি তিনি চপলাকে দশ সহস্র টাকা দিয়াছেন।

উইলের নির্দ্দেশে বিনোদবিহারী বিরক্ত হইল। শোভা যে এত অর্থ ও গৃহের অংশ পাইবে, ইহা সে মনে করে নাই। কিন্তু এখন আর উপায় কি? বিনোদবিহারী আপনার অংশ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল।

নবীনচন্দ্র শোভাকে বলিলেন, "মা, এ গৃহে তোমার আবশ্যক নাই। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকন্যা অনেকগুলি। তাঁহার স্থানাভাব হইবে। তুমি যদি এখানে থাক, তাই বৈবাহিক এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমাকে বাড়ী যাইয়া বুড়া ছেলেদের দেখিতে হইবে।" সে কথার যাথার্থ্য বুঝিয়া শোভা বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" নবীনচন্দ্র একবার প্রভাতের মত জানিতে বলিলেন,—আপনিও প্রভাতকে

লিখিলেন। প্রভাত তাঁহার মতে কায করিবার জন্য শোভাকে লিখিল ; নবীনচন্দ্রকে লিখিল, "আপনি যাহা ইচ্ছা, করিবেন। আমার মত চাহিয়া আমাকে আর লজ্জিত করিবেন না,—পর করিয়া দিবেন না।" তখন নবীনচন্দ্র শোভাকে বলিলেন, "মা, পিতার সম্পত্তিতে তোমার আবশ্যক ? উহা দুই ভ্রাতাকে সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। মধ্যমের মতিগতি যেরূপ, তিনি লইবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যাহার কর্ত্তব্য, তাহার কাছে। তুমি প্রস্তাব করিয়া দেখ।"

হইলও তাহাই। শোভা বিনোদবিহারীকে প্রাপ্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিতে চাহে শুনিয়া মধ্যমা বধূ মুখ বাঁকাইলেন,—"পোড়া কপাল টাকার! না খাইয়া মরি, সেও ভাল। তবু ভিক্ষার ধন চাহি না।" মধ্যম ভ্রাতার আর সে সম্পত্তি লওয়া হইল না।

তখন নবীনচন্দ্রের পরামর্শমত শোভা পৈত্রিক গৃহে ও সম্পত্তিতে আপনার প্রাপ্ত অংশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিল।

শোভা যাইবে শুনিয়া চপলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে অনেক কাঁদিল ; শেষে শোভাকে বলিল, "ঠাকুরঝি, আমি তোমার দুষ্ট সরস্বতী ছিলাম। তুমি সুখী হও। আমি আপনার দোষে সব হারাইয়া এখন আমার ভ্রম বুঝিয়াছি। আমার সব দুঃখ আমার স্ব-কৃত কর্ম্মের ফল।"

চপলার দুঃখে শোভা কাঁদিল।

তাহার পর নবীনচন্দ্র কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়া শোভাকে ও তাহার পুত্রদ্বয়কে লইয়া ধূলগ্রামে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

চপলা কি করিল? স্বর্ণ অগ্নিদগ্ধ হইলে নির্ম্মল হয়; আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইলে নির্ম্মল হয়। চপলার ভ্রম ঘুচিল, যাতনা রহিল। সে যাতনার চিতানল নিভিবার নহে। চপলা দেখিল, নিরবলম্বন হৃদয়, উদ্দেশ্যহীন জীবন বড় জ্বালার কারণ, বড় আশঙ্কার বিষয়। সে শোভার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সংসারে আসিয়া তাঁহার পুত্রকন্যা-দিগের পালনের ভার লইতে ইচ্ছা করিল। বড় বধূ যে সত্য সত্যই তাহার শুভ কামনা করেন, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে সময়ে তাঁহার সদুপদেশ মত কার্য্য করে নাই বলিয়া সে দুঃখিতা হইয়াছিল। তাহার জননী তাহাকে নিকটে রাখিতে চাহিলেন; যাইতে দিলেন না; সে যাইতে চাহিলে কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। শেষে সে বড় বধূর একটি পুত্রকে নিকটে রাখিয়া লালনপালন করিতে লাগিল; তাহার উপর আপনার সকল স্নেহ—সব মনোযোগ ঢালিয়া দিল সে সর্ব্বদা বড় বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিত; তাঁহার নিকট উপদেশ লইত। তিনি তাহাকে তেমনই স্নেহ করিতেন। সে সর্ব্বদা শোভার সংবাদ লইত। তদ্ভিন্ন শিশিরকুমার সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বদা তাহাকে সদুপদেশ দিত; তাহাতে সে বিশেষ শান্তি ও সান্ত্বনা পাইত।

এই ভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল।

বিনোদবিহারী সংসারিক কার্য্যে কোনও দিনই অভিজ্ঞ ছিল

না। সে পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আওতায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পল্বলকূলে বৃহৎ বনস্পতির ছায়ায় বর্দ্ধিত ওষধির মত আপনি পুষ্ট ও সরস হইয়াছিল বটে, কিন্তু আতপতাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বা করকাপাত সহ্য করিতে শিখে নাই। বিশেষ পিতার সংসারে তাহার ব্যয়সাধ্য বিলাসের অভ্যাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আয় কমিয়া গেল। যাহা রহিল, তাহাও নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু অতর্কিত ব্যয় যথেষ্ট। ইহাতে সঞ্চিত ধন ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার নিবারণ চেষ্টা করিলে,—অভ্যস্ত ব্যয় কোনরূপে কমাইয়া আনিলে—সামান্য সুবিধার অভাবেই মধ্যমা বধূর উষ্ণ মস্তিষ্ক উষ্ণতর হইয়া উঠিত। তিনি জানিতেন, স্বামী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করতলগত। তাঁহার ব্যবহার বিনোদবিহারীর পক্ষে উত্তরোত্তর কষ্টের কারণ হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দাম্পত্যসুখের ভ্রান্ত আশায় সে সব ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল না। সে যে সুধার আশায় আর সব ত্যাগ করিয়াছিল—এখন দেখিল, তাহা বিকৃত।

মহান্ মনুষ্যত্বের ও কঠোর কর্ত্তব্যের অনুসরণে বিদেশে—স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে শিশিরকুমারের দিন কাটিতে লাগিল। চপলার ও চপলার জননীর কল্যাণসাধন তাহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নদী কোনও লক্ষ্যের অভিমুখে যাইতে যাইতে যেমন পথেও স্নিগ্ধতা, উর্ব্বরতা ও লাবণ্যশ্রী ছড়াইয়া যায়, তেমনই তাহার সেই কল্যাণব্রতে বহুলোকের উপকার সংসাধিত হইত। কার্য্যোপলক্ষে শিশিরকুমার যখন যে স্থানে যাইত, তখন

সেই স্থানের জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। বহু দীনদুঃখী তাহার নিকট দয়া ও সাহায্য লাভ করিত, বহু লোক তাহার দ্বারা উপকৃত হইত।

শিশুদিগের আগমনে দত্তগৃহে বিষাদের ছায়া অপসৃত হইল। সে গৃহ প্রভাতের পুত্রকন্যাদিগের কাকলিমুখরিত হইতে লাগিল। শিবচন্দ্রের হৃদয়ের অভিমান আশঙ্কায় দূর হইয়া গিয়াছিল। শ্বশুর ও পৌত্রদিগের আগমনে বড় বধূর মনের অন্ধকার অবশেষে দূর হইয়া গেল। শিবচন্দ্র ও বড় বধূ—উভয়েরই বৃদ্ধবয়স শিশু-দিগের সাহচর্য্যে সুখময় হইতে লাগিল।

পিসীমা'র আর কাশী যাওয়া হইল না। প্রভাতের পুত্রকন্যা-দিগকে রাখিয়া তাঁহার আর নড়িবার উপায় নাই। তিনি নহিলে ছেলেদের চলে না। আবার ছেলেরা না হইলে তাঁহার চলে না। এখন তাঁহার অঙ্কে প্রভাতের স্থান প্রভাতের পুত্রকন্যারা অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া যাইবেন?

প্রভাত, সতীশ, শোভা, অমল ও প্রভাতের পুত্রকন্যা—ইহা-দিগকে লইয়া স্নেহশীল নবীনচন্দ্র সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহার আর অবসর নাই। প্রভাত ও সতীশ কোনও কার্য্য করিতে হইলে তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করে না। শোভারও কোনও বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে সে নবীনচন্দ্রের নিকট লয়!

বিপত্নীক সতীশচন্দ্র আর বিবাহ করিল না। অমলকে ও প্রভাতের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এবং নানা সদনুষ্ঠান অনু-ষ্ঠিত করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। তাহার চেষ্টায় সে

অঞ্চলে শিল্প, কৃষিকার্য্য ও শিক্ষার প্রভৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এক জনের সুপ্রভাব বড় অল্প নহে। বিশেষ, এখন তাহার সকল সদনুষ্ঠানে সে এক জন উদ্যোগী,—সহকর্ম্মী পাইয়াছে। প্রভাত তাহার সকল সৎকর্ম্মে সহকর্ম্মী। উভয়ে একযোগে কার্য্য করিয়া নানাপ্রকারে লোকের কল্যাণসাধন করিতেছে।

শোভা আসিয়া প্রথম কয় দিন নূতন সংসারে একটু বাধ-বাধ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু পিসীমার প্রভাবে সে ভাব দুই দিনেই দূর হইয়াছিল। লৌহ কতক্ষণ অয়স্কান্তের প্রভাব অতি-ক্রম করিতে পারে? বিশেষতঃ, এবার শোভা আপনার সংসারে আসিতেছে জানিয়া ও বুঝিয়া আসিয়াছিল। সে সেই সংসারেরই হইয়া গেল। তাই—নিদাঘের পর বর্ষায় দীপ্তরবিকরতপ্ত তরু যেমন আপনার তপ্ত হৃদয়ে বর্ষাবারিপাতে নবপল্লবশ্রীসম্পন্না লতি-কার স্নিগ্ধকোমল বন্ধন অনুভব করে—নাগপাশমুক্ত প্রভাত, তেমনই আপনাকে প্রেমপাশবদ্ধ অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হইল।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বিপত্নীক	...	...	১॥০	দেড় টাকা
অধঃপতন	...	...	১।০	পাঁচসিকা
প্রেমের জয়	...	...	১॥০	দেড় টাকা
উচ্ছ্বাস	...	...	৸০	বার আনা
আষাঢ়ে গল্প	...	...	॥০	আট আনা